উপাসনা।

ব্রহ্মোপাসনাতত্ত্ব।

(৩য় অংশ।)

(৬) প্রাগুক্ত বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্র ও আচার্য্যের সিদ্ধান্ত।

১০১। কথিতপ্রকার চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার হেতু একথা সর্ব্ব শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। ইতিপূর্ব্বে "সর্ব্বাপেক্ষাচ যজ্ঞাদি" সূত্র দ্বারা এ সম্বন্ধে বেদান্তের এবং বৈদান্তিক আচার্য্য-গণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি। এখন নিম্নে অন্য কতিপয় শাস্ত্র ও আচার্য্যের সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

১ ন। তপোবিদ্যাচ বিপ্রস্য
নিঃশ্রেয়সকরং পরং।
তপসাকিল্বিষং হন্তি
বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।

মনুস্মৃতি ১২। ১০৪

'তপঃ' আশ্রমবিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য-কর্ম্ম এবং নৈমিত্তিকাদি যজ্ঞ। আর 'বিদ্যা' ব্রহ্মবিদ্যা। এই উভয় ব্রাহ্মণের মোক্ষসাধনের উপায়। তন্মধ্যে তপস্যার অবান্তর ফল এই যে, তদ্দ্বারা পাপ নষ্ট হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়। আর ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অমৃত লাভ হয়।

১ প। যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম
ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেবতৎ।
যজ্ঞদানং তপশ্চৈব
পাবনানি মণীষিণাং। গীতা ১৮। ৫

যজ্ঞ, দান ও তপঃ এই ত্রিবিধ কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। তাহা "কার্য্যং" কিনা অবশ্যকরণীয়। কেন? না, যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি, বিশুদ্ধিকারণানি মণীষিণাং ফলানভিসন্ধীনাং ইত্যেতৎ। (শঙ্কর)। যজ্ঞ দান ও তপস্যা মণীষি অর্থাৎ বিবেকীগণের চিত্তবিশুদ্ধির কারণ।

১ ফ। এতান্যপিতু কর্ম্মানি
সঙ্গংত্যক্ত্বা ফলানিচ।
কর্ত্তব্যানীতিমে পার্থ
নিশ্চিতং মতমুত্তমং। ঐ ৬

এতান্যপ্যেবং কর্ত্তব্যানি সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভি-নিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাধীনতয়া কর্ত্তব্যানি। ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানি ইতি মে মতং নিশ্চিতং অতএব উত্তমং (স্বামী)।

এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরাধীনতা বুদ্ধিতে এবং ফল-ত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্য। ইহাই আমার নিশ্চিত মত এবং উত্তম। এই সমস্ত কর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম। ইহার অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। এবং চিত্তশুদ্ধি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু হয়।

১ব। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ বচনে কর্ম্ম-যোগের উপদেশেও কহিয়াছেন "বুদ্ধ্যাযুক্তো-যয়াপার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি " যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সং স্তৎ পসাদলব্ধাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষসি (স্বামী)।

চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান (বহ্মজিজ্ঞাসা) জন্মিবার নিমিত্তে এই কর্ম্মযোগ কহিতেছি। হে পার্থ যাহাতে ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া তাঁহার প্রসাদে অপরোক্ষ জ্ঞানলাভপূর্ব্বক কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

১ভ। সংন্যাস যোগাখ্য পঞ্চমাধ্যায়ের দশম শ্লোকেও কহিয়াছেন—

"কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা
কৈবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্তি
সঙ্গংত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥"

শরীর দ্বারা স্নানাদি, মনের দ্বারা ধ্যানাদি, বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কেবল শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ কর্ম্ম-সকলকে কর্ম্মানুষ্ঠায়ী যোগীগণ ফলাসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এরূপ অনুষ্ঠানে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশরূপ অভিমান থাকে না।

১ম। মহর্ষি কপিলও সাংখ্যদর্শনে লেখেন যে, সকল শাস্ত্রেতে প্রকৃতি পুরুষের বিবেকজ্ঞান প্রতিপাদিত আছে, তাহার শ্রবণে কেবল তাঁহাদেরই মতি হয় যাঁহারা বহু জন্ম-ব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ বেদবিহিত ক্রিয়া সাধন দ্বারা চিত্তভূমিকে প্রস্তুত করিয়াছেন। কেবল তাদৃশ পুরুষেরাই ঐ সকল শাস্ত্র শ্রবণের অধিকারী। নতুবা "নশ্রবণমাত্রাৎ তৎসিদ্ধিরনাদিবাসনায়া বলবত্বাৎ।" (কাপিল সূত্র ২।৩) শাস্ত্রের শ্রবণমাত্র দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, কেননা অনাদি বাসনা তাহার বলবৎ প্রতিবন্ধক। কিন্তু বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ বাসনাবৈরাগ্যদ্বারা শ্রবণাধ্যয়নে অধিকারী হয়েন। তৎফলে আত্মজ্ঞান লাভ এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎ মোক্ষ লাভ করেন।

১য। বাস্তবিক মোক্ষশাস্ত্রের শ্রবণে মতি হওয়া দুর্লভ। বহ্মপ্রতিপাদিকা শ্রুতিগণ শত হস্ত তুলিয়া বহ্মজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছেন; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, গীতা প্রভৃতি স্মৃতিগণ আত্মজ্ঞান প্রতিপাদন করিতেছেন; পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র-সকল ভূয়ঃ ভূয়ঃ বহ্মবিদ্যার গুণগান করিতেছেন; কিন্তু তাহার বক্তা, শ্রোতা ও বোদ্ধা অতি দুর্লভ। এই বর্ত্তমান কালে লৌকিক বিদ্যার অভাব নাই, শাস্ত্রীয় গ্রন্থেরও অভাব নাই, তথাপি কৃতবিদ্য পুরুষগণের আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক শাস্ত্রশ্রবণে মতিগতি হয় না কেন এবং শ্রবণ করিয়াও তাহা বোধগম্য হয় না কেন? এ কথার সংক্ষেপ উত্তর, সুকৃতির অভাব। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রচারার্থ উপনিষদের ভাষাবিবরণ কালে বুঝিয়াছিলেন যে, সেই মহাবিদ্যার প্রচারের পথে বিস্তর প্রতিবন্ধক আছে। তিনি যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের ভাষাবিবরণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যথা—"পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যের দ্বারা অথবা এতৎকালীন সুকৃতাধীন যে সকল ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে তাঁহাদের এই উপনিষদের শ্রবণ মননে অবশ্য যত্ন হইবেক এবং তাঁহারা ইহার অনুষ্ঠানের ন্যূনাধিক্যের দ্বারা বিলম্বে অথবা ত্বরায় কৃতার্থ হইবেন, আর যাঁহারা

যুদ্ধ বিগ্রহ হাস্য কৌতুক আহার বিহার ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারের শ্রবণ মননকে পরমার্থ জানেন তাঁহাদের প্রবৃত্তি এই শুদ্ধ পরমাত্ম-তত্ত্বের অভ্যাসে সুতরাং না হইতে পারে।" মহাত্মা রাজার এই আশঙ্কা অতীব সত্য। প্রথমতঃ সুকৃতি না থাকিলে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় মতি হয় না এবং লৌকিক ব্যবহারে কালহরাও রহিত হয় না। তৎসমস্ত চিত্তশুদ্ধিজনক কর্ম্মানুষ্ঠানেরও অন্তরায়। ব্রহ্ম-বিদ্যার তো কথাই নাই।

১০২। চিত্তশুদ্ধি, যাহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার একমাত্র হেতু, যাহা সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য শারীরক সূত্রের প্রথম সূত্রের "অথ"শব্দের তাৎপর্য্যে যাহা স্থাপন করিয়াছেন, তাহার শাস্ত্রসম্মত এই বিস্তীর্ণরূপে ব্যাখ্যাত ভাবার্থ যথাসাধ্য বর্ণন করিলাম। এত অধিক লিপির কারণ এই যে, অনেকে "চিত্তশুদ্ধি" শব্দটি মাত্র শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার অর্থ জানেন না। অনেকে বা আত্মমতে তাহার স্বকপোলকল্পিত অর্থ করিয়া লইয়াছেন। এই বর্ত্তমান সময়ে অনেকে পাশ্চাত্য বায়ুবেগে, বা স্বেচ্ছাবেগে চালিত হইয়া বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে এই অর্থানবগতি ও অর্থান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ভরসা করি, শাস্ত্রের এই ভাবার্থ অবগত হইলে তাঁহাদের বেদান্তালোচনার অধিকার সম্বন্ধে যথার্থবুদ্ধির উদয় হইবে।

১০৩। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এই উভয়ের মধ্যে যে সকল পার্থক্য পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার প্রথমটি মাত্র উপলক্ষ করিয়া আমি এতদূর লিখিলাম।

(৭) সদানন্দযোগীন্দ্র প্রভৃতির ব্যাখ্যা।

১০৪। ফলে এ সম্বন্ধে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীসদানন্দযোগীন্দ্র স্বীয় বেদান্তসার নামক গ্রন্থে যে সঙ্ক্ষেপ সিদ্ধান্তবাক্য নির্ণয় করিয়াছেন, এবং তাহার উপরি শ্রীরামতীর্থ স্বরচিত বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকাতে যে আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছেন তাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধির শাস্ত্রসিদ্ধতা এবং পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের প্রদর্শিত প্রাগুক্ত প্রথম প্রকারের পার্থক্যটি—এ উভয়ই বিশদ হইয়াছে। অতএব নিম্নে তাঁহার উক্তির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ দানে বাধ্য হইলাম।

শ্রীমান্ সদানন্দযোগীন্দ্র লেখেন—

১ ম। অধিকারী তু? বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিল বেদার্থোঽস্মিন্‌জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জন পুরঃসরং নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।

১ য। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার এবং বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণের অধিকারী কে? ইহার উত্তর দিতেছেন। যিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়নদ্বারা সামান্যতঃ সকল বেদার্থজ্ঞ। যিনি এই জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্যকর্ম্ম ও নিষিদ্ধকর্ম্ম বর্জ্জনপূর্ব্বক, সন্ধ্যা-উপাসনাদি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান, পুত্রজন্মাদি নিমিত্ত জাতেষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞ অর্থাৎ দশসংস্কারের অনুষ্ঠান, পাপক্ষয় নিমিত্ত চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাচরণ, চিত্তের একাগ্রতাজনক সগুণব্রহ্মবিষয়ক শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ভক্তিসাধন বিদ্যা এবং কর্ম্মযোগের সাধনরূপ মানসব্যাপারবিশিষ্ট উপাসনার অনুষ্ঠান করতঃ সকল পাপের অভাব

হেতু অন্তঃকরণের আত্যন্তিক নৈর্ম্মল্য লাভ করিয়াছেন, এবং যিনি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক; ইহকালপরকালে ফলভোগবিরাগ; শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা ইত্যাদি সাধনসম্পত্তি, এবং মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষের ইচ্ছা উপার্জ্জন করিয়াছেন তাদৃশ জীব (অর্থাৎ এই সমগ্র সাধনসম্পন্ন পুরুষ) বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যয়নে ও গুরূপদেশশ্রবণে এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকারী হয়েন। তিনিই বৈদান্তিক জ্ঞানলাভের যোগ্যপাত্র। যেমন নান্দীমুখ, অধিবাস ও অভিষেকাদি মঙ্গলক্রিয়া দ্বারা বিবাহার্থী পুরুষ বিবাহের যোগ্য সংস্কৃতপাত্র হয়,সেইরূপ ঐ সকল প্রাগানুষ্ঠানসম্পাদ্য চিত্তশুদ্ধিদ্বারা পুরুষ বেদান্ত অধ্যয়ন ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সংস্কৃতপাত্র হন। বেদান্তশাস্ত্র মতে তিনি প্রমাতা শব্দে উক্ত হয়েন।

১০৫। সদানন্দযোগীন্দ্রের এই সঙ্ক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তবাক্যগুলি শ্রুতি ও স্মৃতিসিদ্ধ। বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকাতে এসমস্তের বিস্তীর্ণ বিচার এবং ব্যাখ্যা আছে। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মধ্যে শঙ্করাচার্য্য যে সকল পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের পার্থক্য উপলক্ষ করিয়া আমি এপর্য্যন্ত শাস্ত্রার্থ বর্ণন করিতেছি। সেটি ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থানে স্মরণার্থ তাহার পুনরুক্তি করিতেছি।

১ র। ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপি অধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপপত্তেঃ। ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অগ্রেও অধীতবেদান্ত ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে। অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা অপেক্ষিত নহে।

১০৬। ইহার তাৎপর্য্য ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। যথা ফলাভিসন্ধিবিশিষ্ট বৈদিককর্ম্ম, তাহার জ্ঞান এবং বিচার ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে অপেক্ষিত নহে। এই সম্বন্ধে উক্ত টীকা যত কথা লিখিয়াছেন তাহাই যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১ ল। অধিকারী তু ইতি। ধর্ম্মজিজ্ঞাসাধিকারিণোঽস্য বৈলক্ষণ্যসূচনার্থস্তুশব্দঃ প্রমাতাধিকারীত্যন্বয়। লৌকিক বৈদিক ব্যবহারেষু অভ্রান্তো জীবঃ প্রমাতা ইহ বিবক্ষিতঃ। * * তস্য তুশব্দসূচিতং বিশেষনাহ। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ইতি। বক্ষ্যমান সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ নতাবদ্বেদাধ্যয়নং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকার হেতুঃ। * *। নাপি ধর্ম্মবিচারঃ। প্রাগপি ধর্ম্মবিচারাৎ অধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। নাপিধর্ম্মানুষ্ঠানমিহ জিজ্ঞাসাহেতুঃ। বিনাপি ধর্ম্মানুষ্ঠানং ব্রহ্মচর্য্যাদেব বিরক্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা দর্শনাৎ। তস্মান্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাহেতুঃ।

১ ব। অধিকারী কে? ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এ দুয়ের অধিকারীর বৈলক্ষণ্য দেখাইতেছেন। এস্থানে জীবই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কর্ত্তা বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞাতা বিধায় তিনি প্রমাতা শব্দের বাচ্য। তাঁহার লক্ষণ কি? না লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারেতে যিনি অভ্রান্ত, এমন যে জীব তিনি প্রমাতা শব্দে এস্থানে উক্ত হইয়াছেন। তিনি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন সংস্কৃতপাত্র। তাদৃশ প্রমাতা জীব অধিকারী। সমগ্রবেদাধ্যয়নই যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকারহেতু এমত নহে। ধর্ম্মবিচারও হেতু নহে। কেননা ধর্ম্মবিচারের পূর্ব্বেও অধীত-বেদান্ত ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মে। এমন দেখা গিয়াছে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান বিনা কেবল

ব্রহ্মচর্য্য হইতেই বিরক্ত পুরুষের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমই বেদবিধি-বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্থান। ব্রহ্মচারী সে আশ্রমে পুনরাগমন না করিয়া বৈরাগ্যবশতঃ একেবারে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু নহে। এস্থানে গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় ফলপ্রদধর্ম্মে নিঃসম্বন্ধ বিধায় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমীকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাতে নিঃসন্দেহে বুঝা যাইতে পারে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বা বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারজনক নহে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে অধীত-বেদান্ত ব্যক্তি যদি একাএক সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক অনাশ্রমী হন, তবে তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করায়, তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহস্থের বিধিবিহিত কাম্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসম্ভব। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় তাঁহা কর্ত্তৃক বেদান্তপাঠের সহিত যে সকল সন্ধ্যা বন্দনাদি চিত্তশুদ্ধিজনক নিষ্কাম তপস্যা আচরিত হইয়াছে তাহাই জন্মান্তরীয় পুণ্যযোগে তাঁহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু হয়। এইজন্য কথিত হইয়াছে যে, অধীত-বেদান্ত ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে। তাহাতে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ বৈধ কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষিত নহে। ফলে তাই বলিয়া তাহাতে গৃহস্থের অনধিকার এমন কেহ না মনে করেন। কাম্যকর্ম্ম তাহার হেতু না হইলেও নিষ্কামকর্ম্ম চিত্তশুদ্ধিজনক রূপে হেতু হয়। ইহার প্রমাণ এই শ্রুতি—"তমেতং (আত্মানং) বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন"। সেই যে এই আত্মা তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠের দ্বারা এবং যজ্ঞ দান তপস্যা ও উপবাসের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। এ বচন গৃহস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণপর। আর বিবিদিষন্তি" শব্দদ্বারা জানাইতেছেন যে গৃহীব্রাহ্মণেরা সেই আত্মাকে জানিবার নিমিত্তে বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও উপবাসাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানিবার ও লাভ করিবার কামনায় এই সকল ধর্ম্মাচরণ করেন তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান অন্যফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত। সুতরাং তাহা চিত্তশুদ্ধির হেতু এবং সেই চিত্তশুদ্ধি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও তদনুকূল বেদান্ত অধ্যয়নের হেতু। ব্রহ্মচার্য্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমীর স্ব স্ব আশ্রমবিহিত তপস্যাদি যেমন চিত্তশুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় করে; গৃহস্থের ও পরমাত্মাকে জানিবার ইচ্ছাযুক্ত তপস্যা ও যজ্ঞাদি নিষ্কামধর্ম্ম তদ্রূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারজনক সে নিষ্কামধর্ম্মটি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিরোধী ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বা ধর্ম্মানুষ্ঠান নহে। মহর্ষি জৈমিনির বেদবিচারময় মীমাংসাদর্শনে এই সব সকাম বেদবিহিত ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মবিচার নামক বেদান্তশাস্ত্র তাহা হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত; এবং নিষ্কাম ধর্ম্মোত্থিত চিত্তশুদ্ধিরূপ অধিকার, সে শাস্ত্রের ও তৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রবেশদ্বার। এতাবতা নিত্যনৈমিত্তিকাদি নিষ্কামধর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির হেতু, আর যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে তিনিই বেদান্তশাস্ত্রের ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞান ও ফলপ্রদ বা বিধিকৈঙ্কর্য্যরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষিত নহে।

১০৭। এই চিত্তশুদ্ধি এক জন্মের তপস্যাদি নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল নহে। হয়তো কাহারো পক্ষে বহুজন্মের উপার্জ্জিত ফল এই জন্মে পরিপক্ক হয়, কাহারো পূর্ব্বজন্মে পরিপক্ক

হইয়াছে, কাহারো পরজন্মে পরিপক্ক হইবে। পরিপক্ক হইলেই তাহা যপ্ত মন্ত্রের ন্যায় সাধককে বেদান্ত অধ্যয়নে এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী করিবে। শ্রীমান্ সদানন্দের "অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা" উক্তির এই সমগ্র-তাৎপর্য্য। ইহার এমন অর্থ নহে যে, কোন নিত্য নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়ারহিত অথচ সংসার-বিষয়াসক্ত ব্রহ্মবদনশীল বা বেদান্তবাদীকে দৃষ্ট হইলেই মনে করিতে হইবে যে পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার ফলে ইহাঁর চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে এবং সেইজন্য এজন্মে ব্রহ্মজ্ঞান ও বেদান্ত আশ্রয় করিয়াছেন। কেননা চিত্তশুদ্ধি এমন এক পদার্থ যাহা বেদান্ত অধ্যয়ন ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হেতুস্বরূপ অনুষ্ঠান সকল দেখাইয়া থাকে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা স্বয়ং অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ হইলেও, ওসমস্ত অনুষ্ঠান রহিত হয় না। এসম্বন্ধে বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী যাহা লেখেন তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

১শ। "অস্মিন জন্মনি জন্মান্তরে বেতি। অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততোযাতি পরাংগতিং। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ইত্যাদি স্মৃতের্জন্মান্তরানুষ্ঠিতস্যাপি জন্মান্ত রোপকারকত্ব সম্ভবাদিতিভাবঃ।"

চিত্তশুদ্ধির হেতুভূত তপস্যাদির অনুষ্ঠান এই জন্মেরও সাধন হইতে পারে, জন্মান্তরেরও হইতে পারে। তাহা অনেক জন্মে সিদ্ধ হয়। তৎফলে পুরুষ পরাগতি লাভ করেন। শুভ কর্ম্মের আচরণশীল কোন ব্যক্তির দুর্গতি হয় না। ইত্যাদি স্মৃতিবচনানুসারে জন্মান্তরের অনুষ্ঠিত তপস্যাদি শুভকর্ম্মের উপকারিতা জন্মান্তরে সম্ভব হয়। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিজনক ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম ব্যর্থ হইবার নহে।

১০৮। শ্রীমান্ সদানন্দযোগীন্দ্র চিত্তশুদ্ধি বিষয়ে যে কয়েকটি কথা কহিয়াছেন তাহা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহাতে "আপাততোঽধিগতাখিলবেদার্থঃ" এই বাক্যটি আছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন দ্বারা "আপাততঃ" (সামান্যতঃ) সকল বেদার্থজ্ঞ, তাদৃশ ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। অবশ্য উক্ত যোগীন্দ্র এই সঙ্গে চিত্তশুদ্ধির অন্যান্য অঙ্গেরও উল্লেখ করিয়াছেন। স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় ঐ "আপাততঃ" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন "সামান্যতঃ"। এই অর্থ ধরিলে এইরূপ মনে হইবে যে, বেদান্তাধ্যয়নেচ্ছু ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে, বেদের সাধারণ অর্থজ্ঞান থাকিলেই প্রচুর। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, কর্ম্মকাণ্ডী বৈদিকের ন্যায় অথবা পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের ও কল্প-সূত্রাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ও ব্যবস্থাপক-গণের ন্যায় তাঁহার সমগ্র মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবর্গের পারদর্শী হওয়া প্রয়োজনীয় নহে। এ অর্থ অসঙ্গত নহে; কেননা ব্রহ্মবিদ্যাসোপার্জ্জনে তাহা অপেক্ষিত নহে। কিন্তু বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উক্ত "আপাততঃ" শব্দের আরো সংক্ষিপ্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

১ষ। "আপাতত ইতি। আপাততো বিচারেণেদং পদ্যাবধারণমন্তরেণ অধিগতো-ঽখিল বেদার্থো যেন সতথা, বেদশব্দো বেদান্ত বিষয়ঃ। অধিগতাখিল বেদান্তার্থ ইত্যর্থঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "সকল বেদার্থজ্ঞ" বাক্যের ভাবার্থ "সর্ব্ববেদান্তার্থ।" এ অধি-কারে "বেদ" শব্দ "বেদান্ত বিষয়" (অর্থাৎ উপনিষদার্থ)। আপাততঃ কিম্বা সামান্যতঃ

প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তাঁহার জ্ঞান প্রয়োজন। সেই সামান্য বেদার্থজ্ঞান অর্থাৎ বৈদান্তিক জ্ঞান চিত্তশুদ্ধির সহকারিতায় বেদান্তের বিশেষজ্ঞানে ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার যোগাইয়া দেয়।

১স। "ইদানীমুক্তলক্ষণানাং নিত্যাদীনামীশ্বরার্পণতয়ানুষ্ঠীয়মানানাং পরমফলং দর্শয়তি। আদিপদান্নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তয়োর্গ্রহঃ। নিত্যনৈমিত্তিকৈরেবকুর্ব্বাণোদুরিতক্ষয়মিত্যাদিস্মৃতেঃ। ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতীতি শ্রুতেশ্চ। চিত্তশুদ্ধেঃ পরম প্রয়োজনত্বং পরস্পরয়া মোক্ষসাধনত্বাৎ। তথাচ স্মৃতিঃ, স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতিতচ্ছৃণু ইত্যুপক্রম্য, অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতীতি। তদুক্তং। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধাবপি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাদ্ধর্ম্মোৎপত্তিঃ পাপহানিঃ ততশ্চিত্তশুদ্ধিস্ততঃ স্বসংসারাত্মযাথাত্ম্যাববোধস্ততো বৈরাগ্যং ততো মুমুক্ষুত্বং ততস্তদুপায়পর্য্যেষণং ততঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস্ততো যোগাভ্যাসস্ততশ্চিত্তস্য প্রত্যক্ প্রবণতা ততস্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থপরিজ্ঞানং ততোঽবিদ্যোচ্ছেদস্ততঃ স্বাত্মন্যবস্থানমিতি"। এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য নিম্নে দিতেছি।

১স্থ। এইক্ষণে ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত লক্ষণবিশিষ্ট ঈশ্বরার্পিতভাবে অনুষ্ঠীয়মান শাস্ত্রবিহিত নিত্যাদি কর্ম্মের পরমফল দেখাইতেছেন। "নিত্যাদি" শব্দেতে যে "আদি" পদটি আছে তাহার অর্থ নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্তকর্ম্ম। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দুরিত ক্ষয় হয় ইহা স্মৃতিতে কহেন। ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠানে পাপ নষ্ট হয় ইহা শ্রুতিতেও আছে। চিত্তশুদ্ধির পরম পয়োজনত্ব, কেননা তাহা পরম্পরা মোক্ষসাধক। গীতাস্মৃতিতে আছে, যে সকল মনুষ্য স্ব স্ব কর্ম্মে অর্থাৎ স্বধর্ম্মে অভিরত তাঁহারা সিদ্ধি লাভ করেন। স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তি যেরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন তাহা শ্রবণ কর। গীতাতে এইমাত্র উপক্রম পুরঃসর কহিতেছেন। যাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বত্রে অসক্ত অর্থাৎ আসক্তিশূন্য, যিনি জিতাত্মা ও স্পৃহাশূন্য তিনি সেই সন্ন্যাসদ্বারা অর্থাৎ আসক্তিরাহিত্যদ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন। ইহা এইরূপে উক্ত হইয়াছে যে, নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হইলেও, নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মোৎপত্তি হয় এবং পাপহানি হয়, তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহার পর স্বীয় সংসারাত্মভাবের যথার্থতত্ত্বের বোধজন্মে, তৎফলে বৈরাগ্য, তৎপরে মুক্তির ইচ্ছা, তৎপরে তাহার উপায়লাভের যত্ন, তদুত্তর সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস, তৎপরে যোগাভ্যাস, তাহার পর চিত্তের প্রত্যক্‌চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মধারণক্ষমতা, তদুত্তর তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের অর্থজ্ঞান, তৎফলে অবিদ্যার উচ্ছেদ, অবশেষে স্বীয় প্রকৃত আত্মস্বরূপ পরমাত্মাতে অবস্থিতি। ইতি

১০৯। এতাবতা চিত্তশুদ্ধির হেতুসমস্ত ও তাহার উত্তরোত্তর ক্রমপরম্পরা-ফল উক্ত হইল। চিত্তের প্রত্যক্‌প্রবণতা, মহাবাক্যসকলের অর্থজ্ঞান, অবিদ্যার উচ্ছেদ এবং আত্মাতে স্থিতি এই চারিটি অবস্থা যুগপৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও বেদান্তানুশীলনের অবস্থা। তৎপূর্ব্বকার উপায়গুলি সমস্তই চিত্তশুদ্ধিসংযুক্ত সাধনসম্পত্তি। তৎসমস্তসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়

ফলপ্রদ বা বিধির দাসত্বরূপ কর্ম্মকাণ্ড অপেক্ষিত নহে। কিন্তু তাহার অধিকারী হইবার নিমিত্তে প্রাগুক্ত লক্ষণসিদ্ধাবস্থার প্রয়োজন।

১১০। এ সম্বন্ধে মহাত্মা রামমোহন রায়ও কিঞ্চিৎ বিচার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১ক। জ্ঞান, মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়েন। অন্য কোন সাধন মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয় না। বেদান্তে ও গীতাদি মোক্ষশাস্ত্রে নিষ্কামকর্ম্মপ্রবাহ ইহজন্মে কিম্বা পরজন্মে চিত্তশুদ্ধির কারণ কহেন, চিত্তশুদ্ধি জ্ঞানেচ্ছার কারণ হয়, জ্ঞানেচ্ছা শ্রবণ মননাদি সাধনের কারণ, সেই সাধন জ্ঞানোৎপত্তির কারণ আর জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ হয়েন। যেমন কর্ষণাদি ক্রিয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বর হইবার কারণ হয়, আর উর্ব্বরা হওয়া উত্তম শস্যের কারণ, শস্য তণ্ডুলের কারণ, তণ্ডুল ওদনের কারণ, ওদন ভোজনের কারণ, ভোজন তৃপ্তির কারণ, অতএব কোন শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমত কহিবেন যে তৃপ্তির কারণ "যেমন" ভোজন হয় "তেমন" ক্ষেত্রের কর্ষণাদি ক্রিয়াও তৃপ্তির কারণ হয়।"

(রাঃ মোঃ রা গ্রন্থাবলি ৩০২ পৃ)

মহাত্মা রামমোহন রায়ের এই সব উক্তি বিদ্বন্মনোরঞ্জিনীর সহ তাৎপর্য্যতঃ এক। সমুদয়ের সংগৃহীত অভিপ্রায় এই যে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ফলজনক কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞান, তাহার অনুষ্ঠান, এবং কর্ম্মাববোধনরূপ বেদের তাৎপর্য্য—এ সমস্ত ফলকামী কর্ম্মীদিগের অধিকার-দৃষ্টিতে উক্ত হইয়াছে। মহর্ষি জৈমিনি কহিয়াছেন, "চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ" ধর্ম্মের লক্ষণই এই যে,তিনি জীবের স্বভাব বা অদৃষ্টস্থান অধিকার করিয়া ফলনিমিত্ত ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক হয়েন। "চোদনানিমিত্তং ধর্ম্মস্যজ্ঞানং" অদৃষ্ট হইতে অলক্ষ্যভাবে ধর্ম্মের যে ক্রিয়াচরণের প্রতি উত্তেজনা হয় তন্নিমিত্ত ধর্ম্মজ্ঞানের প্রয়োজন।

(৮) শঙ্করের নির্ণীত প্রথম প্রকার পার্থক্য ও চিত্তশুদ্ধির উপসংহার।

১১১। মহর্ষি জৈমিনির বিচারিত এই বিধিবিহিত ধর্ম্মের জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, বেদান্তশাস্ত্র ও তৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অঙ্গ নহে। অতএব শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই যে, তাদৃশ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান না থাকিলেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে। কিরূপ অধিকারীতে জন্মিতে পারে? না যিনি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। বেদান্ত অধ্যয়নের পাত্র কে? না যাঁহার পূর্ব্বোক্ত নিষ্কামকর্ম্ম ও সন্ধ্যাবন্দনাদি তপস্যা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া সাধনচতুষ্টয় উপার্জ্জিত হইয়াছে। ফলে ইহার পর বুঝা যাইবে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে, যেমন কাম্যকর্ম্মের কোন লক্ষণ নাই, সেইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের, ও সন্ধ্যাবন্দনাদি তপশ্চরণের ও নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্তক্রিয়ারও কোন লক্ষণ ও পদ্ধতি নাই। কেননা তৎসমস্তই মন্ত্রসমবায়ী ক্রিয়া। সেই সব ক্রিয়ার মধ্যে যতপ্রকার উপাসনা-লক্ষণ বিদ্যমান আছে সমস্তই সমন্ত্রক। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ও তৎপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলন অমন্ত্রক। তাহাতে উপরিউক্তপ্রকার কোনরূপ উপাসনাক্রিয়ার লক্ষণ বিদ্যমান নাহি। তাহা নিষ্কামও বটে, অমন্ত্রকও বটে এবং উপাসনা-লক্ষণ বিহীনও বটে। ধ্যান ও সমাধি প্রভৃতি যোগও একপ্রকার মানসিক উপাসনাক্রিয়া। ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনে সেরূপ কোন ক্রিয়া-ধর্ম্ম নাহি।

তাহা সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াধর্ম্মের অতীত। তাহা স্ব-প্রকাশস্থ। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অধিকারস্থ। শঙ্করাচার্য্য সেই দৃষ্টিতে জ্ঞান ও ধর্ম্মের পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের পার্থক্যটি ও চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে এতদূর বলা গেল।

ইউরোপীয়গণ ভারতসন্তান।

(২)

আমাদের শতপথ ব্রাহ্মণও বলিয়া গিয়াছেন যে "বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ." যাঁহারা কৃতবিদ্য ছিলেন, তাঁহাদের উপাধিই দেবতা ছিল। গ্রীকগণ যে আপনাদিগকে দেবপুত্র বলিয়া জানিতেন তাহার সমর্থনার্থ আমরা নিম্নে কতিপয় প্রমাণের অধ্যাহার করিব।

> Macedon is the sun of Zeus,
> Lacedaemon is the son of Zeus,
> Targitaus is the son of Zeus,
> Dardanus is the son of Zeus,
> Scythes is the son of Zeus,
> Corinthus is the son of Zeus,
> Thrax is the son of Ares,
> Boeotus is the son of Poseidon,
>
> Pococke—2

এই জিউস্ কথাটি সংস্কৃত দেবস্ কথারই অপভ্রংশ। সুতরাং মাসিডন ও করিন্থ প্রভৃতি দেশবাসীরা যে আপনাদিগকে দেবসন্তান বলিয়া জানিতেন, ইহা দ্বারাও তাঁহাদের ভারতসাগন্ধ্য যেন পরিস্ফুটিত হইতেছে। আর থ্রাক্সবাসীরা যে আপনাদিগকে এরিসের সন্তান বলিত, উক্ত Ares কথাটিও আর্য্যস্ কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, গ্রীক ও লাটিন শব্দের নিদান কি? আফগানিস্থানের রোমকপত্তনবাসী কম্বোজেরা আপনাদিগকে রোমক বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে Roman কথাটি ব্যুৎপাদিত। লাটিন কথার নিদান কি, তাহা এখনও দুর্জ্ঞেয়। গ্রীক কথার নিদান বলিতে যাইয়া এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বলিতেছেন যে—

> The name Graikai probably meant the "old" or "Honorable" folk. The Italians may have enlarged the application of this name, which they found on the eastern side of the Ionian Gulf".

কিন্তু আমরা এই উক্তির সমর্থন করিতে

তত দূর অগ্রসর নহি। কেননা তাঁহারা বলিতেছেন যে—

Probably

অর্থাৎ সম্ভবতঃ। কিন্তু তাহাতে মন তৃপ্ত হইতে পারে না। মহামতি পোকক তাঁহার গ্রন্থের ২৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় বলেন যে—জরাসন্ধের রাজধানী রাজগৃহ শব্দের গৃহ শব্দ হইতে গ্রীক বা গ্রেইকস শব্দ ব্যুৎপাদিত, তদ্দেশবাসীরাই ইউরোপে আসিয়া গ্রীকনামে প্রখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইহা প্রকৃত বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ শক, যবন ও কম্বোজেরা কেহই রাজগৃহ বা পাটনাবাসী ছিলেন না। ফলতঃ যেরূপ স্বর্গের শর্ম্মণা অর্থ গৃহবাসী, উহার অপভ্রংশে ভারতে শর্ম্মা শব্দ ব্যুৎপাদিত, তদ্রূপ গৈহিক বা গৃহৌকাঃ শব্দের অপভ্রংশে উক্ত গ্রীক শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়া থাকিবে। তৎকালে যাঁহারা শর্ম্ম (Home) বা গৃহে বাস করিতেন, তাঁহারাই সমধিক সভ্য ছিলেন। ইহাও প্রাদেশিক পরিভাষাবিশেষ মাত্র। তাই কেহ শর্ম্মণা ও কেহ বা গৈহিক বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছেন। কেহ বা স জ্ঞান্তর দ্বারা বিশেষিত হইয়াছিলেন। বলিতে পার, গ্রীক ও লাটিনগণ যে এক মূলজ তাহা কি পাশ্চাত্যগণও স্বীকার করিয়া থাকেন? হাঁ, এন্সাইক্লোপিডিয়া বিটেনিকা এইরূপই বলিয়াছেন।

Two main threads link together the earlier and later history of civilized man, one passing through Rome, and is Latin, the other passes through the new Rome in the east, and is Greek.

কিন্তু শক, যবন ও কম্বোজদিগের দ্বারা গ্রীশই সর্ব্বপ্রথম অধ্যুষিত হইয়াছিল, পরে গ্রীশ হইতে কতকগুলি লোক ইটালীতে যাইয়া লাটিন জাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করেন। যাহা হউক আমরা যাহা যাহা বলিলাম, বোধ হয় তৎপাঠে প্রবীণেরা সংস্কৃতপ্রান্তভাষী গ্রীক ও লাটিনগণকে ভূতপূর্ব্ব ভারত সন্তান বলিতে আর ইতস্ততঃ করিবেন না।

অতঃপর আমরা জর্ম্মাণ ও শাকসন জাতির কথা বলিব। ইঁহারাও ভারতেরই শর্ম্মণ বা ব্রাহ্মণ এবং সূর্য্যবংশ (কার্য্যতঃ বৈবস্বত) প্রভব শকসূনুগণ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কেন ভারতের শক, যবন ও কম্বোজগণ ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সিন্ধুসৈকতবাসী শকেরা আপনাদিগের গুরু, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণসহ সর্ব্বাদৌ অন্তরিক্ষের প্রান্তভূমি তুরুস্কে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। যদাহ অথর্ব্ববেদঃ—

যং শকা বাচমাকহন্ অন্তরিক্ষম্।

যেহেতু শকেরা শাকারি ভাষা লইয়া অন্তরিক্ষে গমন করিয়াছিলেন। অন্তরিক্ষ কোন্ দেশ? অপোগস্থান, পারস্য ও তুরুস্ক দেশ লইয়া দ্যুলোক বা অন্তরিক্ষ পরিগণিত। সগর সন্তাড়িত শকেরা অন্তরিক্ষের প্রান্তভূমি তুরুস্কে গমন করেন। তাই ভবিষ্য পুরাণেও বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়—

তালজঙ্ঘৈর্হৈহয়ৈশ্চ
তুরুষ্কৈর্যবনৈঃ শকৈঃ।
উপোষিত মিহাত্রৈব
ব্রাহ্মণৈস্ত মতীশ্বভিঃ॥

তালজঙ্ঘ হৈহয় ও তুরুস্কগত শকযবন ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য বহু উপবাস

ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তবে কি শকেরা ভারতের বহির্দেশবাসী অনার্য্য জাতিবিশেষ নহে? তাহারা কি কাস্পীয়ান সাগরের তীরদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল না?

"A grand Scythic nation extended from the Caspian to the Ganges" India in Greece. Page 51.

হাঁ, সাহেবেরা এইরূপই বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের কথার সমর্থক কোন প্রমাণ অদ্যাপি দৃষ্ট হয় নাই। ফলতঃ শকগণ সূর্য্য-বংশীয় ক্ষত্রিয়, তাঁহারা ভারতের বৈবস্বত মনুর নেদিষ্ঠ দায়াদ। সুতরাং তাঁহারা ভারত হইতে কেহ কাস্পীন সাগরের বেলা ভূমিতে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন, পরন্তু কাস্পীন সাগরের বেলা হইতে তাঁহারা ভারতে আগমন করেন নাই। তাঁহাদেরই আর একদল সগরসন্তাড়নে নিশর হইয়া গ্রীসে প্রবেশ করেন ও আর এক দল তুরুস্কে বস-বাসের পর ইউরোপের উদীচ্য ভূমিতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। উঁহারা যে বৈবস্বত মনুর সন্তান তাহার কোন প্রমাণ আছে? অবশ্যই আছে। বায়ুপুরাণের উত্তরখণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের ২৯। ৩০ শ্লোকে বিবৃত আছে—

> ইক্ষ্বাকুশ্চৈবনাভাগো
> ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।
> নরিষ্যন্তশ্চ বিখ্যাতো
> নাভানেদিষ্ঠ এবহি॥ ৩৪
> করূষশ্চ, পৃষধ্রশ্চ
> বসুমান্ লোকবিশ্রুতঃ।
> মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে
> নব পুত্রাশ্চ ধার্ম্মিকাঃ॥ ৩৫
>
> ১অ ৩অংশ—বিষ্ণুপুরাণ।

অযোধ্যার অধিপতি বৈবস্বত মনুর নয় পুত্র। যথা—

ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভানেদিষ্ঠ, করূষ, পৃষধ্র, ও বসুমান্। ইহাঁরা সকলেই ধার্ম্মিক ছিলেন। নরিষ্যন্তের বংশ-ধরেরাই সর্ব্বত্র শক বলিয়া প্রখ্যাত। যথা—

> নরিষ্যতঃ শকাঃ পুত্রা
> নাভাগস্ত্তু ভারত।
> অম্বরীষোঽভবৎ পুত্রঃ
> পার্থিবর্ষভসত্তমঃ॥ ২৮—১০ অ
>
> হরিবংশ।

ভারতবর্ষে আরও একজন নরিষ্যন্তনামে রাজা ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম মহারাজ মরুত্ত ও পুত্রের নাম দণ্ডধর, সুতরাং তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। শকগণ তাঁহার সন্তান নহেন। শকেরা সিন্ধুসৈকতের সামন্ত রাজা ছিলেন। উক্তঞ্চ—

> গান্ধারা যবনাশ্চৈব
> সিন্ধুসৌবীরমদ্রকাঃ।
> শকাহ্রদা পুলিন্দাশ্চ
> পারদাহারপূরিকাঃ॥ ১১৬
> অপগাশ্চালিমদ্রাশ্চ
> কিরাতানাঞ্চ ভূময়ঃ।
> এতে দেশা উদীচ্যাঞ্চ
> প্রাচ্যান্ দেশান্ নিবোধত॥ ১২১
>
> ৪৫ অ—পূর্ব্বখণ্ড—বায়ু।

অর্থাৎ গান্ধার (কান্দাহার), যবন (দক্ষিণ-পারস্য), সিন্ধুসৌবীর, মদ্র, শক, হ্রদ, পুলিন্দ, পারদ (উত্তর পারস্য), হারপূরিকা, অপোগ-স্থান, অলিমদ্র ও কিরাত (বেলুচিস্থানস্থ খিলাত) রাজ্য, ইহা ভারতের উদীচ্য জনপদ, পূর্ব্ব জন-পদের কথাও বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর।

সুতরাং এহেন সূর্য্যবংশীয় (প্রকৃত পক্ষে বৈবস্বত বংশীয়) ভারতবাসী ক্ষত্রিয়গণকে কাস্পীয়ান সাগরের বেলাবাসী বলা যুক্তির কার্য্য নহে।

আচ্ছা বুঝিলাম,শকেরা তুরুষ্কদেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, পরে কেন তাঁহারা ইউরোপে গমন করিলেন? কেন গেলেন, তাহার কোন হেতু লিপিবদ্ধ হয় নাই, তবে তৎকালে লোক সকল যাযাবরভাবে শস্য-প্রধান উর্ব্বর ভূমি লক্ষ্য করিয়া চলিতেন, তজ্জন্য বোধ হয়—শকেরা নূতন স্থলে পরিণত হরিযুপীয়াতে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সম্ভবতঃ তুরস্কে ককেশশ পর্ব্বতের প্রান্তভূমিতে বাস করিতেছিলেন, তাই ইউরোপীয়গণ আপনাদিগকে "ককেশীয় জাতি" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এখান হইতে সকল ব্যক্তিই ইউরোপে গমন করিয়াছিলেন না। যাঁহারা এখানে থাকিয়া যান, তাঁহারাই সর্ব্বত্র আরমাণী ও তাঁহাদিগের অধ্যুষিত স্থান অর্জ্জরম বলিয়া প্রথিত। বোধ হয় ঐ শব্দ দুইটি যথাক্রমে "আর্য্যমানব" ও "আর্য্যরম" (আর্য্যা রমন্তে অত্র) শব্দের বিপরিণতি-বিশেষ। যাহা হউক এই শকস্মুগণ ও তাঁহা-দিগের গুরু পুরোহিত শর্ম্মগণেরা এখান হইতে প্রথমে যাইয়া ইউরোপে যে দুইটি স্থানে গৃহ-প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ স্থান দ্বিতয় যথাক্রমে "শিদিয়া" ও "শর্ম্মেশিয়া" নামের বিষয়ীভূত হয়। এই শিদিয়া জনপদ কাস্পিয়ান সাগরের সুদূর উত্তরে ইউরোপের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। আর শর্ম্মেশিয়া রাজ্যের একটি আজফ সমুদ্রের তীরে, অপরটি বর্ত্তমান জর্ম্মাণীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ক্রমে ইঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান শাকসনী ও জর্ম্মাণী রাজ্যের গেহ-প্রতিষ্ঠা করেন।

শাকসনী নামের নিদান কি? শকস্মুরা যাইয়া যে জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহা-দিগের নামানুসারে তাহাই শাকসনী নামে প্রথিত হয়, শাকসন জাতির নামও উক্ত শক-স্মু শব্দ হইতে ব্যুৎপাদিত। এবং শর্ম্মন্-দিগের প্রতিষ্ঠাপিত জনপদই ক্রমে শর্ম্মেশিয়া বা জর্ম্মাণী নামে প্রখ্যাতিলাভ করে।

শকগণের সহিত যে ব্রাহ্মণেরা গিয়াছিলেন ইহার প্রমাণ কি? প্রমাণ যুক্তিও বটে, কতক অনুমানও বটে। রাজগণের সহিত গুরুপুরোহিত যাওয়া বিচিত্র নহে। তাঁহারা মিশর বা গ্রীশের দিকে না যাইয়া বিশেষ অনু-রক্ত শকগণের সহিত মধ্য ইউরোপে গমন করিয়া থাকিবেন। শর্ম্মিশিয়া নাম প্রথমতঃ শর্ম্মন্দিগের সমাগম হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়, তৎপর পোলাণ্ডের শর্ম্মন্ জাতি ও জর্ম্মাণ জাতিও সে বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিয়া থাকে।

প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ।

এই কবিবাক্য জর্ম্মাণদিগের সংস্কৃতানুরাগ ও সংস্কৃতচর্চ্চার সমর্থন করে। তৎপর শর্ম্মন্ শব্দ বিকৃত হইয়া জর্ম্মাণ শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে, ইহা দ্বারাও শর্ম্মন্দিগের জর্ম্মাণজাতিতে টানিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। যে প্রকার "বিশিখ পত্তন" নগর ও "ইংলিশ" কথাটি বিকৃত হইয়া বিজিগাপাটন ও ইংরাজ শব্দে পরিণত হইয়াছে, তদ্রূপ শর্ম্মনের শ জকারে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। তবে বেদে একটি পূজনীয়ার্থক "জরমাণ" শব্দও রহিয়াছে। শর্ম্মেসিয়া শব্দ শর্ম্মন্ ও জর্ম্মাণ এবং জর্ম্মাণী শব্দ সেই জরমাণ শব্দ হইতেও ব্যুৎপাদিত হইতে পারে।

জরমাণঃ সমিধ্যাসে বেদেভ্যো হব্যবাহন
ত্বং ত্বাহ্বন্ত মর্ত্যাঃ॥ ৫—১১৮ সূ—১০ম

তত্র সয়ণাচার্য্যঃ—হে হব্যবাহন জরমাণঃ স্তোতৃভিঃ স্তূয়মানঃ স ত্বং দেবেভ্যঃ দেবার্থং সমিধ্যাসে হবির্ভিঃ সম্যক্ দীপ্যসে। তং তাদৃশং ত্বা ত্বাং মর্ত্ত্যা হবন্ত আহ্বয়ন্তি।

ইউরোপে যাইয়া ব্রাহ্মণেরা হয় ত বলিয়াছিলেন "বয়ং জরমাণাঃ পূজনীয়াঃ,"তাহা হইতে তাঁহাদিগের জরমাণ আখ্যা হওয়া বিচিত্র নহে। পক্ষান্তরে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে জর্ম্মাণেরা আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠতম, কেন? তাঁহাদিগের ভুতপূর্ব্ব ব্রাহ্মণত্বই উহার একমাত্র কারণ। তৎপর জর্ম্মাণেরা বলিয়া থাকেন যে, আমরা আর্ম্মেণিয়ার ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী। এই জন্যই আমরা শকগণের গুরু পুরোহিতসহ গমনের কথা বলিয়াছি। এদিকে শাকসন ও জর্ম্মাণ ভাষা সম্পূর্ণ সংস্কৃতবহুল, তজ্জন্যও উহাদিগের ভূতপূর্ব্বভারতসন্তানত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। কেবল আমাদিগের অনুমান নহে, মিশরবাসীদিগের ন্যায় জরমাণগণও আমাদিগের মনুকে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকাতে বিবৃত রহিয়াছে যে—

Although without a common name the ancient Germans believed that they had a common origin, all of them regarding as their forefather Mannus, the first man, the son of the god Tuesco.

অর্থাৎ প্রাচীন জর্ম্মাণগণ বিশ্বাস করিতেন যে, টুইস্কের * পুত্র আদি মানব মনু, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপিতামহ।

ইহা দ্বারাও তাঁহাদিগের মনুবংশপ্রভবত্ব ও ভারতসন্তানত্ব সপ্রমাণ হইয়া থাকে। বলিতে পার, যিনি স্বায়ম্ভুব মনু, তিনি ত ভারতবাসী ছিলেন না? হাঁ, অযোধ্যারাজ বৈবস্বত মনু উক্ত স্বায়ম্ভুব মনুর প্রপৌত্র বিবস্বানের সন্তান। সুতরাং স্বায়ম্ভুব মনু, ভারতের বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পূর্ব্বপুরুষ হইলেও তিনি ভারতবাসী ছিলেন না, তাঁহার কোন বংশধর স্বর্গ বা মঙ্গলিয়া হইতে ইউরোপে যাইয়াও আপনাদিগকে মনুর সন্তান বলিয়া দাবি করিতে পারেন। কিন্তু মহামতি পোকক জর্ম্মাণদিগের রীতিনীতিসম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান ভিন্ন আর কিছুই ভাবা যাইতে পারে না। পোকক বলিতেছেন যে—

When Tacitus informs us that the first act of a German on rising was ablution, it will be conceded, that this habit was not acquired in the cold climate of Germany, but must have been of eastern origin, as were the loose flowing robe, the

* বোধ হয় দক্ষ শব্দের অপভ্রংশে এই টুইস্ক শব্দ ব্যুৎপাদিত। দক্ষের এক কন্যার নাম মনু, তাঁহা হইতে মানবাখ্য নরগণ সমুৎপন্ন। কোন মনুই আদি মানব নহেন। ভাগবতে ভ্রান্তিবশতঃ স্বায়ম্ভুব মনুকে আদি মানব বলিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। জর্ম্মাণগণও ভ্রান্তিবশতঃ পুরুষ মনুকে টুইস্ক পুত্র ও আদি মানব বলিয়াছেন।

long and braided hair, tied in a knot at the top of the head."

Page—52.

টাসীটস নামক গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে জর্ম্মাণেরা শয্যা হইতে উঠিয়াই প্রাতঃস্নান করিতেন। এই ব্যবহার শীতপ্রধান জর্ম্মাণ দেশের হইতে পারে না, নিশ্চয়ই ইহা পূর্ব্বদেশীয় রীতি। অপিচ প্রাচীন জর্ম্মানেরা এরূপ ঢিলা কাপড় পরিতেন যে, তাহা বাতাসে চালিত হইত, তাঁহাদের মাথার চুলও লম্বা ছিল ও তাহাও উপরের দিকে ঝুঁটি বান্ধা থাকিত।

সুতরাং এই প্রাতঃস্নানকারী লোকেরা ভারতের ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। যে কাপড় বাতাসে উড়ে, তাহাও ধুতি চাদর ভিন্ন ঢিলা পেণ্টুলান নহে এবং শিখদিগের ন্যায় লম্বা চুল ও ঝুঁটি বান্ধাব প্রথা ভারত ভিন্ন মঙ্গলিয়া বা অন্য দেশেব হওয়া সম্ভাপর নহে। তবে এন্সাইক্লোপিডিয়া বিটেনিকা কেন এরূপ বলিতেছেন?

"The people whom we call the "German," and who call themselves "Die Duetschen," branch of the Teutonic race, which again belong to the great Aryan family... The word German is of Celtic origin meaning according to some philologers "Shouters," according to others, "nieghbours," it seems to have been"—

হাঁ, পাশ্চাত্যগণ অনেকেই এইরূপ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের উক্তির মূলে কোনও যুক্তি বা প্রমাণ দেখা যায় না। যাহারা চীৎকার করে, বা প্রতিবাসী, তাহাদেরই নাম জর্ম্মাণ, ইহা অতি হাস্যজনক সিদ্ধান্ত। তাহা হইলে শর্ম্মেণিয়া ও শর্ম্মন্ (পোলাণ্ডের) জাতির নামের কি ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করা যাইবে? আর উঁহারা ভারতসন্তান না হইলে কেনই বা মনুকে পূর্ব্বপিতামহ বলিয়া স্বীকার করিবেন, আর ভারতীয় ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রাতঃস্নান ও সংস্কৃত ভাষার বিকারপ্রভব ভাষার ব্যবহার করিবেন? হাঁ, উঁহারা টিউটনিক জাতির শাখাবিশেষও বটেন, কিন্তু উক্ত টিউটন শব্দটি আমাদিগের বৈদিক "ত্যতাম" শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। হইতে পারে যে উঁহাদিগের কোন আসন্ন পূর্ব্বপুরুষের নাম ত্যতান ছিল। আর কেণ্টজাতি ও জর্ম্মাণ জাতি যে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ, পরন্তু এক নহে, তাহাও পাশ্চাত্যেরাই বলিয়া গিয়াছেন। বিদুষী Buckley বলিতেছেন যে—

The invaders belonged to the Teutonic race, quite different from the Celts, although they came originally from the same stock in the East. History of England.

Page 10

অর্থাৎ এই বৈদেশিক শত্রুগণ টিউটনজাতীয়, তাহারা কেণ্ট জাতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। উঁহারাও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দেশে গমন করিয়াছেন বটে, তথাপি এক জাতি নহেন। পক্ষান্তরে জর্ম্মাণগণ টিউটনিক জাতীয়, সুতরাং জার্ম্মাণ শব্দকে কেণ্টজাতির ভাষামূলক মনে করা ঠিক হয় নাই। এন্সাইক্লোপিডিয়া শাকসনদিগের নামের নিরুক্তি নির্দ্দেশস্থলেও বলিয়াছেন যে—

Saxons, a tribe of the Teutonic stock ....The name is most commonlly derived from "Sahs" a short knife, though some authorities explain it as "settled" in contrast to wandering people.

শাকসনগণ টিউটনিক জাতীয় লোক। তাঁহাদের এই শাকসন নামটি 'খাট ছুরি' অর্থক Sahs শব্দ হইতে ব্যুৎপাদিত। তবে কোন কোন প্রামাণ্য লেখক বলিয়া থাকেন যে, যাহারা উপনিবিষ্ট, যাযাবর নহে, সেই লোকদিগের নাম শাকসন। কিন্তু আমরা তারস্বরেই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সাহেবদিগের এত ব্যুৎপত্তিবাদ সর্ব্বথাই ভিত্তিহীন ও হেতুশূন্য। ফলতঃ জার্ম্মাণশব্দ, শর্ম্মন্ বা জবমাণ ও শাকসনশব্দ শকস্থনুশব্দ হইতে ব্যুৎপাদিত তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যাঁহারা জর্ম্মাণ ও এঙ্গলো শাকসন বা গথিকভাষা মন দিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উঁহাদিগকে ভূতপূর্ব্ব ভারতবাসী ভিন্ন আর কিছুই বলিতে প্রস্তুত হইবেন না। এখনও আমাদিগের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে "শাকসেনী" নামে এক শ্রেণীর কায়স্থের অস্তিত্ব লক্ষিত হইতেছে, উঁহারাও যে উক্ত শকসুনুগণের কোন শাখাবিশেষ, এমত অনুমান অসঙ্গত নহে। মানবদেবতা বুদ্ধদেব বা শাক্যসিংহও এই শকবংশের সিংহস্বরূপ ছিলেন বলিয়া উক্ত বিশেষণে সমলঙ্কৃত হইয়াছিলেন।

অতঃপর আমরা ইংরেজ জাতির কথা বলিব। তাঁহাদিগের নিদান কি? মহামতি Ransom তাঁহার ইংলণ্ডের ইতিহাসের একত্র বলিতেছেন যে—

"Men of pure English blood belonged to the Low German group of the Teutonic branch of the Aryan family. The mixed English race of to day is also descended from the Celtic or ancient Britan, and from the Anglo-Saxon and Jute. Page 4.

অর্থাৎ আর্য্যবংশীয় টিউটনিক জাতীয় লোজর্ম্মাণ (জর্ম্মাণীর নিম্নভূমিবাসী) জাতিই বিশুদ্ধ ইংরাজ জাতির নিদান। তবে সম্প্রতি ইংলণ্ডে যে ইংরাজ বলিয়া একটি মিশ্র জাতি দেখা যায়, তাঁহারা ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসী কেল্ট জাতি, এঙ্গলো-শাকসন জাতি ও জটলণ্ডবাসী জুটজাতির সমবায়ে সমুৎপন্ন। সুতরাং ইংরাজগণকেও ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। কেননা জর্ম্মাণ ও শাকসনগণ যে ভারত সন্তান, তাহা আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি। যে সকল জর্ম্মাণ জটলণ্ডে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাই জুটজাতি বলিয়া সমাখ্যাত, সুতরাং তাহাতেও ইংরাজজাতির ভারতীয়ত্ব ব্যাহত হইবার নহে। অপর কেল্ট বা কেলটিকগণও ভারতের কিরাত নামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন, সুতরাং ইংরাজ জাতির ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তানত্ব ইহাতেও নিরাকৃত হইতেছে না। কেন?

পাশ্চাত্যগণের গ্রন্থাবলীতে Gaul, Galli, Galatai, Celtai এবং Celt বলিয়া কতকগুলি শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাইয়া থাকি। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে স্পেন, পর্টুগাল, ফ্রান্স, আয়ার্ল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়াবাসী জনসমূহ কেল্টিক বা কেল্টজাতিসমুদ্ভব। আম-

স্নাও সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে গ্রাকদিগের এই Keltai, রোমকদিগের Galli, ইংরাজদিগের Gaul বা Celt, এ সমুদায়ই একই বস্তু এবং উক্ত Keltai শব্দের বিকারেই Galatai ও Celt শব্দের বিকারে Gaul ও Galli প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং এতৎসমুদয়েরও আদি নিদান আমাদিগের ভারতীয় সেই কিরাত শব্দ। অবশ্য এনসাইক্লোপিডিয়া বলিতেছেন যে—

The Greek gave the collective name Keltai to a western people, and the name Keltike to the land which they inhabited. The region to which the latter term was applied varied according to the more or less accurate knowledge of each writer who used the term. The use of the word "Keltai" was equally vague and variable ; and this was due as much to the great movements of peoples which took place in some countries before the the christian era, as to the want of knowledge of the early Greek writers. One of the displacements of tribes due to those movements has immediate connection with our present subject, the migration ef some of the Keltai by the valley of the Danube and northern Greece into Asia Minor ; for in the names "Galatai" given to the people, and "Galatia" given to the land wherein they settled we have forms which connect the Greek Keltai and Keltike with the Roman Galli and Gallia, and both, perhaps, with Goidil, Gocidilor, Doedhil,the name of one branch of the descendants of Keltai, or to use the modern form of the word, Celts

এনসাইক্লোপিডিয়ার লেখকগণ গ্রীক লেখকগণকে ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের উভয় দলকেই ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে অভিলাষী। তাঁহারা যদি আমাদিগের শাস্ত্রসমূহ যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিতেন, তবে তাঁহারাও পোকক সাহেবের ন্যায় আমাদিগের সহিত মিলিয়া ভারতীয় কিরাত শব্দকে ঐসকল শব্দের নিদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। কতকগুলি কেলটিক লোক ইউরোপ হইতে এসিয়া মাইনারে ফিরিয়া আসিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারাও ইউরোপের আদিম নিবাসী নহেন, পরন্তু ভূতপূর্ব্ব ভারত সন্তান। কিরাত কাহারা? মনু বলিতেছেন যে—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ
ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে
ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ ৪৩
পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ
কম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ
কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥ ৪৪—১০অ

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৩৩অ—২১ ও ৩৬ অ—১৮ শ্লোকেও এই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণের কথা বিবৃত রহিয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে শক, যবন, কম্বোজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ সগর শাসনে ও পৌণ্ড্র, ঔড্র, দ্রাবিড়, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ নামক ক্ষত্রিয়গণ (খাশিয়া পর্ব্বতবাসারা) ক্রিয়ালোপ ও ব্রাহ্মণের অদর্শনবশতঃ ক্রমে ক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এখন যাহাকে নেপাল বলে, উহার প্রাচীনতম নাম চীন। কালিদাসের পতাকাতে এই চীনাংশুকই ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই দেশের লোকেরাই জন-লাকে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করাতে উহা এই ক্ষণে চীননামে প্রখ্যাতিলাভ করিয়াছে। জাপানের লোকেরা চীন হইতে জাপানে গমন করেন। আর নেপালের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে কিরাত রাজ্য অবস্থিত। এ দেশের ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে একদল পূর্ব্বদিকে বঙ্গদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ডে এই হেমাভ প্রিয়দর্শন কিরাত বা মগজাতির কথা বিবৃত আছে। এই চীন ও কিরাত সৈন্য লইয়াই ভগদত্ত পাণ্ডবগণের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ
বৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোঽভবৎ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ
সাগরানূপবাসিভিঃ॥ ৯—২৬ অ
সভাপর্ব।

এই কিরাতগণের কথা আমাদিগের অথর্ব বেদেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কৈরাতিকা কুমারিকা
শকা খনতি ভেষজং।
হিরণ্ময়ীভিরভ্রিভি-
র্গিরীণামুপসানুষু॥ ১৪
২য় খণ্ড—৭৫০ পৃষ্ঠা।

কিরাত ও শকপ্রভৃতি জাতি লৌহময় কুদ্দালদ্বারা পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে ঔষধ সকল খনন করিয়া বাহির করিয়া থাকে। এই কিরাতগণই বেলুচিস্থানে যাইয়া খিলাত নামে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদিগেরই একদল তথা হইতে ইউরোপে যাইয়া Celt বা Celtic জাতি অর্থাৎ স্পেনীয়, পর্টুগীজ, ফ্রেঞ্চ, আইরিস ও অষ্ট্রিয়ানগণের দেহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। মহামান্য সার উলিয়ম জোন্সও তাঁহার একটি প্রবন্ধের একত্র বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে—

"Of the cursory observations on the Hindus, which it would require volumes to expand and illustrate, this is the result. That they had an immemorial affinity with the old Persians, Ethiopians, and Egyptians, the Phoenicians, Greeks, and Tuscans, the Scythians or Goths, and Celts the Chinese, Japanese, and Peruvians.

একটু সামান্য বহির্দৃষ্টিতেই দেখা যায় যে, প্রাচীন পারসিক, ইথীওপিয়, মৈশর, ফিনিশীয়, গ্রীক, তস্কানীয়, শক বা গথ, কেলট, চীন, জাপানী ও পেরুদেশবাসিদিগের সহিত হিন্দু জাতির যে সমতা আছে, তাহা সম্পূর্ণই অবাধিত ও অনন্ত, উহা প্রকাশ করিয়া বর্ণনা

করিতে গেলে বড় বড় গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

হিন্দুজাতির সহিত ঐ সকল জাতির এ সমতা কেন হইল? যেহেতু ঐ সমস্ত জাতিই হিন্দুর বাসভূমি ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার ব্যবহার, ভাষা ও আকৃতি প্রকৃতি লইয়া ঐ সকল দেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। মহামতি পোকক বলিতেছেন যে—

In Peru, the most magnificent national solemnity was the "Feast of Ramai," (Page 178) * * * are still further demonostrated by their festival of the Ram-Sita.

Page 105.

এখনও পেরু দেশের ইন্কা বা সূর্য্যবংশীয় লোকেরা তথায় রামসীতার মহা উৎসব করিয়া থাকেন। কেন? তাঁহারা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় সন্তান, ভারত হইতে পেরু দেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইলেও তাঁহারা জাতীয় উৎসব বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ঐরূপ ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের ড্রুইডগণের আচার ব্যবহার প্রভৃতি চিন্তা করিয়া দেখিবামাত্র প্রত্যেককে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইঁহারা ভারতেরই ব্রাহ্মণ পুরোহিত ভিন্ন আর কিছুই নহেন। পাশ্চাত্য জগতে যে বেট্বল খেলা হইয়া থাকে, উহাও আমাদিগের ভারত হইতে তথায় নীত হইয়াছিল। আমাদিগের বিটা Bat এবং বর্ত্তুল শব্দ Ball এ পরিণত হইয়াছে মাত্র। যদুক্তং মহাভারতে—

ক্রীড়ন্তো বিটয়া তত্র
বীরাঃ পর্য্যচরন্ মুদা।
পপাত কূপে সা বিটা
তেষাং বৈ ক্রীড়তাং তদা॥ ১৭
বিটাঞ্চ মুদ্রিকা (বল) চৈব
হ্যহমেতদপিদ্বয়ং।
উদ্ধরেয় মিষিকাভি
র্ভোজনং মে প্রদীয়তাম্॥২৪-১৩১অ
আদিপর্ব্ব।

কৌরব ও পাণ্ডবেরা বেটবল্ খেলিতেছিলেন, সহসা ব্যাট ও বল সন্নিহিত কূপে পড়িয়া যায়। এমন সময়ে ক্ষুৎকাতর দ্রোণ যাইয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে আহার প্রদান কর, আমি বাণদ্বারা তোমাদের ব্যাটবল তুলিয়া দিতেছি।

পাশ্চাত্যগণ আনন্দপ্রকাশ কালে Hip Hip Hurrah, Hip Hip Hurrah বা কেবল Hurrah Hurrah বলিয়া থাকেন। মহামতি পোকক বলিতেছেন—এই হুররে হুররে ধ্বনি, রাজপুত যোদ্ধৃবৃন্দের যুদ্ধকালীন "হর হর" শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

That I assure the reader, that the farfamed "Hurrah" of his native country, is the warcry of his forefathers, the Rajpoots of Britain, for he was long the denizen of this island. His shout was "Haro ! Haro" (Hurrah Hurrah).

Page—114.

আমরাও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ইহাও বলিতে পারি যে, বিলাতের Hip Hip Hurrah ধ্বনির নিদানও আমাদের "শিব শিব হর" শব্দই বটে। অষ্ট্রিয়াবাসীরা এখনও পানীয় জলকে অপা ও নিরো

বলিয়া থাকেন, উহা আমাদের অপ্ ও নার ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেলজিয়ম্, ডেনমার্ক হলণ্ড, নরওয়ে ও সুইডন প্রভৃতি দেশবাসীরাও পূর্ব্বোক্ত শক, যবন, কম্বোজ, শর্ম্মন ও কিরাত জাতির, সমবায়সমুথ বস্তু ভিন্ন পদার্থান্তর নহেন, লিথুনিয়ানগণও সংস্কৃতভাষী বলিয়া ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তানমধ্যে পরিগণিত।

The Lithunians, south of the Gulf of Finland, speak a language more like Sansskrit than any other European tongue. Page—236

Manual of Geography
Thirty fourth.

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে সমাগত ও তুরাণভাষাভাষী রুশীয়গণের কথা ত কিছুই বলা হইল না? হাঁ, শ্লাভোনিকগণও আমাদিগের দেবগণের বা আমাদের একই শোণিত-গন্ধা, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরু হইতে হিম-পর্ব্বতনিকটবর্ত্তী ইউরোপীয় রুশিয়ায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবেন, তাই আমরা শ্লাভোনিক কথার অনুরূপ কোন কথা আমাদিগের ভারতীয় সাহিত্যে দেখিতে পাই না। বারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন-গুপ্ত মহাশয়ের প্রশ্নে একজন রুশীয় মহিলা যাহা বলিয়াছিলেন—আমরা ভূ-প্রদক্ষিণ গ্রন্থ হইতে তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"একটি ভদ্রমহিলা আমাকে সঙ্গে করিয়া এই একটি স্থান দেখাইলেন, ইনি বেশ ইংরাজি জানেন। লণ্ডনে কিছুকাল ছিলেন। ইনি আমার পরিচয় পাওয়ার পর বিনীতভাবে বলিলেন, আপনারা আর্য্য, ককেশীয় জাতি, আমরা মোঙ্গলীয়। আপনারা বহুকালের উন্নত, আমরা আধুনিক সভ্য।" রুশিয়া প্রবন্ধ।

যাহা হউক ভারতে না আইসার জন্য উঁহারা আর্য্যনাম হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন, কিন্তু উঁহারাও যে আমাদিগের নেদিষ্ঠ দায়াদ বান্ধব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভাষা, আচার, ব্যবহার, জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা ও আকৃতিপ্রকৃতি সমস্ত বিষয়েই ইউরোপীয়গণ ভারতীয় ভাবাপন্ন কেননা তাহারা সকলেই ভূতপূর্ব্ব ভারত-সন্তান।

প্রণয়-পরিণাম।

কত এক শতাব্দী গত হইয়া গেল, তখন রাজ্যধরপুরের প্রান্তভাগ দিয়া নির্ম্মলসলিলা ময়ূরাক্ষী নদী প্রবাহিত হইত। একদিন যখন সন্ধ্যার ধূসর আলোকের সহিত শ্রাবণের মলিন জ্যোৎস্না মিশিতেছিল; নদীতীরস্থ একটা সুবিশাল অট্টালিকা হইতে দেবতার সান্ধ্য

আরতিধ্বনি তরঙ্গিণীর কল্লোলের সহিত ভাসিয়া যাইতেছিল; দূরে এখানে ওখানে নদীগর্ভে দুই একখানা নৌকা হইতে নাবিকদিগের গ্রাম্যগীতি দিগন্তে লুকাইতেছিল; সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রাসাদ হইতে একটি বালক ও একটি বালিকা বাহির হইয়া বিচিত্র সোপানরাজী অতিক্রম করিয়া জলের নিকট আসিয়া বসিল। বালকটির বয়স সপ্তদশবর্ষ ও বালিকার বয়স দশ বৎসরের অধিক হইবে না। কিয়ৎক্ষণ দুইজনে কথাবার্ত্তা কহিবার পর বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "রাঘব, আজকেও একটা গল্প বল।" বালক একটু অনুযোগের স্বরে বলিল, "করুণা, তুমি রোজই গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমিয়ে যাও, আমি তোমাকে আর গল্প বল্‌বো না।" বালিকা ক্ষান্ত হইবার নহে, সে গল্পের জন্য আবদার করিতে লাগিল। বালক গল্প আরম্ভ করিল। বালকটির নাম রাঘব ও বালিকার নাম করুণাময়ী। রাঘব শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হইয়া রাজাধরপুরে তাহার এক বিধবা মাতৃস্বসার আশ্রয়ে থাকিত। বালিকা করুণাময়ী উক্ত বিধবা রমণীর দেবরপুত্রী। তাহার পিতা ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায় একজন সঙ্গতিপন্ন ভূম্যাধিকারী ও সম্মানিত কুলীন সন্তান। একটা সোপানে বসিয়া রাঘব গল্প বলিতেছিল, অপর সোপানে বসিয়া বালিকা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। উভয়ে যখন নিবিষ্ট মনে বসিয়াছিল তখন ঠিক ঘাটের নিকট একখানা নৌকা আসিয়া থামিল। দুজনের কেহই লক্ষ্য করিল না। ক্রমে গল্প থামিল। করুণা বলিল, "রাঘব, তুমি রোজই যুদ্ধের গল্প বল, একদিনও ত রাজপুত্র রাজকন্যার কথা বল না।"

রাঘব। আমি উপকথা জানি না, বল্‌তেও সাধ হয় না।

করুণা। কেন, উপকথা শিখিলে দোষ কি?

রাঘব। যাহা সত্য তাহাই শেখা ভাল, না যাহা মিথ্যা তাহাই ভাল।

করুণা। কিন্তু তবুও আমাকে মারামারি রক্তারক্তির কথা ভাল লাগে না।

রাঘব। তোমার ভাল লাগিবে না; তুমি বালিকা। কিন্তু বীর পুরুষের ভাল লাগে।

করুণা। তুমি বুঝি খুব বীরপুরুষ?

রাঘব। বীর না হইলেও বীর হ'তে সাধ হয়।

রাঘব আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় পার্শ্ব হইতে কে একজন বলিল, "আর তোমার কি সাধ হয় শুঁনি?" উভয়েই চাহিয়া দেখিল একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। রাঘব জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আমি রাজনগরের রাজার দেওয়ান, তুমি আমার সহিত যাইলে আমি তোমাকে যুদ্ধ শিখাইতে পারি।" বালক সম্মতি প্রকাশ করিল। তাহার পর আগন্তুকের আগ্রহাতিশয্যে ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাঘবকে রাজনগর রাজ্যের সৈনিকদলভুক্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন। পরদিন করুণা সভয়ে দেখিল রাঘব হাসিতে হাসিতে কিন্তু বিক্ষিপ্তনয়নে দেওয়ানজির সহিত নৌকায় আরোহণ করিল। তখন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে করুণা জিজ্ঞাসা করিল, "রাঘব, আবার কবে দেখা হবে?" "তোমার বিবাহের সময়।" নৌকা চলিয়া গেল। বালিকা

যতক্ষণ দেখিতে পাইল দেখিল, তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিল। রাঘব রাজনগর রাজসংসারে কর্ম্মগ্রহণ করিল। বীরভূম প্রদেশ তখন স্বাধীন ছিল। তখনও রাজনগরের স্বাধীন হিন্দুনরপতিগণ মুসলমানদিগের পৌনঃপুনিক আক্রমণ সকল প্রতিহত করিতে সমর্থ ছিলেন।

রাজনগরে রাঘবের সবই নূতন বোধ হইতে লাগিল। পল্লীর নির্জ্জনতার মধ্যে আশৈশব প্রতিপালিত হইলেও রাঘবের উচ্চাকাঙ্ক্ষি হৃদয় রাজনগরের জনাকীর্ণতা ও মুক্ত কোলাহলের সহিত বেশ মিশিয়া গিয়াছিল। রাজদরবার, রাজসৈন্য ও বিচারালয় প্রভৃতি রাঘবের দিবাস্বপ্নের বিষয়ীভূত হইল।

একদিন অপরাহ্ণে রাঘব নগর প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরিভাগে ভ্রমণ করিতেছিল। নিম্নদেশে সাঁওতাল প্রভৃতি কৃষকগণের অবোধ্য অথচ মধুর সঙ্গীতে বনভূমি মুখরিত হইতেছিল। সবই বন্য। সবই সুন্দর। বন্য বলিয়াই সুন্দর। রাঘব দেখিল এক স্থানে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্রাহ্মণ বৃক্ষতলে বসিয়া কৃষক বালকদিগের সহিত আলাপ করিতেছেন। সন্ধ্যার রক্তিমরাগে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইতেছে। একটু দূরে একটি বালিকা মৌ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফুল তুলিতেছে।

অকস্মাৎ একটা চিল জাতীয় পক্ষী বালিকার মস্তক হইতে একটা আভরণ ছোঁ দিয়া লইয়া বহুদূরে একটা বৃক্ষশাখায় বসিল। বালিকা কাঁদিয়া উঠিল, রাঘবও ব্যস্ত হইল। কেবল ব্রাহ্মণ নির্ব্বিকার ভাবে কৃষকবালকদিগের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। তিনি যেন দেখিয়াও দেখিলেন না।

রাঘব বলিল, "মহাশয় আপনি অলসের মত বসিয়া আছেন, গহনা খানা লইয়া গেল, দেখিতে পান নাই কি?"

ব্রাহ্মণ। দেখিলেই বা কি করিতে পারি? চিলটা অনেক দূরে গিয়াছে।

রাঘব। কেন আপনার কাছে ত তীর ধনুক আছে।

ব্রাহ্মণ। তুমি না হয় এ তীর ধনু লও।

রাঘব তৎক্ষণাৎ ধনু লইয়া সযত্নে লক্ষ্যস্থির করিয়া তীর নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্য অব্যর্থ হইল। পক্ষী ভূতলশায়ী হইল। একটা বালক দৌড়িয়া গিয়া গহনা খানা আনয়ন করিল। ব্রাহ্মণ রাঘবের শৌর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পরিচয় লইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে তোমার কোন অসুবিধা হইতেছে না ত?"

রাঘব। কোন অসুবিধা নাই, তবে এ পর্য্যন্ত মহারাজের সাক্ষাৎ পাই নাই, এই যা' দুঃখ।

ব্রাহ্মণ। আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি রাজাকে দেখিয়াছ কিন্তু চিনিতে পার নাই।

রাঘব। না মহাশয়, রাজাকে দেখিতে পাই নাই।

ব্রাহ্মণ। আমার সহিত দেখা করিতে হইলে অপরাহ্ণে এইখানে আসিও, সাধ্যায়ত্ত হইলে আমি তোমার উপকার করিব।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তাঁহারা তিন জনে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলেন। নিম্নে প্রান্তরমধ্যে একটি ক্ষুদ্র সরিৎ। নদীটি ক্ষুদ্র হইলেও খরস্রোতা ও বর্ষাকাল বলিয়া পূর্ণাবয়বা। সেখানে একখানি নৌকা বাঁধা ছিল। ব্রাহ্মণ ও বালিকা সেই নৌকায়

আরোহণ করিয়া নৌকা ভাসাইয়া দিলেন। দূরে যেখানে রাজনগর প্রাসাদের পাদমূল ধৌত করিয়া নদীটি প্রবাহিত হইয়াছে, নৌকা সেই দিকেই গেল।

পরদিন দরবারে গিয়া রাঘব দেওয়ানজির মুখে শুনিল তাহার পদবৃদ্ধি হইয়াছে। সে এরূপ অচিন্তিত সৌভাগ্যের কারণ বুঝিতে পারিল না, দেওয়ানজিও না। রাঘব রাজার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পাইল। সাক্ষাৎ কালে রাজা বলিলেন, "একজন ব্রাহ্মণের নিকট তোমার বীরত্বের পরিচয় পাইয়াছি। আশা করি তোমার শৌর্য্যের সুখ্যাতি দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে।" রাঘব নতশিরে অভিবাদন করিল। রাজার মুখের সহিত পূর্ব্ব পরিচিত ব্রাহ্মণের মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু পরিচ্ছদের প্রভেদ হেতু ভাল বুঝিতে পারিল না।

ইহার পর তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল। রাঘব কয়েকটি যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেওয়াতে এখন রাজনগরের সহকারি সেনাপতি হইয়াছেন। এখনও মাঝে মাঝে সেই পাহাড়ে বেড়াইতে যান, ব্রাহ্মণের সহিত ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

একদিন ব্রাহ্মণ রাঘবকে বলিলেন, "রাঘব, তুমি রাজনগররাজের মেয়েকে বিবাহ কর না কেন?

রাঘব দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন, "মহাশয় বলেন কি। এ কথা রাজার কর্ণগোচর হইলে আমাকে শূলে যাইতে হইবে।" ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "কেন? তোমার বংশগৌরব রাজার বংশগৌরব অপেক্ষাও অধিক, আর তুমি নিজেও কীর্ত্তি পুরুষ। তোমার ন্যায় জামাতা পাইলে রাজা কৃতার্থ হইবেন।"

রাঘব। আমি দরিদ্র।

ব্রাহ্মণ। দারিদ্র্য কখনও বিবাহের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

রাঘব। না মহাশয়, দরিদ্র আমি নিজেই রাজকন্যা বিবাহ করিতে সম্মত হইব না।

ব্রাহ্মণ। আর যদি আমার মেয়ের সহিত বিবাহের জন্য তোমাকে অনুরোধ করি?

রাঘব। সে কথা বরং বিবেচনা করিতে পারি।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা আমার মেয়েকেই বিবাহ কর।

রাঘব সম্মত হইলেন।

পরদিন রাঘব রাজদরবারে আহূত হইলেন। দরবার শেষ হইলে রাজা রাঘবকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া অন্তঃপুর অভিমুখে চলিলেন। রাঘবও সঙ্কুচিত হইয়া রাজ আদেশ পালন করিলেন। একটি প্রকোষ্ঠে রাঘবকে লইয়া গিয়া রাজা নিজের পরিচ্ছদ উন্মোচন করিলেন। কৌতূহলী রাঘব ভয়ে ও বিস্ময়ে দেখিলেন, সেই ব্রাহ্মণ। রাঘবের আর বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। সে কম্পিতপদে বসিয়া পড়িল ও রাজার পদদ্বয় ধারণ করিল। রাজা সম্মানের সহিত তাঁহাকে উঠাইয়া পার্শ্বে বসাইলেন ও হাসিয়া বলিলেন, "রাজার কন্যাকে গ্রহণ করিতে সাহস হয় নাই, ব্রাহ্মণের কন্যা গ্রহণ করিতে ত স্বীকার করিয়াছ, তাই গ্রহণ কর।"

বিবাহ হইয়া গেল। রাজার অনুমতিক্রমে রাঘব রাজকন্যাকে লইয়া বীরভূমের পূর্ব্বাঞ্চলে স্থিত ঢাকা * নামক স্থানে বসবাস করিলেন।

* বীরভূমে এখনও ঢাকা নামে একটী গ্রাম আছে।

ও নিজে স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালার মুসলমান নরপতি রাঘবকে কর চাহিয়া পাঠাইলেন। রাঘব অস্বীকার করিল। রাজাধরপুরের ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাঘবকে অনেক অনুরোধ করিলেন; নবাবের সহিত বিবাদ করিতে নিষেধ করিলেন। রাঘব শুনিলেন না। ক্রুদ্ধ হইয়া নবাব রাঘবের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নবাব সৈন্য ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে একদিন বিশ্রাম করিল, পরে রাঘবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল।

নবাবের সৈন্য চলিয়া গেল। সন্ধ্যার কোমল আকাশে যখন দুই একটা নক্ষত্র উঠিতেছিল, সেই সময়ে করুণা নদীর ঘাটে গিয়া বসিয়াছিল। ভাবিতেছিল—রাঘব ত চলিয়া গেল, থাকিল কি? প্রাণ যাহার জন্য ব্যাকুল, তাহাকে না পাওয়াই কি ভগবানের ইচ্ছা। দুঃখের দাবানল বুকে করিয়া দীর্ঘজীবন কাটাইবার প্রয়োজন কি? মরিলেই ত সকল জ্বালাই ফুরায়। দুইদিন আগে অথবা দুইদিন পরে—তাহাতে ত কিছু আসে যায় না। কিন্তু যদি মরিতেই হয়, তাহার কিছু না করিয়া মরিব কেন? তাই করিতে হইবে। এ প্রাণ যাহার জন্য তাহারই কার্য্যে এ প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। ধৈর্য্যে বুক বাঁধিয়া বালিকা ঘাট হইতে উঠিয়া গেল।

উভয় সৈন্যে ভয়ানক যুদ্ধ বাধিল। রাঘবের নবীন বিক্রমের নিকট যবন সেনা পর্য্যুদস্ত হইতে লাগিল। যুদ্ধের সময় রাঘব দেখিলেন একজন অপরিচিত তরুণ বয়স্ক যোদ্ধা রাঘবের পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছে। সে কিছুতেই রাঘবের পার্শ্ব ত্যাগ করে না। যবনসেনা পরাজিত হইবার উপক্রম হইয়াছে এমন সময় যবন সেনাপতি হতাশ হইয়া শেষ উদ্যম স্বরূপ তাহার দীর্ঘ বর্শাখানি রাঘবের বক্ষঃস্থলে লক্ষ্য করিলেন। রাঘবের তখন সে বর্শা নিরাকরণের সুবিধা নাই। বর্শা নিক্ষিপ্ত হইল, রাঘবের বক্ষের উপর সেই তরুণ যোদ্ধা পতিত হইল। বর্শা বিদ্ধ হইয়া সে তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইল। রাঘব রক্ষা পাইলেন। রাঘবের জয় হইল। হতাবশিষ্ট যবন সৈন্যগণ পলায়ন করিল। যুদ্ধশেষে রাঘব ব্যস্তভাবে সেই তরুণ যোদ্ধার নিকট আসিলেন। তাহার তখন অন্তিমকাল। ভাল করিয়া দেখিয়া রাঘব চিনিলেন—এ যে করুণা! করুণার কথা রাঘব প্রায় একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার এ অযাচিত আত্মোৎসর্গ কেন, রাঘব বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, "করুণা তুমি কেন এমন ক'রে আর কোথে-কেই বা এখানে এলে।"

"আমি সৈন্যদলের সহিত যোদ্ধৃবেশে আসিয়াছি। কেহই আমাকে চিনিতে পারে নাই।"

"করুণা তুমি বালিকা কেন মরিতে আসিয়াছিলে?" ক্ষীণকণ্ঠে করুণা বলিল, "তুমি যুদ্ধে আসিয়াছিলে কেন?" রাঘব বলিল, তবে কি তুমি আমারই জন্যে মরিতে আসিয়াছ? আমি তোমার কে?" করুণা কেবল একটু ম্লান হাঁসি হাঁসিল। রাঘব নীরব হইয়া করুণার বক্ষের উপর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। করুণার শরীর ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া যে রক্তস্রোত বহিতেছিল রাঘবের নিজের ও সৈন্যদের চেষ্টা তাহা রুদ্ধ

করিতে পারিল না। কিয়ংক্ষণ নীরব রহিয়া অতি ক্ষীণ অথচ উদ্দীপ্তকণ্ঠে করুণা বলিল, "রাঘব, আজ আমার বিয়ে।"

রাঘব। সেকি করুণা, তোমার বিয়ে কি রকম।

করুণা ধীরে ধীরে অতি কষ্টে শ্বাস টানিয়া বলিল, "হাঁ রাঘব, আজ আমার বিয়ে। তুমি বলেছিলে আমার বিয়ের দিন আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। আজ তোমার দেখা পাইলাম। আজই আমার বিয়ে। বাসর হ'বে জন্মান্তরে।" এই বলিয়া একহস্ত রাঘবের হস্তে দিয়া অপর হস্তে অতি কষ্টে এক ফোটা রক্ত লইয়া সীমন্তে ধারণ করিল। মৃত্যুকালিমাম্লান তাহার মুখখানি শান্তি ও উপশমের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাঘবের বীরহৃদয় মথিত হইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল। বালিকাও শেষ নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িল।*

বিরহে।

—*—

হেথা সুরভিত বায়ু তারি কেশবাসে,
এই পথ দিয়া গেছে, অঞ্চল-বাতাসে
ব্যাকুলিত করি ফুলে; অলক্তক রেখা
তৃণে তৃণে এখনও রহিয়াছে লেখা।
হরিণী চাহিয়া আছে মুগ্ধ আঁখি মেলি'—
দূর পথ পানে, তারে কে গিয়াছে ফেলি'।
ফিরে এল মধুকর গুঞ্জরি' বিফল
বৃথা তারে অনুসরি'; শূন্য তরুতল
বিছাইয়া আছে তার ছায়া অকারণ,
অঞ্চল পাতিয়া কেবা করিবে শয়ন?
নিতি যে গাহিত পিক বসি তরু'পর
মৌন আজি; কে ডাকিবে অনুকারি স্বর?
যে লতাটি ঘিরে ছিল চরণ তাহার,
তারি'পরে আছে কার অশ্রু উপহার।

* রাজা রাঘব ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এক্ষণে সে গৌরব, সে ঐশ্বর্য্য কিছুই নাই, তবুও নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত তাঁহার বংশধরগণ আজিও নিজেদেরকে "কাশ্যপরাজ" নামে অভিহিত করিয়া গৌরব অনুভব করেন।

সিংহাচল-যাত্রা।*

—:o:—

"কুন্দাভসুন্দরতনুঃ পরিপূর্ণচন্দ্রবিম্বানুকারিবদনো দ্বিভুজোঽম্বিনেত্রঃ।
শান্তস্ত্রিভঙ্গিললিত স্থিতিগুপ্তপাদ সিংহাচলে জয়তু দেববরো নৃসিংহ ॥"

বিশাখাপত্তনে সাগরের অনন্ত কল্লোল শুনিতে শুনিতে ভাবিলাম, এই সমুদ্রতীরে বসিয়া অনন্তদেবের এই ভীমকান্ত সুন্দর মূর্ত্তি দেখিব, না সিংহাচলে যাইয়া অনন্তরূপী ভগবান্ নৃসিংহদেবের শঙ্খকুন্দেন্দুধবল ভক্তবৎসল ভাবসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া জন্ম সার্থক করিব? মানবসৃষ্টির কোন পূর্ব্বতন যুগে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের কাতর ক্রন্দনে কৃপার্দ্র হইয়া যিনি অপূর্ব্ব নরসিংহ মূর্ত্তিতে দৈত্যরাজের স্ফটিকস্তম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীধর স্বামীর ঐকান্তিকী ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া অবশেষে কৃপা করিবার নিমিত্ত কঠোর বজ্রাগ্নির দীপ্ত বিভীষিকাও প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই; দেব ও দৈত্য, আর্য্য ও অনার্য্য এবং মানব ও পশুর প্রধান সম্মিলন-কর্ত্তা সেই নৃসিংহদেবকে দেখিতেই হইবে। পূর্ব্ব দিবস একাদশী গিয়াছে; অনুকল্পের যথেষ্ট ব্যবস্থা হইলেও ভোজনপ্রিয় বাঙ্গালীর দেহে একটা সাধারণ অবসাদ আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। কিন্তু ভগবদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষাবেগে সেই অবসাদ কাতর করিতে পারিল না। অবশেষে প্রাতে ৫ টার সময় ব্যাণ্ডি-আরোহণে বিশাখাপত্তনের কটিতট ত্যাগ করিয়া পবিত্র সিংহাচলাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

গত রাত্রে প্রবল বৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ওয়াল্টেয়ার বিশাল উপত্যকা ভূমি; পর্ব্বত প্রদেশে বৃষ্টির জল অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। মুষলধারায় বর্ষণ হইয়া গেলেও মুহূর্ত্ত পরে সমগ্র স্থান পূর্ব্ববৎ বিশুষ্ক দেখাইতে থাকে। বিশাখাপত্তন হইতে সিংহাচল পূর্ণ

* সিংহাচল সচরাচর সিমাচল নামে কথিত হয়। ইহা বিশাখাপত্তম (Vizagapatam) জেলার একটি গিরিমন্দির। বিশাখাপত্তন নগর হইতে ছয় মাইল দূরে অনুমান ৮০০ ফুট উচ্চে স্থাপিত। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন দ্রাবিড়ী সভ্যতার তত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত মান্দ্রাজ ভ্রমণে বাহির হইয়া গত ৫ই জুন তারিখে সিংহাচলে আরোহণ করিয়াছিলেন। সমগ্র মান্দ্রাজপ্রদেশ ভ্রমণপূর্ব্বক বিশাখাপত্তন, নেলোর, গোদাবরী, বেজোয়াড়া, মান্দ্রাজ, কাঞ্চী, শ্রীরঙ্গ, তাঞ্জোর, মাদুরা, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী প্রভৃতি তীর্থে তিনি যে সকল দেবালয় দর্শন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ ক্রমে ক্রমে উপাসনায় প্রকাশিত হইবে।
উঃ সঃ

পাঁচ ক্রোশ। পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে ;—পূর্ব্বাকাশে সিন্ধুসংস্পৃষ্ট সুদূর দিঙ্মণ্ডল ও পূর্ব্বাদ্রির শিরোভাগ তখনও মেঘনির্ম্মুক্ত হয় নাই। অন্য দিন এমন সময়ে বালার্কের স্বচ্ছ হৈম প্রাবরণে সাগরের তটাভিগামী উন্মত্ত ফেনরাশি তরল তামরসের মূর্ত্তি ধারণ করে, এবং তরুণ অরুণবিভা পূর্ব্বগিরির মুণ্ডিত শিরোদেশে পতিত হইয়া কপর্দ্দীর পিঙ্গল জটাজাল সদৃশ শোভা পাইতে থাকে ; কিন্তু আজি সমস্ত প্রকৃতিই যেন অগভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যেন সুপ্তি ও জাগরণের মধ্যবর্ত্তী কোনও এক প্রকার অবসাদে নিমগ্ন। আশা হইল ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় সিম্হাচল উঠিতে পারিব।

শকটচালক জাতিতে তৈলঙ্গী হইলেও বহুদিন বাঙ্গালীর ঘরে চাকুরী করায় বাঙ্গালা বেশ ভাল রকম বলিতে পারে। এই প্রয়োজনীয় গুণের অধিকারী হওয়াতে মলয় (শকটচালকের নাম) বিশাখা প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। মেঘ-দর্শনে তাহারও আনন্দোদয় হইল। প্রাতে পাঁচটা দশ মিনিটের সময় মলয়ের ব্যাণ্ডিযোজিত পিঙ্গলবর্ণ বলীবর্দ্দ মধুর নিক্কণে স্বীয় ললাটলম্বিত কিঙ্কিণীমালা কম্পিত করিতে করিতে শৃঙ্গদ্বয় উন্নত করিয়া অপর্সিয়মের বাঙ্গালা হইতে বীচরোডে নামিল। দেখিতে দেখিতে বীচরোড হইতে মহারাণীপেট্টা রোডের কূর্ম্মপৃষ্ঠে আরোহণ করিল ; আবার নামিল,—নামিয়া সহরের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে ধাবমান হইল। রাস্তার দুইধারে প্রায় সমস্ত বাটীই একতালা; কচিৎ দুই একটি দ্বিতল ভবন ; মধ্যে মধ্যে কোথাও পাঁচ সাতখানি খোলার ঘর শ্রেণীবদ্ধ। নগরের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে যতগুলি গৃহ দেখিলাম, প্রায় সকলগুলিরই দ্বারোপান্তে আলিপনা শোভা পাইতেছিল। দেখিয়া মেঘদূতের সেই "দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌচ" মনে পড়িল। কিন্তু তখনই ভাবিলাম, আমি যক্ষের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও বিশাখাপত্তন অলকাপুরী নহে। অলকাপুরী গিরিরাজ হিমালয়ের সানুদেশে অধিষ্ঠিত ; আর বিশাখাপত্তন অনুচ্চ পূর্ব্বাচলের একটি উপত্যকামাত্র। কিন্তু নগর মধ্যে ও তাহার উপকণ্ঠে কুলকামিনীকুলের নির্লজ্জ সরল চেষ্টাচরিত্র দেখিয়া আমার মেঘদূতের কথা মধ্যে মধ্যে মনে পড়িয়াছিল। বি, এন, রেলওয়ের কল্যাণে এবং ওয়াল্টেয়ারের নিজের স্বাস্থ্যসম্পদে বিশাখাপত্তন আজিকালি অনেক বাঙ্গালীর শান্তি নিকেতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজি প্রায় ৬০ জন বঙ্গবাসী ওয়াল্টেয়ারের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বাস করিতেছেন। দুঃখের বিষয় আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁহাদের কাহারও পরিচয় দিতে পারিলাম না।

এক্ষণে মলয়ের ব্যাণ্ডি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বিশাখাপত্তনের ন্যায় পার্ব্বত্য প্রদেশে ব্যাণ্ডি যাত্রিগণের প্রধান যান। শিমলা শৈলে রেলওয়ে লাইন স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে টঙ্গার বিশেষ প্রচলন ছিল। ব্যাণ্ডি অনেকটা সেই রূপ লঘু যান। পর্ব্বত প্রদেশে প্রায় পদে পদেই আরোহণ ও অবরোহণ করিতে হয় ; সেরূপস্থলে ক্ষুদ্রাকার লঘু যানই সহজে গমনাগমন করিতে পারে। ব্যাণ্ডি আকারে ঠিক টঙ্গার মত না হইলেও খুব ছোট পাল্কীগাড়ীর মত বলা যাইতে পারে। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ইহার

আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, মাদৃশ একটি বামনাকার ব্যক্তিও ভগবানের শেষশয়নের সুখানুভবে সমর্থ হয় না। তাহার উপর আবার আমার সমভিব্যাহারী পাচক ব্রাহ্মণ পুণ্যপ্রয়াসী হইয়া আমার সঙ্গ লইয়াছিল। মলয়ের ব্যাণ্ডিখানি সেইরূপ ক্ষুদ্র কলেবর হইলেও চারিদিকে সর্ব্ব সমেত ছয়টি গবাক্ষদ্বারা সজ্জিত ছিল। সুতরাং বায়ুসেবনে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নাই। তদ্ব্যতীত শয়নের উপযোগিতা-সাধনের নিমিত্ত দুইখানি বেঞ্চের মধ্যে একখানি তক্তা পাতিয়া শয্যা রচনা করা হইয়াছিল।

এক ঘণ্টার মধ্যেই ব্যাণ্ডি ওয়াল্টেয়ারনগর ও রেলওয়ে লাইন অতিক্রম করিয়া উপনগরে প্রবেশ করিল। পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত যজ্ঞবাও গুরুর দ্বিতল ভবন ও তৎসম্বলিত 'অবসার্ভে-টরী" দেখাইয়া মলয় বলিল "এই বাড়ীতে দিনে তারা দেখা যায়"। দিনে তারা দেখা সৌভাগ্যের বিষয় নহে, কিন্তু আমি রাও সাহেবের বাটীর গম্বুজ দেখিয়া বুঝিলাম তথায় একটি অবজার্ভেটরী আছে। লাইন পার হইয়া ব্যাণ্ডি প্রথমে একটু উত্তর মুখে চলিল, তাহার পরই আবার পশ্চিম মুখ ধরিল, ক্বচিৎ কোন স্থানে স্বল্পকালের জন্য বক্রপন্থা অবলম্বন করিয়া ক্রমাগত পশ্চিম মুখেই চলিতে লাগিল। পথের উভয় পার্শ্বেই ফণি-মনসার বন, প্রত্যেক বৃক্ষই আরক্তিম বীজকোষে সজ্জিত; ফণি-মনসার পাশে এরণ্ড স্থানে স্থানে পুঞ্জীভূত। মধ্যে মধ্যে বট, অশ্বত্থ ও নিম্ব এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম্র ও তালবন ও পথিপার্শ্বে কঙ্কাল-সার খর্জ্জুর বৃক্ষ দেখিয়া বঙ্গদেশ বলিয়া সহসা মনে হয়; কিন্তু পরক্ষণেই সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে পূর্ব্বাচলের মুণ্ডিত শির, স্থানে স্থানে তালশাখা-সমাচ্ছন্ন ভূমিচুম্বী নলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃৎগৃহ ও তৎসন্নিধানে কূপপার্শ্বে কুণ্ডল ও নাসাপিচ্ছ-শোভিত কামিনীকুলের শিরস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলভাণ্ড দেখিবা মাত্র সেভ্রম দূর হইয়া যায়।

পথের অনতিদূরে ক্ষুদ্র পল্লীমধ্যে সাদা সাদা দুই একটি ছোট ছোট ঘর দূর হইতে ছত্রাকবৎ শোভা পাইতেছিল। মলয়কে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল ঐগুলি ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর শুনিয়াই একটা বড় কৌতূহল জন্মিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "এদেশের লোক কোন ঠাকুর পূজা করে?" মলয় উত্তর করিল "দুর্গা আম্মা,—কালী আম্মা", —আম্মা মানে মাতা। এই সকল দেবতার কাছে তাহারা ছাগল, কুকড়া, মহিষ, মেষ বলি দেয়। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, এই দেশে চতুর্ব্বর্ণ বড়ই বিরল। কতকগুলি জাতি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু তাহারা এদেশের অধিবাসী নহে। প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া অন্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণগণ দুই শ্রেণীর,- পঞ্চ দ্রাবিড় ও পঞ্চ গৌড়। প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কখনও আমিষ স্পর্শ করেন না। পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে অধিকাংশ উড়িয়া ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কখন কখনও আমিষ ভক্ষণ করেন। শূদ্র মাত্রেই কুক্কুট মাংস ভোজন করে। প্রায় সকলেরই গৃহে দলে দলে কুক্কুট পালিত হইয়া থাকে। ওয়াল্টেয়ার-প্রবাসী কোন কোন যক্ষ্মাগ্রস্ত বাঙ্গালী বাবু চিকিৎসকের উপদেশ পালনের ব্যপদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কুক্কুটাণ্ড ও কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অভিভাবকের অনুপস্থিতি সুযোগে আজন্মের

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু সুখের বিষয় এরূপ "প্রকৃত হিন্দুর" সংখ্যা অত্যল্প।

ব্যাগি পঞ্চম মাইল পার হইলে সিংহাচল নিকট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতে ধারণা ছিল, ওয়াল্‌টেয়ার হইতে সিমাচল ছয় মাইল দূরবর্ত্তী। সুতরাং আশা হইল আটটা না বাজিতেই ভগবদ্দর্শন-লাভ ঘটিবে। এই আশায় উৎসাহিত হইয়া মলয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কৈ মন্দির দেখা যাইতেছে না কেন?" মলয় একটু বিস্মিত হইয়া বলিল "সে কি বাবু, এখনও যে পাঁচ মাইল আছে।" কথাটা তখন বিচার করিয়া দেখিবার অবসর হইল না। পথিপার্শ্বে যে 'মাইল ষ্টোন" স্থাপিত আছে, তাহাতে পাঁচ সংখ্যা দেখাইয়া মলয় প্রমাণ করিয়া দিল যে, এখনও পাঁচ মাইল বাকি আছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সে যাহা হউক, কথাটা শুনিয়াই চক্ষু স্থির হইল; নাসারন্ধ্র হইতে ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল; পাঁচ মাইল ব্যাগিতে আসিয়াই সর্ব্বশরীর পাকবার উপক্রম হইয়াছে; ইহার উপর এখনও পাঁচ মাইল যাইতে হইলে না জানি কত কষ্ট হইবে। "যা করেন ভগবান্ নৃসিংহদেব।" সাহসে বুক বাঁধিয়া মলয়ের বলীবর্দ্দের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলাম। বলদরাজ যেন তাহাতে উৎসাহিত হইয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু তখন আবার 'চড়াই" আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং মলয়ের শত কশাঘাত নিষ্ফল হইল। সে যাহা হউক, ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া স্থিরচিত্তে ভগবানের চরণচিন্তায় নিমগ্ন রহিলাম। বলীবর্দ্দ ঝম্ ঝম্ শব্দে উঠিতে লাগিল। তখন আর বসিতে না পারিয়া কুঞ্চিতদেহে একবার পদ্মনাভের শরণ লইলাম। তখনও আকাশ সূক্ষ্ম জলদজালে সমাচ্ছন্ন; পূর্ব্বদিক্ হইতে মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতেছিল; সুতরাং ধ্যানের পর একটু 'Logical dream" আরম্ভ হইল।

কিছুক্ষণ পরে মলয়ের উচ্চ বাক্যে "দার্শনিক স্বপ্ন" ভঙ্গ হইল। মলয় বলিল "বাবু! ঐ সিমাচলের সিঁড়ি দেখা যাইতেছে।" মনে এমনই আনন্দ হইল, আমি যেন স্বর্গের সিঁড়ি পাইলাম। সাগ্রহে উঠিয়া বসিলাম এবং সিংহাচলের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। মলয় বলিল "দূরে পাহাড়ের গায়ে ঐ যে শাদা শাদা দেখা যাইতেছে, ঐ গুলি সিঁড়ি।" চর্ম্মচক্ষে কিছুই শাদা দেখিতে পাইলাম না; কেবল কতকগুলি তরুবল্লীর গাঢ় বিতান এবং তৎপার্শ্বে পর্ব্বতগাত্রে স্তরে স্তরে আনারস ক্ষেত্রগুলি নয়নগোচর হইল। মনে হইতে লাগিল পাহাড়ের কটা চুল কে যেন ক্রেয়্যার করিয়া দিয়াছে।

ঠিক আটটায় ব্যাগি সিংহাচলের পাদতলে পৌঁছিল। সম্মুখে বিজয়নগর মহারাজের বড় বাঙ্গালা। বাঙ্গালার ফটকের দক্ষিণ ভাগে দুইটি বট, দুইটি অশ্বত্থ, একটি নিম্ব ও পাঁচটি তিন্তিড়ি বৃক্ষ। এই দশটি বৃক্ষের ছায়াপাতে স্থানটি বেশ শীতল। মলয় একটি অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় ব্যাগি থামাইয়া বলদ খুলিয়া দিল। আমরাও সেই স্নিগ্ধচ্ছায়াতলে ১০ মিনিট দাঁড়াইয়া সমগ্র স্থানটি একবার ভাল করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম। পাছে মেঘ সরিয়া যায় এবং মেঘমুক্ত সূর্য্যের প্রচণ্ড-

কিরণে পাহাড়ে উঠিতে হয়; এই ভয়ে আর বিলম্ব না করিয়া সিংহাচলের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। প্রথমেই নরসিংহ দেবের লৌহময় প্রকাণ্ড পতাকাদণ্ড যেন একটি বিশাল জয়স্তম্ভের মত আকাশ চুম্বন করিতেছে। অশ্বত্থবটাদির প্রথম ছায়াকুঞ্জের পর আর একটি ছায়াকুঞ্জ,—চারিটি বট ও একটি অশ্বত্থের স্নিগ্ধ সংযোগে তাহা গঠিত। এই দ্বিতীয় ছায়াকুঞ্জের সম্মুখে রাজার প্রতিষ্ঠিত দশটি ছত্র। অবশ্য যাত্রিগণের জন্য তাহা নির্ম্মিত, কিন্তু যাত্রী ত দেখিতে পাইলাম না।

ছত্রগুলির পার্শ্বে তালপাতার ঘরে তিন চারি খানি দোকান; এক একটি স্ত্রীলোক সেই দোকানে আম, পিয়ারা, আনারস, নারিকেল, ছোলাভাজা, রম্ভা, সামান্য সামান্য মসলা বিক্রয় করিতেছিল। মলয়ের উপদেশানুসারে একখানি দোকান হইতে পূজার জন্য একটি নারিকেল, চারিটি রম্ভা ও এক পয়সার কর্পূর লইলাম। দোকানগুলির সম্মুখে নৃসিংহদেবের পুরোহিতগণের বাটী। পাকা দেওয়ালের উপর খোলার চাল,—দেখিতে বেশ সুন্দর। ব্রাহ্মণদিগের বাটী পার হইয়াই বিজয়নগরের রাজার সেই গোলাববাগ। সে যাহা হউক, সোপানপংক্তির দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে না হইতেই দলে দলে ভিক্ষুক আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। তাহাদের মধ্যে কুষ্ঠীর সংখ্যা অধিক। এদেশে কুষ্ঠরোগের এত প্রাবল্য কেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। মলয়ের পরামর্শে চারি আনার পাই সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ভিক্ষুকেরা সেই এক একটি পাই পাইয়াই খুব খুসী হইল।

দেখিতে দেখিতে সোপান পংক্তির দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। একবার মাথা তুলিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম; দেখিলাম সোপানের পর সোপান, তদুপরি সোপান,—আয়ত অথচ সীমাবদ্ধ, সুদীর্ঘ, ঠিক সোজা, ঊর্দ্ধে সানুদেশে আরোহণ করিয়াছে। উভয়পার্শ্বে সুদীর্ঘ অলিন্দ এবং অলিন্দপার্শ্বে আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলপাদপের গাঢ় বিতান। বোধ হইল সোপানগুলি স্বর্গদ্বার স্পর্শ করিয়াছে। আনন্দে হৃদয় উদ্বেল হইল;—ভাবিলাম রাবণের চিরজীবনের কল্পনা বুঝি প্রকৃতই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য ভক্তের পক্ষে এই সোপান-পংক্তি যে বাস্তবিকই মোক্ষদ্বার; কিন্তু সে ভক্তি আমার কোথায়? তাই আমি প্রাকৃত দৃষ্টিতেই সিংহাচলের সকল বিষয় দেখিতেছি। সে যাহা হউক, দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াই দেখিলাম তাহা ছয়খানি বড় বড় পাষাণখণ্ডে গ্রথিত। সিংহদ্বারের সম্মুখে উভয়পার্শ্বে দুইটি বড় বড় পাষাণস্তম্ভ—দেখিতে ঠিক উদুখলের মত। আজি কালি যেমন অনেক বড়লোকের সিংহদ্বারে দুইটি কামান সোজা করিয়া পুঁতিয়া রাখা হয়, এই দুইটি পাষাণখণ্ড দেখিতে ঠিক সেইরূপ। পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম সে দুইটি দীপস্তম্ভ, কারণ প্রত্যেকেরই মুখে দীপাকার ছিদ্র রহিয়াছে এবং সেই ছিদ্র দগ্ধাবশেষ শোষিত তৈলকজ্জলে কলঙ্কিত। প্রথম সোপানের দক্ষিণভাগে একটি বৃষভ, তাহার উপরিস্থ অলিন্দে গরুড় এবং তদুপরি একটি বাণলিঙ্গ। বলা বাহুল্য

এ সমস্তই পাষাণময়। বুঝিলাম, ভগবানের দ্বার রক্ষার নিমিত্ত ইহা অপেক্ষা ভাল বন্দোবস্ত হইতে পারে না।

এইবার সোপানারোহণ। বিষম পরীক্ষা। সিংহাচল-যাত্রার সময় বিশাখাপত্তনের কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন, 'আপনার শরীর দুর্ব্বল। যদি পদব্রজে উঠিতে না পারেন, ডুলি চড়িয়া যাইবেন। সিমাচলে ডুলি পাওয়া যায়।" একুশ বৎসর পূর্ব্বে শিমলা শৈলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তাহার যক্ষ-গিরিচূড়া অধিকতর দুরারোহ হইলেও অনায়াসে তদুপরি আরোহণ করিতাম। সেই সাহস আসিয়া হৃদয় উত্তেজিত করিল; ভাবিলাম, স্ত্রীলোকের মত ডুলি চড়িয়া ভগবদ্দর্শনে যাইব? সাহসে ভর করিয়া উঠিলাম। আট দশটি পৈঁটের পর একটি করিয়া চত্বর। চত্বরের উভয় পার্শ্বে অলিন্দ। প্রত্যেক অলিন্দ-মুখ দীপজ্বলন জন্য তৈল-কজ্জলে কলঙ্কিত। ঐরূপ পাঁচটি চত্বর অতিক্রম করার পর পা দুইটি ভারিয়া আসিল; রৌদ্র নাই তথাপি ঘর্ম্মে সর্ব্বশরীর আপ্লুত হইল এবং হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। অগত্যা অলিন্দের উপর বসিতে হইল। তখন ভয় হইল, বুঝি আর উঠিতে পারিব না। কিন্তু এমনই ভগবানের মহিমা, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার উঠিতে লাগিলাম। আমার সমভিব্যাহারী পাচক বয়সে প্রৌঢ় হইলেও তরতর বেগে আরোহণ করিতে লাগিল। আমি তাহার সঙ্গে যাইতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু পারিলাম না, অবশিষ্ট ছয়টি চত্বর পার হইয়া আবার বসিলাম। এইরূপ উঠাবসা করিতে করিতে আধ ঘণ্টায় অনুমান ১০০ পংক্তি অতিক্রম করিয়া মধ্যদ্বারে উপস্থিত হইলাম।

সেই দ্বারের সম্মুখেই মহাবীর হনুমানের একটি পাষাণমূর্ত্তি। সেই স্থানে একটি প্রস্রবণ-গৃহ দেখিলাম। তাহার নাম গঙ্গাদ্বার। গৃহটি ক্ষুদ্র, উপরে কোনও আচ্ছাদন নাই। দুই তিনটি নল দিয়া তন্মধ্যে ঝরণার জল পড়িতেছিল। প্রস্রবণ-গৃহে ছয়টি দেবমূর্ত্তি দেখিলাম, ১ম গণেশ, ২য় বিষ্ণু—চতুর্ভুজ (শঙ্খচক্রবরাভয়), ৩য় শ্রীরাম—হস্তে ধনুর্ব্বাণ, বামে হনুমান, ৪র্থ লক্ষ্মীনারায়ণ, ৫ম বিষ্ণু দ্বিভুজ, ৬ষ্ঠ শ্রীরামসীতা। একটি সঙ্কীর্ণ গিরিশাখায় সুড়ঙ্গ করিয়া সেই মধ্য দ্বারটি স্থাপিত হইয়াছে। তথায় দুই তিনটি পাথরের ঘর আছে। মধ্যদ্বারে প্রবেশ করিয়া আশা করিয়াছিলাম, বুঝি মন্দিরের প্রথমদ্বারে আসিলাম। কিন্তু সেই দ্বার ও তাহার পরবর্ত্তী অলিন্দ অতিক্রম করিয়াই আমার ভ্রম দূর হইল। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, যতদূর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, এখনও ততটা সোপান-শ্রেণী বিস্তৃত রহিয়াছে।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গেলাম,—মধ্যদ্বারে প্রবেশ করিবার আগে একবার একটি অলিন্দের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নে উপত্যকার দিকে চাহিলাম। মনঃপ্রাণ বিমোহিত হইল। এমন সুন্দর কানন ও কুঞ্জশোভা ত পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে লাহোরের শালেমার উদ্যান (Hanging garden) দেখিয়াছিলাম। জহাঙ্গীরের প্রমোদ-কানন, লোকললামভূতা নূরজহানের কেলিকুঞ্জ ও বিবিধ স্নানাগার। উষ্ণ, কবোষ্ণ, শীতল, সুশীতল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বারি, মর্ম্মরনির্ম্মিত পরম মনোরম বিবিধ গৃহের মধ্য দিয়া নলাভ্যন্তরে এক সময়ে চালিত

হইত। কোথাও শীকর, কোথাও বা শতধারা ত্রিধারা ও একধারা,—কে গণিয়া স্থির করে? পরিত্যক্ত,—বিসর্জ্জিত,—কলকারখানা বিকৃত, অনেক স্থলে বিধ্বস্ত। একদা বসোরার গোলাব, কাশ্মীরের কুঙ্কুম ও গাজীপুরের যূঁই চামেলী যাহার স্তরে স্তরে কুঞ্জশোভা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া পারিজাত-পরিমলের পরাজয়-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল; আজি সেই শালেমার-কানন আপেল, আখরোট, ডালিম, নাশপাতী, আঙ্গুর ও জরদাড়ু প্রভৃতি মেওয়ার বাগানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কি লিখিতে লিখিতে কি লিখিয়া ফেলিলাম।

সিংহাচলের মধ্যদ্বারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একবার অলিন্দের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নে উপত্যকা শোভা প্রাণ ভরিয়া দেখিলাম। মধ্যস্থলে প্রস্রবণ পরিবেষ্টি পুঞ্জে পুঞ্জে গোলাবস্তবক কেলিকদম্বের কান্তি-অনুকারী, তমাল-নীল কদলী ও নারিকেল কুঞ্জের স্নিগ্ধ আবরণের মধ্যে শোভা ও সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে: চতুঃপার্শ্বে এক একটি আম, জাম, কাঁঠাল ও পাতিলেবুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছ। প্রত্যেক গুচ্ছ চারিদিকে বৃত্তাকার আরক্তিম পথ-বেষ্টিত এবং কৃত্রিম-প্রস্রবণ-শোভিত; যেন মরকত-মণিবৃক্ষ সকল বিদ্রুম-আলবালে শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে নারিকেল ও তালকুঞ্জ এবং পর্ব্বত গাত্রে পদতল হইতে অধিত্যকা পর্য্যন্ত অগণ্য আনারস-ক্ষেত্র অসংখ্য ফলভরে গৌরবান্বিত। মধ্যদ্বার অতিক্রম করিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলাম এবং আর আধঘণ্টা উঠাবসা করিতে করিতে নয়টা দশ মিনিটে মন্দির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের দক্ষিণ-ভাগে বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষ। তাহার সম্মুখে দুই শ্রেণীতে অনেকগুলি গোপগৃহ। তন্মধ্যে একটি ঘর ভাড়া লইয়া পাকাদির ব্যবস্থা করা হইল, এদিকে আমি প্রস্রবণজলে স্নান করিয়া নরসিংহ দর্শনে যাত্রা করিলাম।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আইন।

(৪)

আদালতের সিল ও জজের দস্তখতযুক্ত একটি ইস্তাহার প্রচার করা যাইবে যে জমিদারের প্রাপ্য বকেয়া খাজানার দরুণ দেন্দারের তালুক বিক্রয় হওয়ায় খরিদদার তাহা খরিদ করিয়াছে এবং জমিদার যেরূপ ভাবে তালুক সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেইরূপ তালুক খরিদদার পাইয়াছে ও খরিদদার ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি মফঃস্বলে টাকা আদায় করিতে পারিবে

না, অন্য কোনও ব্যক্তিকে কেহ টাকা দিলে ঐ টাকা যিনি দিলেন তাঁহার নামে কোনও খাজানার মোকর্দ্দমায় বা অন্য স্থলে উসুল হইবে না। ঐরূপ ইস্তাহার জারি করার পরও যদি দেনদার বা তাহার সৃষ্ট কোনও মধ্যস্বত্বের সাবেক অধিকারী কোনও ব্যক্তি খরিদদারকে দখল লইতে বাধা দিতে থাকে অথবা কোনও ব্যক্তি দ্বারা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে, খরিদদার লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিলে পুলিসের কর্ম্মচারী এবং সাহায্য করিতে সক্ষম নিকটস্থ অপর রাজকীয় কর্ম্মচারীগণকে খরিদদারকে সাহায্য করিতে আদেশ দেওয়া হইবে। কোনও হাঙ্গামা বা শান্তিভঙ্গ হইলে যাঁহারা খরিদদারকে বাধা দিবেন তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইবেন। বিক্রয়ের টাকার শতকরা ১ ভাগ এই আইন অনুযায়ী কার্য্য করিতে অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করার খরচের জন্য গবর্ণমেণ্ট লইবেন। বকেয়া খাজানা মায় সুদ এবং তালুক বিক্রয় করার সমুদায় খরচ জমিদার বা অপর ব্যক্তি যিনি পাইবেন তাঁহাকে দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান সনের খাজানা ও বৎসরের প্রথমে বিক্রয় হইলে গত সনের খাজানা বকেয়া খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে। ঐ সময়ের পূর্ব্ব সময়ের বকেয়া খাজানা দেনার টাকার ন্যায় রীতিমত মোকদ্দমা করিয়া আদায় করিতে হইবে। উপরোক্ত টাকা দিয়া উদ্বৃত্ত টাকা জেলার কালেক্টরের বা এসিষ্টাণ্ট কালেক্টরের মালখানায় দরপত্তনিদার বা তালুকের সমুদায় বা আংশিক জমির উপর দেনদার প্রদত্ত কোনও মূল্যবান স্বত্বের দখলকার ব্যক্তির দাবির জন্য আমানত রাখা হইবে। ঐরূপে স্বত্ববান ব্যক্তি বিক্রয়ের তারিখ হইতে ২ মাস মধ্যে যে টাকা সে দিয়াছে বা বিক্রয়ের জন্য তাহার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পূরণের জন্য রীতিমত মোকর্দ্দমা করিতে পারিবে তদন্তে যদি বাদীর দাবী ন্যায্য বলিয়া আদালত বিবেচনা করেন তবে আদালত বাদীকে যে টাকা সে দিয়াছে বা বিক্রয়ের সময় তাহার স্বত্বের মূল্য বা ন্যায্য কোনও টাকা দিবেন। যদি একাধিক ব্যক্তি দাবিদার হয় তবে সকলের দাবি মীমাংসা না করিয়া আমানত টাকা হইতে কোনও টাকা দেওয়া হইবে না। যদি সকলের দাবির মূল্য আমানত টাকা অপেক্ষা বেশী টাকায় আদালত ধার্য্য করেন তবে আমানত টাকা অংশানুসারে ভাগ হইবে এবং অবশিষ্ট টাকা দেনদারের নিজের ঋণ বলিয়া গণ্য হইয়া ডিক্রিজারির সাধারণ নিয়মে আদায় হইবে। বাৎসরিক খাজানা দিবার সর্ত্তে দখলকার দরপত্তনিদার বা বিক্রীত তালুকের জমিতে স্বত্ববিশিষ্ট অপর ব্যক্তি, বিক্রয়ের পূর্ব্বে সমুদায় দেয় খাজানার টাকা দিয়াছে বলিয়া প্রমাণ না দিলে, ঊর্দ্ধতন তালুক বিক্রয়ের দরুণ দরপত্তনি বা স্বত্বহানির ক্ষতিপূরণ পাইবে না। বিক্রয়ের তারিখের ২ মাসের মধ্যে নাচস্থ মধ্যস্বত্বাধিকারী বা জমিতে স্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তালুকের বিক্রয়ের টাকাতে কোনও দাবী উত্থাপন না করিলে অথবা দাবীকৃত টাকা অপেক্ষা বেশী টাকা আমানত থাকিলে যাহার মধ্যস্বত্ব বিক্রয় হইয়াছে সেই দেনদার ঐ দাবীর টাকা বা দাবী বাদে উদ্বৃত্ত টাকার জন্য আদালতে দরখাস্ত দিতে পারিবে এবং সে আদালতের মোহরযুক্ত সার্টিফিকেট পাইবে যে ঐ টাকার দাবী না থাকায় উহা আমানত রাখার আবশ্যক নাই।

কালেক্টরকে ঐ সার্টিফিকেট দেখাইলে ঐ টাকা তাহার রসিদ লইয়া তাহাকে দেওয়া হইবে। নীচস্থ মধ্যস্বত্বাধিকারী বা জমিতে স্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দাবীর টাকার ডিক্রিজারিতে তাহারা আদালতের মোহরযুক্ত সার্টিফিকেট পাইবে, তাহাতে আমানত হইতে যে টাকা তাহারা পাইবে তাহা লেখা থাকিবে। ঐ সার্টিফিকেট দেখাইলে তাহাদের পৃথক পৃথক রসিদ লইয়া কালেক্টর তাহাদিগকে টাকা দিবেন। আমানতের টাকায় স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তি কোম্পানির কাগজ (যাহাতে সুদ পাওয়া যায়) রাখিয়া সমুদায় বা আংশিক আমানতের টাকা উঠাইয়া লইতে পারিবে। শেষ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে যে হারে ডিস্কৌণ্ট বা প্রিমিয়াম দেওয়া আছে তদনুযায়ী ঐ কাগজের মূল্য ধরিতে হইবে।

সাল	নম্বর	বিষয়
১৮২০	১	জমিদারের বকেয়া খাজানার জন্য সে সকল তালুক বিক্রয় হইবে তাহার সকল প্রকার বিক্রয় ১৮১৯সালের ৮ নম্বর আইন অনুসারে হইবার কথা।

যাঁহারা গবর্ণমেণ্টে খাজানা দেন, এরূপ জমিদারগণ বকেয়া খাজানার জন্য বিক্রয় হইতে পারিবে এরূপ স্বর্ত্তে সৃষ্ট মধ্যস্বত্ব নিজেদের প্রাপ্য বকেয়া খাজানার জন্য যে কোনও সময়ে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে এবং সাধারণ আইনের সরাসরি বিধানে ঐরূপ বিক্রয়ের ক্ষমতা পাইয়া থাকিলে, তাঁহাদের প্রার্থনা মতে জিলা বা সহর আদালতের রেজিষ্ট্রার বা অস্থায়ী রেজিষ্ট্রার বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে জিলার জজের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নিরূপিত সাময়িক নীলামের বিধানে ঐ বিক্রয়-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। আদালতের ও জেলার কালেক্টরের কাছারিতে ইস্তাহার লটকাইয়া বিক্রয়ের পূর্ব্বে ১০ দিনের সময় দিতে হইবে।

সাল	নম্বর	বিষয়
১৮২১	৪	এসিষ্ট্যাণ্ট কালেক্টরের ক্ষমতা প্রভৃতি।

রাজস্ব আদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত কোনও ম্যাজিষ্ট্রেট বা জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বা এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট—যিনি জিলা কোর্টের জজের ভার প্রাপ্ত নহেন—রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে বা অপর যে কোনও বিষয়ে কালেক্টর জিলা কোর্টে মোকদ্দমা রুজু করিতে আইনানুসারে ক্ষমতাপন্ন সেই বিষয়ে জিলা কোর্টে মোকদ্দমা রুজু করিতে কালেক্টরের উপদেশের জন্য যে আইন প্রচলিত তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন। সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল্ কালেক্টরের এলাকা বা সংখ্যার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন এবং কোনও কভিন্যাণ্টেড কর্ম্মচারীকে কোনও জেলার কোনও মহালে কালেক্টরের সমুদায় বা আংশিক ক্ষমতা পরিচালনা করার ক্ষমতা দিতে পারিবেন। বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ অধানস্থ কোনও কর্ম্মচারীকে কোনও এলাকার ভিতর কালেক্টরের সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষমতা পরিচালনা করার জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু সেই দিনই বা যত শীঘ্র সম্ভব সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের নিকট অবগতি ও হুকুমের জন্য এত্তলা দিবেন। বোর্ড অব্ রেভিনিউএর মঞ্জুরী লইয়া কালেক্টরগণ যে কার্য্য

নিজে করিতে সময় না পান তাহা এসিষ্ট্যাণ্ট-গণকে দিতে পারিবেন, কিন্তু স্থানীয় তদন্ত বা রাজস্ব আদায়ের অপর কোনও কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তৎক্ষণাৎ বোর্ড অব্ রেভিনিউএর অবগতি ও হুকুমের জন্য এত্তেলা দিবেন। এসিষ্ট্যাণ্ট বা আইনানুযায়ী কালেক্টরের সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষমতা প্রাপ্ত অপর কর্ম্মচারী যতদূর সম্ভব রাজস্ব আদায়াদি বিষয়ে প্রচলিত আইনানুযায়ী কার্য্য করিবেন এবং নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে করার জন্য দায়ী হইবেন। কালেক্টরের ন্যায় ঐ কর্ম্মচারী বেআইনিমত সরকারি কার্য্য করার জন্য দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন হইবেন।

সাল	নম্বর	বিষয়
১৮২২	১	বোর্ড অব্ রেভিনিউএর ক্ষমতা সম্বন্ধে।

বোর্ডে কতগুলি মেম্বর থাকিবে তাহা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল স্থির করিবেন। আবশ্যক হইলে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল আদেশ দিবেন যে একজন মেম্বর সাধারণতঃ বা স্থলবিশেষে সমুদায় মেম্বরের ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল আবশ্যক হইলে একই সময়ে একই এলাকায় বিভিন্ন মেম্বরকে বিভিন্ন কার্য্য ও ক্ষমতা দিবেন। একজন মেম্বর সমুদায় মেম্বরের ক্ষমতা পাইয়া যদি কোনও স্থলে মনে করেন যে কালেক্টরের নিষ্পত্তি বা হুকুম উল্টান বা বদ্লান আবশ্যক তবে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে অন্য এক বা একাধিক মেম্বরের সম্মতি ব্যতীত ঐ স্থলে চূড়ান্ত হুকুম দিবেন না। একজন মেম্বর অন্য একজন মেম্বরের ডিক্রি বা হুকুম উল্টাইতে বা বদ্লাইতে পারিবেন না। চিরকালের জন্য হউক বা কয়েক বৎসরের জন্য হউক গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব বন্দোবস্তের কার্য্য সকৌন্সিল গভর্ণর জেনারল কর্ত্তৃক রীতিমত মঞ্জুর না হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা মান্য করিবেন না। দুইজন মেম্বরের মধ্যে কোনও বিষয়ে মতের অনৈক্য হইলে গবর্ণমেণ্টের উপদেশানুযায়ী স্থায়ী বা অস্থায়ী তৃতীয় মেম্বরের ঐ বিষয় বিবেচনার জন্য পাঠান হইবে এবং অধিক ব্যক্তির মতানুযায়ী বিষয়ের মীমাংসা হইবে। কালেক্টর বা অপর অধীনস্থ কর্ম্মচারীর তাঁবেদার দেশীয় কর্ম্মচারিগণের নিয়োগ, দূরীকরণ বা শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে বোর্ডের সমুদায় বা আংশিক ক্ষমতা পরিচালনে ক্ষমতাবিশিষ্ট একজন মেম্বর নিজের ক্ষমতার উল্লঙ্ঘন না করিয়া সমগ্র বোর্ডের ন্যায় কার্য্য করিবেন। যদি এইরূপ কার্য্যে একজন মেম্বর কালেক্টর বা অপর সাক্ষাৎ অধীনস্থ কর্ম্মচারীর মতের সহিত ভিন্নমত হন তবে গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে অপর এক বা একাধিক মেম্বরের সম্মতি না লইয়া তিনি চূড়ান্ত হুকুম দিবেন না। বোর্ডের নিজের আফিসের বা সাক্ষাৎ অধীনস্থ কোনও কর্ম্মচারীর নিয়োগ, দূরীকরণ বা শাস্তি বিষয়ে, সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের বিশেষ হুকুম না থাকিলে, দুই বা ততোধিক মেম্বরের ঐকামত অনুসারে কার্য্য হইবে। একজন মেম্বর পৃথক ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা পাইয়া বোর্ডের অধীনস্থ কোনও কর্ম্মচারীকে কিছুকালের জন্য কার্য্য হইতে দূরীকরণ করার হুকুম দিতে পারিবেন, কিন্তু ঐ হুকুম যদি কালেক্টর বা অপর কর্ম্মচারীর হুকুম বা প্রার্থনার প্রতি-

পোষক না হয় বা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের বিশেষ হুকুম দ্বারা অনুমোদিত না হয় তবে উহা অপর কোনও মেম্বরের নিকট অবিলম্বে পেশ করা হইবে এবং অধিক মেম্বরের মতানুযায়ী কার্য্য করা হইবে। স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তি হুকুম বা নিষ্পত্তির তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে বা অধিক বিলম্ব হইলে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ সহ দরখাস্ত দাখিল করিলে এবং দাখিলি দলিলাদি হইতে মোকদ্দমা ছানি তদন্তের উপযুক্ত মনে করিলে, বোর্ড সকল মেম্বর একত্রে বা একজন মেম্বর পৃথকভাবে যে হুকুম বা নিষ্পত্তি পূর্ব্বে দিয়াছেন তাহা ছানি, রহিত বদল বা বহাল করিতে পারিবেন, কিন্তু একজন মেম্বর পৃথকভাবে যে হুকুম বা নিষ্পত্তি দিয়াছেন তাহা দুই বা ততোধিক মেম্বরের ঐকামত ভিন্ন উল্টান, বদলান বা স্থগিত করা যাইবে না। কোনও স্থলে নিষ্পত্তি বা হুকুম সম্বন্ধে মেম্বরগণের মধ্যে উভয়দিকে এক মতাবলম্বীগণের সংখ্যা সমান হইলে, ঐ বিষয়ের জন্য সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল এক বা একাধিক অস্থায়ী বা কিয়ৎকালের জন্য মেম্বর নিযুক্ত করিবেন এবং ঐ মেম্বর ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে বোর্ডের স্থায়ী মেম্বরের ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। কোনও স্থানে বোর্ডের দুই মেম্বর একত্রে বসিয়া কার্য্য করিতে যদি কোনও বিষয়ে বিভিন্নমত হন এবং সেস্থানে বোর্ডের অপর কোনও স্থায়ী মেম্বর না থাকে কিন্তু উপরি উক্ত একজন অস্থায়ী বা কিয়ৎকালের জন্য নিযুক্ত মেম্বর থাকে তবে অনুপস্থিত স্থায়ী মেম্বরকে না জানাইয়া ঐ বিষয় ঐ অস্থায়ী মেম্বরের মতানুযায়ী নিষ্পত্তি করা যাইবে।

সাল	নম্বর	বিষয়
১৮২২	৭	

গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে।

এই আইন প্রথমতঃ কটক জেলা, পটাশপুর পরগণা প্রভৃতিতে জারি করা হয়। ১৮২৫ সালের ৯ নং রেগুলেসন দ্বারা এই আইন দশশালা বন্দোবস্তের বহির্ভূত যাবতীয় জমিতে যায় জাইগির, মোকররি এবং যাবতীয় নিদর বা বিশেষ দানপত্র দ্বারা অত্যল্প জমায় ভোগ করা মধ্যবস্থ যে সব মহাল গবর্ণমেণ্টের খাসে রাখা হইয়াছে তাহাতে, সুন্দরবনে, ভাগলপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে, করধার্য্য মহালের সামিল পরগণা, মৌজা বা অন্য রাজস্ববিভাগের বহির্ভূত বিস্তৃত জঙ্গল ও পতিত জমিতে এবং ঐ জঙ্গল বা পতিত জমির সংলগ্ন যাবতীয় মহালে জারি করা হইয়াছে।

১ ধারা। বন্দোবস্তের মেয়াদ অতীতে জমিদার মহালে দখলকার থাকিলে তিনি কি নিয়মে সরকারি রাজস্ব দিবেন। যদি কোনও জমিদার বা মালগুজারকে বন্দোবস্তের মেয়াদ অতীতের পর বৎসরে রাজস্ব কর্ম্মচারীগণ মহালে দখলকার থাকিতে দেন এবং ঐ ব্যক্তি মহালে আবাদ, শাসন, বন্দোবস্ত বা খাজানা আদায় সম্বন্ধে কোনও কাজ করেন তবে তিনি অন্য বিশেষ চুক্তি না থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের খাজানা মাদাতীতের পর বৎসরের জন্য দিবেন। কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী উদ্ধতন বোর্ড বা কমিসনারের মঞ্জুরি লইয়া বন্দোবস্ত অতীত হইবার পূর্ব্বে ছয় মাসের মধ্যে, পরবর্ত্তী বৎসরে সাবেক বন্দোবস্ত মত দখলকার থাকিতে চান

কি না জমিদার বা মালগুজারকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন এবং যদি ঐ ব্যক্তি সেই সময়ে অস্বীকার না জানায় তবে তিনি সাবেক জমায় দখলকার থাকিতে চান বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। অন্য বিশেষ বিধান না থাকিলে কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতাপাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী বৎসরের প্রারম্ভে বা পূর্ব্বে যদি জমা বৃদ্ধি করার ইচ্ছা জ্ঞাপন না করেন তবে সনবসন্‌ভোগী ঐ জমিদার বা মালগুজারের জমা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৩ ধারা। বন্দোবস্ত কিরূপ হইবে।

যে সকল মহাল বর্ত্তমানে ইজারা দেওয়া আছে তাহাদের বর্ত্তমান বন্দোবস্তের মেয়াদ অতীত হইলে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল্ যেরূপ আদেশ করেন সেইরূপ মেয়াদে বন্দোবস্ত করা হইবে। মহালে চিরস্থায়ী স্বত্ববিশিষ্ট জমিদার বা অপর ব্যক্তি ন্যায্য খাজানার বন্দোবস্ত লইতে রাজী হইলে তাঁহার পার্থনা অগ্রগাহ্য হইবে। মহাল ইজারা বন্দোবস্ত করিলে, ইজারার মেয়াদ ১২ বৎসরের বেশী হইবে না। বর্ত্তমানে যে সকল মহাল খাসে রাখা হইয়াছে তাহাদের প্রতিও উল্লিখিত নিয়ম খাটিবে।

বর্ত্তমান বন্দোবস্ত চালাইতে বা ন্যায্য জমায় নূতন বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে জমিদার এবং অন্য ভূস্বামী অস্বীকার প্রকাশ করিলে, রাজস্বকর্ম্মচারিগণ সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলের আদেশ মত মহাল ১২ বৎসরের অনধিক মেয়াদে ইজারা দিতে বা খাসে রাখিতে পারিবেন। যদি রাজস্বকর্ম্মচারিগণ মনে করেন যে কোনও রাজা, জমিদার, তালুকদার বা অপর ব্যক্তি কোনও মহালের বন্দোবস্ত চালাইলে বা পাইলে সাধারণের শান্তির বিঘ্ন ঘটিবে বা অন্য বিশেষ কোনও ক্ষতি হইবে তবে তাঁহারা ঐ বিষয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন এবং সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল্ কৌন্সিলে হুকুম জারি করিয়া পূর্ব্বোক্ত মেয়াদের অনধিক কালের জন্য মহাল খাসে রাখিতে বা ইজারা দিতে পারিবেন।

৪ ধারা। সরকারি রাজস্ব দিবার বন্দোবস্ত ব্যক্তিবিশেষের সহিত হইলে, রাজস্বকর্ম্মচারিগণের অপর ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বত্ব নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতার বাধা হইবে না।

সদর মালগুজার ও তাহার অধীনস্থ প্রজাগণের বিভিন্ন স্বত্বের নিরূপণ কার্য্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্বকর্ম্মচারীগণ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ কার্য্যে তাঁহারা যে হুকুম বা নিষ্পত্তি দিবেন তাহার জন্য রাজস্ব মাপ বা কমি দেওয়া হইবে না, তবে যদি তাহাতে জমিদার বা মালগুজারের লাভের বিশেষ ক্ষতি হয়, তবে তিনি বন্দোবস্ত এস্তফা করিতে পারিবেন এবং রাজস্বকর্ম্মচারিগণ মহালের নূতন বন্দোবস্ত করিবেন।

৫ ধারা। মালিকানা।

মালিকানা বা নন্‌কর বিষয়ক বর্ত্তমানে যে আইন প্রচলিত আছে তাহা রহিত করা হইল। যে সকল ভূস্বামীর মহাল খাসে রাখা বা ইজারা দেওয়া যাইবে তাঁহারা বোর্ড বা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কর্তৃপক্ষের নির্দ্ধারিত হারে মালিকানা পাইবেন। কতিপয় ভূস্বামী একত্রে কোনও মহাল বন্দোবস্ত লইয়া থাকিলে, আদায় উসুল তাঁহারা একত্রে বা পৃথকভাবে করুন, মালিকানা তাঁহাদিগের মধ্যে অংশানুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। মালিকানা

কোনও স্থলে গবর্ণমেণ্ট নিট্ যত টাকা ভূমি হইতে পাইয়াছেন তাহার শতকরা ৫ টাকার কম হইবে না এবং সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের বিশেষ মঞ্জুর ব্যতীত ঐ টাকার শতকরা ১০ টাকার বেশী হইবে না ভূস্বামীগণ মালিকিস্বত্বের বাবদ কোনও জমির উপস্বত্বাদি যদি পূর্ব্ব হইতে ভোগ করিতে থাকেন তবে তাহা তাঁহাদের প্রাপ্য মালিকানা হইতে বাদ দেওয়া হইবে। মহাল খাসে রাখা বা ইজারা বন্দোবস্ত হইলে যে সকল ভূস্বামী সমুদায় বা কিয়দংশ জমি চাষ করেন না তাহাতে প্রজা পত্তন করিয়া ইজারাদার বা সরকারি কর্ম্মচারীকে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব দেন তাঁহাদের প্রতি মালিকানার নিয়ম খাটিবে না। মহাল খাসে রাখা বা ইজারা বন্দোবস্ত হইলে যদি কোনও মালগুজার, জমিদার বা অন্য ভূস্বামী বা জমির দখলকার প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে রায়তদের নিকট হইতে কোনও টাকা আদায় করিতে থাকেন তবে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মঞ্জুর না থাকিলে তাঁহার প্রতি মালিকানার নিয়ম খাটিবে না। সাবেক বন্দোবস্তের কাগজে জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি বা আংশিক মহালের ভূস্বামী বলিয়া লিখিত থাকিলেও যে সকল মালগুজার প্রকৃত ভূস্বামী নন তাঁহারা মহালের জমার উপর মালিকানা পাইবেন না, কিন্তু নিজ দখল জমির স্বত্ব ত্যাগের জন্য মালিকানা এবং ইজারা স্বত্ব পরিত্যাগের জন্য গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ মুনফা পাইবেন। যে সদর মালগুজারের স্বত্ব ভূমির দখলকারগণ অস্বীকার করে তিনি নিজের স্বত্ব বিষয়ে বোর্ডকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে বা আদালতে রীতিমত মোকর্দ্দমা করিয়া স্বত্ব সাব্যস্ত না করিলে মালিকানা পাইবেন না। কিন্তু বোর্ডের সুপারিসে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল্ স্বত্ব সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে খোরাকির বাবদ যথোপযুক্ত টাকা দিবেন। কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী কর্তৃক মহাল উর্দ্ধসংখ্যা কত টাকায় বন্দোবস্ত লইতে পারেন জানাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়া কোনও জমিদার বা সদর মালগুজার যদি ঐ টাকা জানাইয়া থাকেন তবে ঐ ব্যক্তির মালিকি স্বত্বের অংশানুযায়ী ঐ টাকার বা তাহার কিয়দংশের শতকরা ৫৲ টাকা হারে মালিকানা প্রাপ্য হইবে, এবং গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক শেষ আদায় জমার উপর মালিকানা ধার্য্য হইবে না। যদি ঐ ব্যক্তি ঐ টাকা না জানান তবে যে সনে তাঁহাকে জানাইবার জন্য আদেশ করা হইয়াছি। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব সনে গবর্ণমেণ্ট মহাল হইতে নিট্ যত টাকা পাইয়া থাকেন সেই টাকার উপর মালিকানা ধার্য্য হইবে শতকরা ৫৲ টাকার কম না হয় ১০৲ টাকার বেশী না হয়।

৬ ধারা। ১ ধারা অনুযায়ী বর্ত্তমান বন্দোবস্ত চালান হইলেও, বোর্ডের হুকুম লইয়া কালেক্টর যে কোনও সময়ে উপযুক্ত ক্ষমতার সহিত নূতন বন্দোবস্ত-কার্য্য করিতে পারিবেন, এবং জমির পরিমাণ, উৎপন্ন, ও তাহা হইতে যথোপযুক্ত দেয় জমা নির্দ্ধারণ করার ও কৃষিকারীগণের স্বত্ব, স্বার্থ, সম্পত্তি সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য আবশ্যক বিধান লইতে পারিবেন। ঐ নূতন বন্দোবস্ত গ্রাম গ্রাম এবং মহাল মহাল হইবে এবং সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের আদেশ

লইয়া বোর্ড যেরূপ হুকুম দেন সেইরূপ পরিমাণ মহাল প্রতি বৎসরে নূতন বন্দোবস্ত করা যাইবে। ২ ধারা অনুযায়ী বর্ত্তমান বন্দোবস্ত চালান হইলে, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্বের কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না, কিন্তু নূতন বন্দোবস্তের কার্য্যের সময় যদি প্রকাশ পায় যে মহালের জমির বিশেষ ভুল বা গোপন হইয়াছে তবে বোর্ডের মঞ্জুর লইয়া কালেক্টর বেবন্দোবস্তি জমির ন্যায় অতিরিক্ত জমি পৃথক ভাবে বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। বেবন্দোবস্তি মহাল বন্দোবস্ত করিবার সময় মহালসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর বা ব্যক্তির স্বত্ব ও স্বার্থ সম্বন্ধে রাজকর্ম্মচারীগণ যেরূপ হুকুম দিতে ও তামিল করাইতে পারেন, বর্ত্তমান বন্দোবস্ত ২ ধারা অনুযায়ী চালান হইলেও তাহারা সেইরূপ করিতে পারিবেন। সদ্ধে লন্ধ প্রদেশ ও বুন্দেলখন্দ প্রদেশের কালেক্টরগণ বর্ত্তমান বন্দোবস্তের মিয়াদ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নূতন বন্দোবস্তের কার্য্য করিতে পারিবেন।

সাল	নম্বর	বিষয়
১৮২২	৭	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে।

জের—

৭ ধারা। দও প্রদেশ বা কটক প্রদেশের কোনও কালেক্টর পূর্ব্ববর্ত্তী ধারার লিখিত নিয়মে কোনও মহালের নূতন বন্দোবস্তের কার্য্য সমাধা করিলে উপযুক্ত সর্ত্তে বন্দোবস্ত গ্রহণে ইচ্ছুক ভূস্বামীকে বোর্ড ও গবর্ণমেণ্টের হুকুম লইয়া ১২০৪ ফস্লি বা আম্লি সনের পর সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল যেরূপ আদেশ করেন সেইরূপ নিয়মে পুনর্ব্বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে খাজানা বৃদ্ধির বিশেষ কারণ না থাকিলে নূতন বন্দোবস্তের কার্য্যের সময় জমির উৎপন্ন ও উৎপাদিকা শক্তি যেরূপ নির্দ্ধারণ করা হইবে, তদনুযায়ী ঐ পুনর্ব্বন্দোবস্তের রাজস্ব ধার্য্য হইবে। জমিদার বা অপর ব্যক্তির নিট মুনফা বর্ত্তমান জমার এক পঞ্চমাংশের বেশী বলিয়া স্পষ্ট দেখা না গেলে বর্ত্তমান জমা বৃদ্ধি করা যাইবে না এবং বর্ত্তমান জমা বৃদ্ধি করিলে, জমিদার বা অপর ব্যক্তিকে ধার্য্য জমার শতকরা ২০ ভাগ নিট মুনফা স্বরূপ দিতে হইবে। সুস্পষ্ট কারণ ব্যতীত বর্ত্তমান জমার উপর কমি দেওয়া হইবে না। পুনর্ব্বন্দোবস্তে যে পাট্টা দেওয়া যাইবে ঐ পাট্টার মেয়াদের মধ্যে পাট্টার লিখিত বা কালেক্টরের রোবকারিতে লিখিত জমির (বন্দোবস্তের সময় নির্দ্ধারিত নিয়মে ভুল বাবদ কমি বেশী ধরিয়া) বাবদ মালগুজারের রাজস্ব বৃদ্ধি করা যাইবে না। জমিদার এবং অন্য ব্যক্তি যিনি বন্দোবস্ত লইবেন, মহালের রকবা সম্বন্ধে বিস্তারিত ও যথার্থ বিবরণ দিবেন। পুনর্ব্বন্দোবস্তের কার্য্য শেষ হইবার পর জমিদার বা অন্য সদর মালগুজার বর্ত্তমান বন্দোবস্তের ম্যাদান্তে নূতন বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে বা অন্য কারণ থাকিলে রাজস্বকর্ম্মচারীগণ বর্ত্তমান বন্দোবস্তের ম্যাদ অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন বন্দোবস্ত করিবেন না।

৮ ধারা। গোচারণে বা অন্য আবশ্যক কার্য্যে যে পরিমাণ ভূমি দরকার তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পতিত জমি কোনও মহালের অন্তর্গত বা সংলগ্ন থাকিলে আবাদ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির সহিত ঐ জমি চিরকালের জন্য বা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল্ যেরূপ আদেশ

করেন সেইরূপ মিয়াদে রাজস্বকর্ম্মচারিগণ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন এবং ঐ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টে যত টাকা খাজানা দিবে তাহার দশ ভাগের এক ভাগ ঐ জমিতে স্বত্বাধিকারী জমিদার বা অপর ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে ও ঐ স্বত্বাধিকারী ঐ জমির দরুণ কোনও দাবি দাওয়া করিতে পারিবেন না, বা দেশাচার অনুযায়ী কোনও বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন না।

৯ ধারা। নূতন বন্দোবস্ত বা পুনবন্দোবস্ত কার্য্যের সময় কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতাপাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত কার্য্য করিবেন। জমির স্বত্বসম্বন্ধীয় বিভিন্ন দেশাচার, জমিতে দখল ও সর্ব্বপ্রকার স্বার্থযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় বিভিন্ন স্বার্থের বিবরণ যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করিবেন। প্রত্যেক প্রকার জমির প্রতি বিঘা নিরিখ, উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে ভোগী হউক বা না হউক হস্তান্তরের ক্ষমতাশূন্য বাসিন্দা চাষী প্রজাগণের নিকট আদায়ী শস্য এবং কান্‌কুট, বাটাই বা তদ্রূপ সর্ত্তে লাগান জমির উৎপন্নের সদর মালগুজার বা অন্য ম্যানেজারের ও চাষী প্রজার পরস্পর অংশ, আর মালগুজার বা গ্রামের ম্যানেজারাদি যত প্রকার সেস্ বা বাজে আদায় লন তাহার খোলসা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন। সমুদায় গ্রাম্য পাটওয়ারি ও গ্রাম্য চৌকিদারের নাম ও তাহাদের ভাতার প্রকার ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন। সমুদায় নিষ্কর জমির বিবরণ লিখিবেন। উপরিলিখিত বিষয়গুলি এরূপভাবে লেখা হইবে যেন আদালতের দেখিতে কোনও কষ্ট না হয় এবং সকলকে জানান হইবে যে জমির নিরিখ এবং খাজানা আদায়ের প্রকার সম্বন্ধে বন্দোবস্তের সময়ে কালেক্টর তদন্ত করিয়া পক্ষের স্বীকারমত যেরূপ লিপিবদ্ধ করিবেন, পরস্পর চুক্তি বা রীতিমত মোকর্দ্দমায় তাহা পরিবর্ত্তিত না হইলে তদনুযায়ী আদালত জমিদারের প্রাপ্য টাকার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন। পক্ষের অস্বীকৃত এবং বেমঞ্জুরি বা গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব নিদ্ধারণে গণ্য করা হয় নাই এরূপ সেস্ বা আদায় বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষভাবে মঞ্জুর না হইলে বে-আইনি এবং বেমঞ্জুরি বলিয়া গণ্য হইবে। কালেক্টর এবং অন্য কর্ম্মচারী বোর্ডের হুকুম লইয়া মফঃস্বল জমিদার, বা রায়ত বা অন্য ভূস্বামী বা ভূমির অধিকারীকে খাজানা এবং স্বত্বের সমুদায় বিবরণ লিখিয়া ভূমির বাবদ পাট্টা দিতে পারিবেন এবং ঐ সকল পাট্টার রেজেষ্টারি বন্দোবস্তের রোবকারির অংশ হইবে। কোনও জেলায় অনেকগুলি মহালের বন্দোবস্তের মেয়াদ এক সময়ে অতীত হওয়ায় বা অন্য কারণে গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার, মালগুজার বা ইজারাদারের নিকট পূর্ব্বোক্ত বিস্তারিত বিবরণ না লিখিয়া কবুলিয়ত লওয়া আবশ্যক হইলে বোর্ড বা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ত্তৃপক্ষ সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের নিকট এত্তেলা দিয়া ইতিপূর্ব্বের নিয়মে কবুলিয়ত লইবার আদেশ দিতে পারিবেন। ঐ কবুলিয়তের মেয়াদ ৫ বৎসরের বেশী হইবে না এবং ২ ধারার বিধি তাহার প্রতি বর্ত্তিবে।

১০ ধারা। কোনও জমি বা তাহার উৎপন্ন বা খাজানায় উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে ভোগী এবং দান বিক্রয় ক্ষমতাযুক্ত বিভিন্ন

প্রকারের পৃথক স্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহার সহিত গবর্ণমেন্ট সদর খাজানার জন্য বন্দোবস্ত করিবেন তাহা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল স্থির করিবেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি বন্দোবস্ত পাইবে না তাহাদের স্বত্ব বজায় রাখার উপযুক্ত বিধান করা হইবে। কোনও মহালের চিরকালের বা কিছু কালের বন্দোবস্ত মঞ্জুর করিবার সময় সদর খাজানা বাদে নিট্ মুনফা মহালের জমিতে বা উৎপন্নে বা খাজানায় স্বত্ববিশিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে কিরূপভাবে বণ্টন হইবে তাহা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল স্থির করিতে পারিবেন। এক বা একাধিক সদর মালগুজারের তালুক জমিদারি বা অন্য নামে অভিহিত কোনও মহালের জমিতে ঐ মালগুজারের অধীন পুরুষানুক্রমে ভোগী ও হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব-বিশিষ্ট বা অবিচলিত খাজানায়, কিম্বা একই নির্দ্ধারিত নিয়মে খাজানা ধার্য্য হইবার, পুরুষানুক্রমে ভোগী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিলে, যদি ঐ মালগুজারের সহিত গবর্ণ-মেণ্ট সদর খাজানার জন্য বন্দোবস্ত করেন এবং সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্ট ও ভূস্বামী বা ভূমির পুরুষানুক্রমে ভোগী দখলকারের মধ্যবর্ত্তী মালগুজার বা ম্যানেজার থাকিলে, সরকারী রাজস্ব জমিদার, তালুকদার বা অন্য পুরুষানু-ক্রমে ভোগী মধ্যবর্ত্তী মালগুজারের নিকট আদায় হউক বা মহালে ইজারা দেওয়া হউক খাঁ খাসে রাখা হউক, বোর্ডের হুকুম লইয়া কালেক্টর বা রাজস্ব নির্দ্ধারণ কার্য্যে নিযুক্ত অন্য কর্ম্মচারী পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক ভূস্বামী বা দখলকারের সহিত দখলি জমির মফঃস্বল বন্দোবস্ত করিবেন এবং তাঁহাকে যে স্বত্বে জমি ভোগ করিবেন ও কাহাকে খাজনা দিবেন তাহা লিখিয়া পাট্টা দিবেন। এই সকল স্থলে, মধ্যবর্ত্তী পুরুষানুক্রমে ভোগী মালগুজারের সহিত গবর্ণমেণ্ট যদি সদর খাজানার জন্য বন্দোবস্ত করেন তবে পূর্ব্বোক্ত মফঃস্বল বন্দোবস্তের বিবরণ, বোর্ডের মঞ্জুর হইলে, সদর মালগুজারের পাট্টায় লেখা হইবে বা তাহার সামিল করা হইবে। কোনও গ্রাম, মহাল বা ভূমিখণ্ডে বা তাহার খাজানা বা উৎপন্নে, বা গ্রাম, মহাল, ভূমিখণ্ড, তাহার খাজানা বা উৎপন্নের অংশে, যদি এক প্রকা-রের স্বার্থবিশিষ্ট, স্বার্থের পরিমাণ সমান হউক বা বিভিন্ন হউক, দুই বা অধিক ব্যক্তি এজমালিতে দখলকার থাকে এবং ঐরূপ সম্পত্তি যদি ব্যক্তিগণ প্রথানুযায়ী বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে সাধারণ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইলেও, পৃথক ভাবে দখল করে, তবে বোর্ড এবং সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের হুকুম ও উপদেশ লইয়া কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী সমুদায় ব্যক্তির বা তাহাদের অধিকাংশের সহিত একযোগে বা সমুদায় ব্যক্তি বা তাহাদের অধিকাংশের নিযুক্ত একজন কর্ম্মচারীর সহিত বন্দোবস্ত নির্ব্বাহ করিবেন, কিম্বা ঐ ব্যক্তিগণের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মহাল রক্ষণের জন্য সদর-মালগুজাররূপে নির্ব্বাচন করিবেন, কিন্তু সকল শরিকের ইচ্ছা এবং মহালের অন্তর্গত গ্রাম বা গ্রামসমূহের অতীতকালের প্রথার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিবেন। কোনও গ্রাম, মহাল বা জমিতে এজমালি সম্পত্তিবিশিষ্ট পক্ষগণের সহিত একযোগে বন্দোবস্ত করিতে হইলে কালেক্টর বা বন্দোবস্তের অপর কর্ম্মচারী

গ্রাম, মহাল বা জমির ভিতর প্রকাশ্য স্থানে লিখিত ইস্তাহার লটকাইয়া ঐ বিষয়ের নোটিশ দিবেন এবং স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণকে স্বয়ং বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দ্বারা নিরূপিত স্থান ও সময়ে, সঙ্গত মিয়াদের ভিতর, উপস্থিত হইয়া গ্রাম বা ভূমির উপর প্রস্তাবিত জমায় সম্মতি বা অসম্মতি জানাইতে বলিবেন। ঐরূপে আহুত হইয়া যদি কোনও ব্যক্তি উপস্থিত হইতে অস্বীকার, অবহেলা বা ভুল করে তবে জমায় স্বীকার বা অস্বীকার সম্বন্ধে হাজির। ব্যক্তিগণের অধিকাংশের মতই ঐ ব্যক্তির মত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে এবং ঐ ব্যক্তির অংশ ও মহাল অন্য বিশেষ হুকুম না থাকিলে সরকারী রাজস্বের জন্য দায়ী হইবে এবং বন্দোবস্তের জন্য কোনও বকেয়া খাজানা হইলে বিক্রয় হইবে। যদি কোনও ব্যক্তি হাজির হইয়া প্রস্তাবিত জমায় আপত্তি করে তবে উপস্থিত অপর ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত হইলে, আপত্তিকারী ব্যক্তি মহাল ইজারা দিলে বা খাসে রাখিলে যেরূপ স্বত্ব উপভোগ করিত সেইরূপ স্বত্ব উপভোগ করিবে। আপত্তিকারীর জমিতে মহালের বন্দোবস্ত-গৃহীতা অপর ব্যক্তি সেই জমির বন্দোবস্ত পাইলে মালিক বন্দোবস্ত গ্রহণ না করিলে যে নিয়মে ভূমির বন্দোবস্ত হয় সেই নিয়মানুযায়ী প্রস্তুত সর্ত্তে ঐ বন্দোবস্তগৃহীতা গবর্ণমেণ্ট-রাজস্বের ইজারাদার বলিয়া গণ্য হইবে। পট্টিদারি, ভাইয়াচারা বা তদ্রূপ সর্ত্তে কৃষিকারক ভূস্বামী কর্ত্তৃক দখলী মহাল বা মহালের অংশ ইজারা দিলে বা খাসে রাখিলে, ভূস্বামীর নিজদখল এবং নিজাবাদী জমির খাজানা উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে ভোগী নহে এবং দানবিক্রয়ের ক্ষমতা রহিত এরূপ রায়ত বা অন্য বাসিন্দা চাষী প্রজার একই গ্রামে বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে সমতুল্য জমির নিরিখ অনুযায়ী ধার্য্য হইবে এবং মালিকানা শতকড়া ৫৲ টাকা বা গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আদেশ দেন ৫৲ টাকার অন্যূন হারে বাদ দেওয়া হইবে। পূর্ব্ব প্রকার কোনও মহালের শাসন ও সরকারী রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন বা একাধিক অংশীদারকে সদর মাল্‌গুজার্ নিযুক্ত করিলে, যে অংশীদার সদর মাল্‌গুজার্ হইল না তাহার অংশ, বিশেষ প্রকারে নির্দ্ধারিত না থাকিলে, সদর মাল্‌গুজারের বকেয়া খাজানার জন্য দায়ী হইবে না। রীতিমত পৃথক করা না গেলে, ঐ শেষোক্ত অংশীদার পূর্ব্বের প্রচলিত নিরিখ ও প্রকারে সদর মাল্‌গুজারকে খাজানা দিয়া অধঃস্তন ভূস্বামীস্বরূপ জমি ভোগ করিতে থাকিবে—কিন্তু সদর খাজানা বাদে নিট্ মুনফা বিভাগসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও নীচস্থ প্রজার নিকট খাজানা আদায়ের সদর মাল্‌গুজারের যে ক্ষমতা বর্ত্তমানে আছে বা ভবিষ্যতে হইবে সে বিষয়ের নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে। বন্দোবস্ত মঞ্জুর হইবার সময় বা পর সদর মাল্‌গুজারের দায়িত্ব ও স্বত্ব প্রত্যেক স্থলে বিশেষ করিয়া নির্দ্ধারণ করা হইবে—ঐরূপ নীচস্থ ভূস্বামিগণ যে স্বত্বে পৃথক্ বন্দোবস্ত পাইবেন তাহা।

উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

——:o:——

শ্বেতকেতু বলিলেন, আরও ভাল করিয়া বিষয়টি আমাকে বুঝাইয়া দিন। আরুণি বলিলেন, অনেক বিষয় সাক্ষাৎ দেখিলেও বুঝা যায় না। যদি তুমি উহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তাহা হইলে অদ্য ঘটমধ্যস্থ জলে এই পিণ্ডরূপ লবণ নিক্ষেপ করিয়া রাখ। কল্য প্রাতঃকালে আমার নিকটে উহা লইয়া আসিও। শ্বেতকেতু পিতৃকথিত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঘটমধ্যস্থ জলে লবণপিণ্ড দিলেন ও পরদিন প্রাতঃকালে পিতার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি কহিলেন, বৎস। কল্য তোমাকে ঘটমধ্যস্থ জলে যে লবণপিণ্ড রাখিতে বলিয়াছি, সেই লবণ আনয়ন কর। শ্বেতকেতু সেই লবণ আনিতে গমন করিয়া অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু ঘটমধ্যস্থ সেই জলে লবণ দেখিতে পাইলেন না। পরে পিতৃসন্নিধানে আসিয়া লবণ না দেখিবার কথা বলিলে আরুণি বলিলেন. লবণ যদিও বিদ্যমান আছে, তাহা জলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। উপায়ান্তর দ্বারা ঐ লবণের বিদ্যমানতা জানা যাইবে। তুমি ঐ ঘটের উপরিভাগের জল লইয়া আচমন কর শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। তখন আরুণি কহিলেন, বৎস! তুমি আচমন করিয়া কি বুঝিতেছ? শ্বেতকেতু কহিলেন, আমি লবণ অনুভব করিতেছি। আরুণি বলিলেন, এক্ষণে ঘটের মধ্যভাগ ও নিম্নভাগ হইতে জল লইয়া যথাক্রমে দুইবার আচমন কর। শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। আরুণি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি অনুভব করিতেছ? শ্বেতকেতু বলিলেন, লবণ অনুভব করিলাম। আরুণি কহিলেন, এক্ষণে লবণ পরিত্যাগপূর্ব্বক আচমন করিয়া আমার নিকটে আইস। অনন্তর শ্বেতকেতু লবণ ত্যাগ করিয়া আচমন পূর্ব্বক পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, পিতঃ। আমি রাত্রিতে ঘটস্থ জলে যে লবণপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলাম তাহা এই জলেই বর্ত্তমান আছে। আরুণি কহিলেন, যেমন এই ঘটস্থ জলে যে লবণ আছে, তাহা তুমি দেখিতেছ না, কিন্তু আচমন করিয়া জানিলে যে ইহাতে লবণ আছে; তেমনি জগতের সকল স্থানেই সৎস্বরূপ পরমাত্মা আছেন। উপায়বিশেষ অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়।

তখন শ্বেতকেতু কহিলেন, যদি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুপলভ্যমান জগৎকারণ সৎ পদার্থকে উপায়ান্তর দ্বারা জানা যায়, তবে সেই উপায় কি? তাহা আমাকে উপদেশ দান করুন।

তখন আরুণি বলিতে লাগিলেন, যদি তস্করেরা কাহারও বিত্ত হরণ করিয়া ধরা পড়ে এবং রাজপুরুষগণ তাহার চক্ষু হস্ত পদ বন্ধন করিয়া গান্ধার দেশ হইতে কোন নির্জ্জন অরণ্যে লইয়া গিয়া তাহাকে ত্যাগ করে,

তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কোন্‌টি পূর্ব্বদিক্, কোন্‌টি পশ্চিমদিক, কোন্‌টি উত্তরদিক, কোন্‌টি দক্ষিণদিক, তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। তখন যদি কোন কারুণিক মহাত্মা আসিয়া তাহার চক্ষু ও হস্ত পদের বন্ধন মোচন করিয়া দেয় এবং তাহাকে বলিয়া দেয় যে এই উত্তরদিক দিয়া গেলেই তুমি অভিপ্রেত গান্ধার দেশে যাইতে পারিবে, তাহা হইলে তাহার উপদেশানুসারে উত্তরদিক্ ধরিয়া চলে ও পথিমধ্যে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গান্ধার দেশের নিজ গ্রামস্থ ভবনে উপস্থিত হয়। মানবের সম্বন্ধেও উক্তবিধ দৃষ্টান্তগুলি খাটিতে পারে। কারণ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মরূপ রাজপুরুষেরা মায়ারূপ বস্ত্রদ্বারা মানবরূপ তস্করের জ্ঞানরূপ নেত্রকে বাঁধিয়া তৃষ্ণারূপ পাশদ্বারা সাধুকর্ম্মচেষ্টারূপ হস্ত পদ বন্ধন করিয়া এই দেহরূপ অরণ্যে প্রবেশ করায়। তখন সে ব্যক্তি মনে করে "আমি অমুকের পুত্র, ইহারা আমার সহায়, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমার ধন নষ্ট হইয়াছে, আমার কি উপায় হইবে" ইত্যাদি। এমন সময়ে যদি কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধু আসিয়া তাহাকে বলিয়া দেয় "তুমি সংসারী নহ, তুমি অমুকের পুত্র ইত্যাদি ধর্ম্মও তোমাতে নাই। তুমি সৎস্বরূপ।" এইরূপ উপদেশ দ্বারা যদি তাহার অজ্ঞানরূপ বন্ধন খুলিয়া দিয়া তাহার প্রকৃত গন্তব্য ভবন পরমব্রহ্মান্বেষণের পথের কথা বলিয়া দেয়, তাহা হইলে সে নিজ আলয়ে গিয়া অর্থাৎ সৎস্বরূপে লীন হইয়া আপনাকে সুখী মনে করে। এই নিমিত্তই প্রাচীণ গুরুগণ বলিয়া থাকেন যে, আচার্য্যবান্ পুরুষই আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে।

শ্বেতকেতু বলিলেন, পিতঃ! আপনি বলিলেন আচার্য্যবান্ পুরুষই আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে, সে কিরূপ তাহা আমাকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক বুঝাইয়া দেন। আরুণি পুত্রের সৎসম্পত্তি পরিজ্ঞানার্থে কহিলেন, জরাদি রোগে উপতাপবন্ত পুরুষকে জ্ঞাতিগণ পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন। তখন রোগী বলে আমার আর জীবনের আশা নাই। জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ সেই রোগীর পিতা, পুত্র ও ভ্রাতাকে বলিয়া থাকে যে যাবৎ ইহার বাক্য মনে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজঃ পরম দেবতাতে লয় পায় তাবৎ ইহাকে পুরুষ বলিয়া জান। অজ্ঞানীর মৃত্যু ও জ্ঞানীর সৎসম্পত্তিক্রম একরূপ হইলেও অজ্ঞানীর মরণ হইতে জ্ঞানীর সৎসম্পত্তিতে কিছু বিশেষ আছে। কিরূপে বাক্য মনে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ তেজে ও তেজঃ পরম দেবতাতে লয় পায় তাহা অজ্ঞানীরা জানে না। তাহারা ব্যাঘ্রাদি ভাব ও দেব-মনুষ্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয়। বিদ্বানগণ শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশজনিত জ্ঞানদীপকর্ত্তৃক প্রকাশিত পরমব্রহ্মে প্রবেশ করে ও তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না; তাহাকে সৎসম্পত্তিক্রম কহে।

তখন শ্বেতকেতু কহিলেন, যদি মুমূর্ষু ও মুমুক্ষু উভয়েরই সৎসম্পত্তিক্রম একরূপ হয়, তবে অবিদ্বানেরা সৎসম্পত্তিক্রম পাইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, আর বিদ্বান্‌গণ তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না, এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক উপদেশ করুন।

আরুণি কহিলেন, "বৎস! শ্রবণ কর। যখন রাজপুরুষগণ কোন ব্যক্তিকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া হস্ত পদ বন্ধনপূর্ব্বক আনয়ন করে, তখন সে ব্যক্তি বলে আমি চুরি করি

নাই। তখন পরীক্ষার জন্য তাহার হস্তে তপ্ত কুঠার দেওয়া হয়। যদি সে তস্কর হয় তাহা হইলে তপ্তকুঠার গ্রহণ করিলে তাহার হস্ত দগ্ধ হয় ও রাজপুরুষগণ তাহাকে শাস্তি দেয়। আর যদি সে তস্কর না হয় তবে তপ্ত কুঠার গ্রহণ করিলে তাহার হস্ত দগ্ধ হয় না এবং রাজপুরুষগণ তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন না। উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে যাহারা জ্ঞানী তাহারা সৎপদার্থ প্রাপ্ত হইলে আর তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। আর যাহারা অবিদ্বান্ তাহারা সৎসম্পন্ন হইয়াও কর্ম্মানুসারে ব্যাঘ্রাদিভাব কিংবা দেবভাব প্রাপ্ত হয়। হে বৎস! যাহার অভিসন্ধিতে প্রজাবর্গের বন্ধন মোক্ষ হয়, তিনিই সকলের আত্মা বা সৎস্বরূপ। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো! তুমিই সেই আত্মা।

এইরূপে আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা যে সৎস্বরূপ পরমাত্মার বিষয় উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশবলে শ্বেতকেতু ক্রমশঃ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পূজ্য হইয়াছিলেন। একে আত্মতত্ত্ব দুরূহ বিষয়, তাহাতে আবার উপযুক্ত শিষ্য না থাকায় গুরু উপদেশ দিতে পারেন না। আবার উপযুক্ত শিষ্যও প্রকৃতগুরু লাভ করিতে না পারিয়া উপদেশ প্রাপ্তিবিষয়ে বিফলকাম হন। তাই উপনিষদে বর্ণিত আছে—

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্নবিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥
(কঠোপনিষৎ।)

অনুবাদ। হে নাচিকেতঃ! সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ তোমার ন্যায় শ্রেয়োর্থী ও আত্মবিৎ আছে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ অনেকেই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে না। অনেকে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করে বটে কিন্তু তাহারা হতভাগ্য ও অসংস্কৃতাত্মা, কাজেই তাহারা আত্মতত্ত্ব শুনিয়াও আত্মাকে জানিতে পারে না। গুরু অনেক আছেন বটে, কিন্তু আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে পারেন এরূপ কুশলবক্তা গুরুও দুর্লভ। গুরুর নিকটে ভাল উপদেশ লাভ করিয়া আত্মতত্ত্ব জানেন বা বুঝেন, এরূপ লোকও বিরল। কারণ নিপুণ আচার্য্য কর্তৃক আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদিষ্ট হন, এরূপ অল্পই দেখা যায়।

আসীনোদূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তম্মদামদন্দেবং মদান্যোজ্ঞাতি মর্হতি॥
অশরীরং শরীরেষনবস্থেষবস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বাধীরো ন শোচতি॥
(কঠোপনিষৎ।)

অনুবাদ। যম কহিলেন, আত্মা স্বয়ং অচল পদার্থ, কিন্তু মন প্রভৃতির দূরগতিবশতঃ আত্মাও গতিশীল বলিয়া অবভাসিত হন। আবার আত্মা যখন শয়ন করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি করণের উপশম হয় তখন সর্ব্বত্র গমন করেন। এই আত্মা বিরুদ্ধধর্ম্মবান্। ইনি মদ অর্থাৎ সহর্ষ এবং অমদ অর্থাৎ অহর্ষ। এইরূপ বিরুদ্ধভাবাপন্ন আত্মাকে মাদৃশ ব্যক্তি ভিন্ন আর কোন্ অজ্ঞ ব্যক্তি জানিতে পারিবে? আমরা সূক্ষ্মবুদ্ধি পণ্ডিত, আমাদেরই এই আত্মা সুবিজ্ঞেয়, অন্যের নহে। এই আত্মা অশরীর, ইনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক; দেব, পিতৃ ও মনুষ্যাদি শরীরে অবিকৃতরূপে অবস্থিত আছেন। ইনি মহান্ ও

বিভু. অর্থাৎ ব্যাপক। যে ব্যক্তি এই আত্মাকে "অয়মহং" অর্থাৎ আমিই সেই আত্মা, এই প্রকার জানিতে পারেন, সেই ধীর ব্যক্তি শোকাদিতে অভিভূত হন না।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং
সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং
যাতিনান্যেন হেতুন॥

(কৈবল্যোপনিষৎ।)

অনুবাদ। যে ব্যক্তি স্থাবর জঙ্গমাদি নিখিল বস্তুতে বর্ত্তমান আত্মাকে আত্মাতে অবলোকন করেন, এবং স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত পদার্থ আত্মাতে দর্শন করেন. অর্থাৎ ঐ সকল পদার্থ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নয় এইরূপ ভাবেন, তিনিই পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। এই প্রকার জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন পকারে ব্রহ্মদর্শন হয় না। ঐরূপ জ্ঞানের নামই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থাৎ সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম-ময়। এই জ্ঞান না থাকাতেই আমি (পরমাত্মা) ও জগৎ যে পৃথক্ এইরূপ মিথ্যা জ্ঞান হয়। জল হইতে উদ্ভূত বুদ্বুদ্ যেমন জল হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, তাহার ন্যায় নানারূপে প্রতিভাত এই জগৎ পপঞ্চ আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হইতেছে। যেমন বুদ্বুদ নাশ হইলে কখনই জল নাশ হয় না, তাহার ন্যায় এই প্রপঞ্চ নষ্ট হইলে আত্মা কখন নষ্ট হয় না। মুকুরস্থ মুখ মিথ্যা হইলেও যেমন প্রকৃত মুখের ন্যায় অবভাসিত হয়, এবং মুকুরস্থিত মুখের নাশ হইলে প্রকৃত মুখের নাশ হয়না, তাহার ন্যায় বুদ্ধিস্থ আভাস মিথ্যা হইয়াও আত্মার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, এবং সেই বুদ্ধিস্থিত আভাসের নাশ হইলে আত্মা কখন নাশ হয় না। যেমন একমাত্র তাম্র হইতে ঘটী, বাটী প্রভৃতি নানা পদার্থ হইয়াছে, কিন্তু উৎপন্ন ঘটী বাটী প্রভৃতি পদার্থ নাশ হইলে তাম্র কখন নাশ হয় না, তাহার ন্যায় এক আত্মা জীব, মৃত্তিকা প্রভৃতি বহুবিধ মিথ্যা কল্পিত হইয়াছে, এবং জীবত্ব ও মৃত্তিকাত্ব প্রভৃতি উপাধির নাশ হইলে আত্মার কোন নাশ নাই।

রজ্জুতে সর্পের আরোপ হইলে যেমন রজ্জুর সত্তাদ্বারা সর্পের সত্তা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার ন্যায় আত্মার সত্তা দ্বারা এই জগতের সত্তা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হইলে যেমন রজ্জুজ্ঞান দ্বারা সেই সর্পজ্ঞানের অভাব হয়. তখন কেবল রজ্জুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহার ন্যায় আত্মজ্ঞান দ্বারা জগতের অভাব হইলে একমাত্র আত্মা অবশিষ্ট থাকেন। যেমন স্ফটিকের উপাধি রক্ততা ও আকাশের উপাধি নীলতা, তাহার ন্যায় অদ্বয় পরমাত্মাতে এই জগৎ সত্য বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে। যেমন স্ফটিকের রক্ততা মিথ্যা ও আকাশের নীলতা মিথ্যা, তাহার ন্যায় এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মাতে মিথ্যা কল্পিত হইয়াছে।

অন্ধকার রাত্রিতে কোন একস্থানে স্থাণু অর্থাৎ শাখাশূন্য বৃক্ষ দেখিয়া লোকে মনে করে, বুঝি ঐ খানে চোর দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু যখন জানা যায় যে উহা স্থাণু. চোর নহে, তখন চোরের ভয়ও থাকে না। এই-রূপ আত্মজ্ঞান জন্মিলে সংসার থাকে না এবং সংসারে না থাকিলে প্রপঞ্চও দৃষ্ট হয় না। মূঢ়বুদ্ধিগণই জীব ও শিবকে অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ভিন্নভাবে দেখে। ভেদরহিত

নির্ব্বিশেষ পরমাত্মার কথন ভেদ হইতে পারে না। যিনি সর্ব্বময়, অর্থাৎ যিনিই সকল, তিনি কথন সর্ব্বভিন্ন পৃথক্ কিছু হইতে পারেন না। তিনি সকল নহেন বলিলে পরমাত্মাকে সীমাবদ্ধ কোন পদার্থবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। চিৎস্বরূপ পরমাত্মাই দেহধারণ হেতু জীবরূপে প্রকাশমান হন। দেহনাশ হইলে জীবের নাশ হয় না। যাহা নাশরহিত তাহাই আত্মা। যদি জীবকে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব না বলা যায় তাহা হইলে শরীর নাশে জীবও নাশ হইয়া যায়, সুতরাং জীব আর কর্ম্মফলভোগের জন্য দেহ ধারণ করে না। কিন্তু জীবের নাশ হওয়ার যুক্তি পাওয়া যায় না। যদি এরূপ স্বীকার কর যে জীব কোন দেহ আশ্রয় করে, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ইহাই স্বীকার করা হইল যে দেহ আধার, জীবাত্মা আধেয়। দেহ নাশ হইলে সেই আধেয় জীব কোথায় থাকে? হয় উহা কোন দেহ আশ্রয় করে, না হয় কোন দেহ আশ্রয় করে না। কোন দেহ আশ্রয় করে বলিলে জীব সেই দেহাশ্রিত হইয়া কর্ম্ম ফল ভোগ করে। আর কোন দেহ আশ্রয় করে না বলিলে ঘটভঙ্গে ঘটাকাশ (ঘটের মধ্যস্থিত শূন্য বা ফাঁক) মহাকাশের সহিত মিশিয়া এক হওয়ার ন্যায়, জীবাত্মার জীবোপাধি নাশ হইয়া পরমাত্মার সহিত মিশিয়া যায় বা একমাত্র পরমাত্মা হইয়া যায়। ঐ নিয়মে জীবাত্মার দেহধারণই বন্ধ, আর দেহ ধারণ না করার নামই জীবের উপাধিনাশ বা মুক্তি। এইরূপ বহু যুক্তি ও বহু প্রকারের মত দ্বারা জানা যায় যে একমাত্র পরমেশ্বরকেই উপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়রূপে মান্য করিয়াছেন। যথা ;—

য ইমং মধ্বদং বেদ
আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানম্ভূতভব্যস্য
ন ততো বিজুগুপ্সতে॥
এতদ্বৈতৎ।

যঃ পূর্ব্বন্তপসো জাত
মদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং
যো ভূতেভির্ব্ব্যপশ্যত॥
এতদ্বৈতৎ।

যঃ প্রাণেন সম্ভবত্য-
দিতির্দেবতাময়ী
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং
যা ভূতোভির্ব্যজায়ত॥
এতদ্বৈ তৎ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো
মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য
ন ততো বিজুগুপ্সতে॥
এতদ্বৈতৎ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো
জ্যোতিরিবাধিূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য
স এবাদ্য স উশ্বঃ॥
এতদ্বৈতৎ।

পুরমেকাদশদ্বার
মজস্যা বক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি
বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥
এতদ্বৈতৎ।

উদ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্য-
পানং প্রত্যগস্যতি।

মধ্যে বামনমাসীনং
বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥
এতদ্বৈতৎ।
অস্য বিস্রংসমানস্য
শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য
কিমত্র পরিশিষ্যতে॥
এতদ্বৈতৎ ॥
(কঠোপনিষৎ।)

অনুবাদ। যিনি কর্ম্মফলভোক্তা, প্রাণাদি পদার্থ সকলের ধারয়িতা, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে বর্ত্তমান ঈশানকে সমীপে অর্থাৎ আত্মহৃদয়ে জানিতে পারেন, তিনি এই আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছা করেন না। কারণ যে পর্য্যন্ত লোকের ভয় থাকে সেই পর্য্যন্তই ভয় হইতে আত্মাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যিনি আত্মাকে অদ্বৈত পরমাত্মা বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তিনি আবার কাহা হইতে ভয় পাইবেন এবং সেই ভয় হইতে রক্ষার জন্যই বা কেন চেষ্টা করিবেন। হে নাচিকেতঃ! তুমি যে আত্মার বিষয় জানিতে চাহিয়াছ, এই সেই আত্মা।

যে হিরণ্যগর্ভ জলাদি পঞ্চভূতের প্রথমে ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি দেবাদির শরীরসকল উৎপাদন করিয়া প্রাণিসকলের হৃদয়দেশে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় সকল উপলব্ধি করিতেছেন, যিনি কার্য্য-কারণস্বরূপ ভূত সকলের সহিত সেই প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভকে দর্শন করেন, অর্থাৎ অবভাসিত করেন, হে নাচিকেতঃ! তাঁহাকেই তুমি প্রকৃত ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

যে সর্ব্বদেবাত্মিকা অদিতি, হিরণ্যগর্ভরূপে সমস্ত ভূতের সহিত সমন্বিতা হইয়া পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়স্থিত অদিতিকে যিনি দর্শন করেন, অর্থাৎ অবভাসিত করেন, হে নাচিকেতঃ! তুমি তাঁহাকেই প্রকৃত ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

সেই ব্রহ্ম অঙ্গুষ্ঠমাত্র। কারণ হৃদয়পুণ্ডরীক অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ। তাহার ছিদ্রমধ্যবর্ত্তী অন্তঃকরণ উপাধিবিশিষ্ট স্থানে থাকেন, এইজন্য পুরুষকে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলা হয়। ইঁহাদ্বারা সকল পূর্ণ হয়, এইজন্য ইঁহাকে পুরুষ বলে। ইনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের ঈশ্বর। যিনি এই আত্মাকে জানিতে পারেন তিনি কাহার নিকট হইতে ইঁহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন না। হে নাচিকেতঃ! তুমি ইঁহাকেই প্রকৃত ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ধূমরহিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্। ইনি যোগপ্রভাবে যোগিদিগেরই একমাত্র লক্ষ্য, অন্যের লক্ষিত বস্তু নহে। ইনি সকলের আদিতে ও অন্তে অবস্থান করেন অর্থাৎ ইনি সকলের অন্তরস্থ আছেন এবং দেহ বিনাশের পরও অন্য দেহে অধিষ্ঠান করিয়া থাকিবেন। ইনিই সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশান। হে নাচিকেতঃ! তুমি ইঁহাকেই প্রকৃত ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

আত্মা অজ অর্থাৎ জন্মাদি বিকাররহিত, এবং অবক্রচেতা অর্থাৎ আদিত্যপ্রকাশবৎ নিত্যাবস্থিত। যেমন রাজা বহুদ্বারবিশিষ্ট নগরে অবস্থান করেন, তেমনি আত্মাও একাদশ দ্বার (ছিদ্র) বিশিষ্ট পুরসদৃশ এই শরীরে অবস্থান করেন। চক্ষুর্দ্বয়, নাশাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, নাভি, উপস্থ, গুহ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্র এই

একাদশ স্থানই শরীরের একাদশ দ্বারের ন্যায়। যিনি এই পুরস্বামী আত্মাকে ধ্যানদ্বারা জানিতে পারেন, তিনি শোকাদি দ্বারা মুগ্ধ হন না, এবং অবিদ্যাকৃত কামকর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হন এবং বিমুক্ত হইয়া আর শরীর গ্রহণ করেন না। হে নাচিকেতঃ! তুমি ইঁহাকেই প্রকৃত ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

যেমন নগরস্বামী রাজা যখন নগর হইতে চলিয়া যান, তখন নগরের শোভা থাকে না এবং নগরস্থ সমস্ত বস্তুই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তেমনই এই শরীরপুরের অধীশ্বর আত্মাও দেহনগর ছাড়িয়া গেলে দেহের শোভা থাকে না, প্রাণাদি প্রপঞ্চও নষ্ট হইয়া যায়। হে নাচিকেতঃ! তুমি ইঁহাকেই পরমব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

স্তিমিত-দীপ।

—:o:—

আমি, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব?
"ওগো, খুলে দাও", ব'লে কত আর পায়ে ধরিব?
আমি, লুটিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া অধীর,
হায় কি নিদয়! হায় কি বধির!
বুঝি, দেখিতে চায় গো, দুয়ার বাহিরে
মাথা খুঁড়ে আমি মরিব।
হায়, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব।
ঐ, কণ্টকযুত বন্ধুর পথে,
ছিন্ন, রুধির আপ্লুত পদে,—
আহা, বড় আশা ক'রে এসেছি
আমার দেবতারে প্রাণে বরিব!
"ওগো, খুলে দাও" ব'লে কত আর পায়ে ধরিব?
ঐ, ওপারে আলোক ঝিকিমিকি করে
কি মধু-সঙ্গীত আসে বায়ু ভরে
আমি, এপারে বসিয়া বিফল রোদনে
আর কতকাল হরিব?
আমি, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব?

মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল।
১লা জুলাই, ১৯১০।
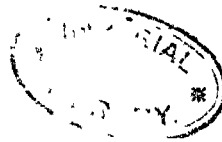
উপাসনা ।
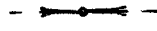
ব্রহ্মোপাসনাতত্ত্ব ।

(৪র্থ অংশ ।)

(৯) শঙ্করাচার্য্যের উক্ত ধর্ম্মক্রিয়া ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মধ্যগত অবশিষ্ট নয়প্রকার পার্থক্য ।

১১২ । ধর্ম্মক্রিয়া ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এই উভয়ের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের বিচারিত আর নয়প্রকার ভেদ আছে । তাহা এক্ষণে বলিতেছি ।

> ১ "শেষশেষিত্বেঽধিকৃতা-
> ধিকারে বা প্রমাণাভাবাৎ"

ধর্ম্মজিজ্ঞাসার সহিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার শেষাশেষিত্ব বা অধিকৃতাধিকারের প্রমাণ নাই । অর্থাৎ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা না থাকিলে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইবে না, অথবা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারোৎপাদক এমন প্রমাণ নাই ।

২ ক তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার শাস্ত্র বেদান্ত । তাহা ধর্ম্মজিজ্ঞাসার শাস্ত্র পূর্ব্বমীমাংসার পরিশিষ্ট নহে । যাহা ব্রহ্মজ্ঞান তাহা ধর্ম্মজ্ঞানের সমাপ্তি নহে । ব্রহ্মজ্ঞান স্বয়ংসিদ্ধ । যজ্ঞ দান তপস্যাদির কোন লক্ষণ, ধর্ম্ম, সাধনপদ্ধতি তাহাতে নাহি । পূর্ব্বমীমাংসার বিচারিত যে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা তাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার জন্মে না । তৎপ্রতিপাদিত দেবার্চ্চনাপ্রণালী ব্রহ্মজ্ঞানের কোন সাহায্য করে না । তাহার গুরু, পুরোহিত, নৈবেদ্য, হোম, বলিদান, উপবাস, স্নান, আচমন, জপ, পুরশ্চরণ, ধ্যান, এ সমস্তের কিছুই ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ বা অধিকারজনক নহে । যাহা নিষ্কামধর্ম্ম তাহারও পর্য্যবসান চিত্তশুদ্ধি মাত্রে ; কিন্তু একাএক ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষ নহে ।

২ খ কিন্তু অনেকে ঐ অনুষ্ঠান গুলিকেই মুক্তির সাক্ষাৎ হেতু মনে করেন । তাঁহারা সকাম নিষ্কাম ভেদ বুঝেন না । এরূপ মনে করা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহাও তাঁহারা জানেন না । শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, বিধিবিহিত কাম্যকর্ম্ম স্বর্গাদি ফলের হেতু, সেই সকল ফলে বৈরাগ্য জন্মিয়া যে সকল বিধিবিহিত নিষ্কামকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা চিত্তশুদ্ধির হেতু, চিত্তশুদ্ধি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু, এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মুক্তির হেতু । এস্থানে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, বেদান্তপাঠ এবং ব্রহ্মজ্ঞান এই তিনটিরই মুক্তির সহিত অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ ।

অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানের ইচ্ছা হয়। তাহাতে বেদান্তপাঠে মতি হয় এবং তদ্দ্বারা জ্ঞান জন্মে।

২ গ এস্থানে শাস্ত্রের এই সার সত্যটি ধারণ করিতে হইবে যে, বেদস্মৃতিআগম-পুরাণাদিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ উৎপাদ্য ভূমি আশ্রয় ব্যতীত, স্বভাব-সাগরের তীরবর্ত্তী চঞ্চল সৈকতময় দেশ অবলম্বন দ্বারা, নিষ্কামকর্ম্মরূপ চিত্তশুদ্ধিজনক উপায় লাভ হয় না। তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর দ্বারা শাস্ত্রবিহিত জ্ঞান লাভ অসম্ভব। যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন অসম্ভব? তবে তাহার উত্তর নিম্নে দিতেছি।

২ ঘ বিধিবিহিত কর্ম্ম, যাহা প্রথমতঃ কামনার অধিকারে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহাই নিষ্কাম পুরুষের পক্ষেও কর্ম্মযোগরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। কেননা নিষ্কাম কর্ম্মেতেই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। বৈরাগ্যবান্ পাত্র সাধন-ভূমিতে আরূঢ় হইলেই তাঁহার পক্ষে ঐ মুখ্য-উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হয় এবং অধ্যাপক, গুরু ও পুরোহিতগণ তৎ সাধনে অনুকূল হয়েন। এইরূপ কর্ম্মযোগরূপ চিত্তশুদ্ধিজনক উপায় হিন্দুসাধকের স্বধর্ম্মেই নিহিত আছে। তাহা ধর্ম্মান্তর নহে। কিন্তু কোন স্বাভাবিক ধর্ম্মমতে বা দেশান্তরীয় ধর্ম্মপুস্তকে চিত্তশুদ্ধি-বিধায়ক তাদৃশ সুলভ উপায় নাই এবং তাহার ফলস্বরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মবিচার নাই। এই জন্য বলিলাম যে, সে সকল মত অবলম্বন দ্বারা জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। নিষ্কাম কর্ম্মপ্রবাহ, চিত্তশুদ্ধি, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মজ্ঞান, এবং ত্রিবিধ-শরীরবিরহিত মোক্ষ এ সমস্তই হিন্দুধর্ম্ম। সেই মোক্ষই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নিঃশ্রেয়স ফল। তাহা স্বর্গাদি ফলের ন্যায় অনিত্য নহে।

৩ "ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ
ফলজিজ্ঞাস্যভেদাচ্চ;
অভ্যুদয়ফলং ধর্ম্মজ্ঞানং
তচ্চানুষ্ঠানাপেক্ষং;
নিঃশ্রেয়সফলন্তু ব্রহ্মজ্ঞানং
নচানুষ্ঠানান্তরাপেক্ষং।"

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এই দুইয়ের ফলেরও ভেদ আছে। ধর্ম্মজ্ঞান অভ্যুদয়-ফলপ্রদ, তাহা অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ। কিন্তু ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল মোক্ষ। তাহা অনুষ্ঠানাপেক্ষ নহে।

৪ "ব্রহ্মজিজ্ঞাস্যং নিত্যবৃত্তত্বাৎ
ন পুরুষব্যাপারপারতন্ত্রম্।"

ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্রের জিজ্ঞাস্য যে ব্রহ্ম তিনি নিত্যসিদ্ধ। এইহেতু পুরুষব্যাপার-পারতন্ত্র অর্থাৎ ক্রিয়ার বিষয় নহেন।

৫ "প্রবৃত্তিভেদাচ্চ"

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মধ্যে প্রবৃত্তিরও ভেদ আছে। ধর্ম্মবিধি অনিত্য স্বর্গাদি ফলের আশা দেন, কিন্তু ব্রহ্মবিধি মোক্ষপথ দেখাইয়া দেন। ধর্ম্মবিধি পুরুষকে ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োগ করেন, কিন্তু ব্রহ্মবিধি স্বপ্রকাশ-ব্রহ্মকে প্রকাশ করেন।

৬ "শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ
কর্ম্ম শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং
ধর্ম্মাখ্যং যদ্বিষয়া জিজ্ঞাসা
অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসেতি সূত্রিতা।"

শারীরিক, বাচনিক, মানসিক শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত যে সকল ধর্ম্মকর্ম্ম, তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা ধর্ম্মমীমাংসায় সূত্রিত হইয়াছে। "অধর্ম্মোপি হিংসাদিঃ" হিংসাদি অধর্ম্মও পরিত্যাজ্যরূপে

ব্যবস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তাদৃশ কায়িক বাচিক মানসিক ধর্ম্মক্রিয়া নহে।

৭ "তস্মান্ন প্রতিপত্তিবিধিশেষতয়া শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতি।"

অতএব কোন প্রকার বিধির অঙ্গরূপে ব্রহ্মকে শাস্ত্রে কহেন নাই, কিন্তু তিনি বেদান্ত-বাক্যের সমন্বয় দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে অর্থাৎ কেবল মাত্র জ্ঞানস্বরূপে শাস্ত্রসিদ্ধ, ইহাই মীমাংসিত হইয়াছে। তাহাই মীমাংসার জন্য মহর্ষি ব্যাস "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" প্রভৃতি সার্দ্ধ পঞ্চশত সূত্রে গ্রথিত জয়াখ্য উত্তরমীমাংসা প্রণয়ন করিয়াছেন।

৮ "ননু জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া ন, বৈলক্ষণ্যাৎ, ক্রিয়া হি নাম সা যত্র বস্তুস্বরূপ নিরপেক্ষৈব চোদ্যতে পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনা চ"

তথাপি যদি বল ব্রহ্মজ্ঞান, সাধকের মানসিক ক্রিয়ামাত্র, তাহা যুক্ত নহে। কেন না ক্রিয়ার লক্ষণ ও ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তুর স্বরূপ জানিবার অপেক্ষা না করিয়া কোন অলৌকিক ফললাভের নিমিত্তে যে ধ্যান, উপাসনা, সাধনারূপ মানস ব্যাপার তাহার নাম ক্রিয়া। তাহা বিধি বা বাসনাবিহিত ক্রিয়ামাত্র। তাহা কর্তৃতন্ত্র ও চিত্তব্যাপারাধীন।

৯ "নচ বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বেন কার্য্যানুপ্রবেশো ব্রহ্মণঃ।"

জ্ঞানকে যদি একপ্রকার ক্রিয়া বল এবং তদনুসারে যদি ব্রহ্মকে সেই ক্রিয়ার কর্ম্মপদ অর্থাৎ ফলস্বরূপ বল তাহাও যুক্ত হয় না। কেন না শ্রুতিতে আছে—

"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"।

তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। সুতরাং জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে কার্য্যানুপ্রবেশ তাঁহাতে সম্ভবে না।

১০ "চিদ্রূপত্বং নাম সাধনান্তরনিরপেক্ষতয়া স্বয়ং প্রকাশমানং স্বস্মিন্নারোপিতসর্ব্বপদার্থাবভাষকবস্তুত্বং চিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে।"

অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতেই প্রকাশমান আপনাতে আরোপিত সর্ব্বপদার্থের প্রকাশক যে বস্তুধর্ম্ম তাহার নাম চিদ্রূপত্ব। (রা, মো, রা)। এতাবতা ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্রের জিজ্ঞাস্য যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তিনি সর্ব্বপ্রকার সাধননিরপেক্ষ। কোন-প্রকার কর্তৃতন্ত্র উপাসনা তাঁহাতে সংলগ্ন হয় না। হিন্দুসমাজে সাধারণতঃ যতপ্রকার সাধন ও উপাসনা প্রচলিত তৎসমস্তই কর্তৃতন্ত্র, মানসব্যাপারাধীন, পুরুষবুদ্ধির আয়ত্ত এবং বিধিবিহিত সমন্বক অথবা ক্রমবিহিত ধ্যান ও সমাধিলক্ষণযুক্ত যথোক্ত লক্ষণ নির্গুণব্রহ্মেতে তাহার ন্যায় কোন সাধন বা উপাসনা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে।

(১০) ব্রহ্মসূত্রোক্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা লক্ষণের সমাহার।

১১৩। আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বৈয়াসিকী ব্রহ্মমীমাংসাদর্শনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াধর্ম্মী সাধনার গণ্ডির বহির্ভাগে স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মকে জানার ইচ্ছার নামই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। জানা আর প্রাগুক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট উপাসনা এক পদার্থ নহে। "ব্রহ্মজ্ঞান" এই শব্দটি, যাহা শাস্ত্রে ও ভদ্র-সমাজে প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ ব্রহ্মোপাসনা নহে, কিন্তু ব্রহ্মকে জানা। যাঁহারা ব্রহ্মকে এক বা বহুদৃষ্টিতে, নিরাকার বা সাকার উল্লেখে দেবতারূপে পূজা করেন তাঁহাদের,

ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য লক্ষ্য থাকিতে পারে। যদি ব্রহ্মজ্ঞানে লক্ষ্য না থাকে তবে সে উপাসনা বীর্য্যবত্তর অথবা জ্ঞানসাধন নহে। যদি লক্ষ্য থাকে এবং সে উপাসনা শাস্ত্রবিহিত হয়, তবে সেস্থলে তাঁহাদের পূজানুষ্ঠানাদি হয় কর্ম্মযোগ, না হয় ভক্তিযোগ মাত্র। তাদৃশ যোগ কেবল চিত্তশুদ্ধিজনক। নতুবা ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই ব্রহ্মমীমাংসাদর্শনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐরূপ পূজানুষ্ঠানাদি-যোগকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন, বা উপনিষৎ ও বেদান্তদর্শনসিদ্ধ ব্রহ্মবিচার বলা যায় না। এবং তাঁহাদের উপাস্য তাদৃশ উপাধিভেদবিশিষ্ট ব্রহ্মকে মোক্ষস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ বিজ্ঞের আত্মা বা নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেন না শ্রুতি আছে "নেদং যদিদমুপাসতে" যাহাকে লোকে প্রাগুক্ত প্রকারে উপাসনা করে, তিনি মোক্ষস্বরূপ ও আত্মজ্ঞানের কীর্ত্তনকারিণী বৈদান্তিকী শ্রুতিগণের লক্ষ্য ব্রহ্ম নহেন। ঐ সকল উপাসনা, উপাসকের কর্ত্তাত্মক-অভিমানশূন্য নহে। সুতরাং তাহা, স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্মজ্যোতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের প্রকাশক হইতে পারে না। তাঁহার যে স্বয়ম্প্রকাশ জ্যোতিঃ, তাহা উক্ত অভিমান বিদূরিত হইলেই দৃষ্ট হয়। তদালোকে তাঁহাকে আত্মারূপে জানা যায়। তাঁহাকে সেইরূপে জানারই উপদেশ সর্ব্ববেদান্তে শ্রুত হয়। তাঁহাকে সেইভাবে জানিলেই জীব, মৃত্যুকে অতিক্রম করে। তাহার অন্য পন্থা নাই। ইহা বেদের চরম সিদ্ধান্ত। কিন্তু ঐ সকল উপাসনা, সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মকে জানার নিমিত্তে নহে। তৎসমস্ত পার্থিব ও স্বর্গীয় মঙ্গললাভার্থ। তাঁহার কৃপাভিক্ষার নিমিত্তে। কিন্তু শ্রুতি কহেন, একমাত্র তাঁহাকে জানা ব্যতীত জন্ম মৃত্যু ও উৎক্রমণ নিবারণের অন্য উপায় নাই। অতএব উপরিউক্ত লক্ষণবিশিষ্ট উপাসনা সমস্ত, নির্গুণ, নিরুপাধিক, সাক্ষাৎ মোক্ষস্বরূপ, ব্রহ্মাত্মজ্ঞানস্বরূপ, ব্রহ্মপক্ষে সঙ্গত হয় না। এজন্য সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, যথোক্তলক্ষণ ব্রহ্মের উপাসনা নাই।

১১৪। এপর্য্যন্ত নির্গুণব্রহ্মের লক্ষণ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও বেদান্তাধ্যয়ন আর উভয়ের হেতুস্বরূপ চিত্তশুদ্ধির বিবরণ, এবং উপাসনার সাধারণ লক্ষণ প্রদর্শিত হইল। এইক্ষণে নির্গুণোপাসনার তাৎপর্য্য ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ যাহা কিছু আছে এবং তাদৃশ উপাসনায় নির্গুণব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মাত্মজ্ঞানীর বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ থাকে কি না, তাহাই বলা যাইতেছে।

(১১) নির্গুণোপাসনার লক্ষণ।

১১৫। ইহা বলা বাহুল্য যে, ইতিপূর্ব্বে উপাসনার যে সাধারণ লক্ষণ দেখান গিয়াছে, নিরঞ্জন-ব্রহ্মোপাসনায়, তাহার সম্ভব নাই। কেননা তাহা কর্ত্তৃতন্ত্র, কর্ত্তৃভোক্তৃঅভিমান-লক্ষণ, ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অন্তর্গত বিধি ও ক্রমবিহিত, মন্ত্রসমবায়ী, অথবা চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানের পরম্পরা কারণস্বরূপ ক্রিয়া মাত্র। কিন্তু নিরঞ্জন ব্রহ্মের যে নির্গুণ উপাসনা তাহা জ্ঞানপ্রবাহ মাত্র। তাহা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মপরতন্ত্র; কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য; ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অতিক্রান্ত; বিধিকৈঙ্কর্য্য ও ক্রমবিহিত এবং পদ্ধতিপর অনুষ্ঠানের অতীত; মন্ত্র ও মন্ত্রাধীপ দেবতার উদ্ধপদস্থ; এবং যোগযাগতপস্যাদিকৃত চিত্তশুদ্ধির পরিপক্ক ফলস্বরূপ হইলেও তাহার অতিক্রান্ত। পুষ্প যেমন ফল নহে, চিত্তশুদ্ধিও

সেইরূপ জ্ঞান নহে। অতএব জ্ঞান স্বতন্ত্র পদার্থ। চিত্তবৃত্তিসম্ভূত জ্ঞানক্রিয়া, ভক্তিক্রিয়া ও তপঃক্রিয়ার কোন লক্ষণ তাহাতে নাই। এই নির্গুণোপাসনার উল্লেখ ও আদর সমস্ত মোক্ষশাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। তাহা অল্প অল্প ভিন্নতার সহিত নানাপ্রকার লক্ষণদ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসারূপ সাধারণ অধিকারের মধ্যেও আবার তারতম্যরূপে ব্যক্তিগত অধিকার দৃষ্ট হয়। সেই সমস্ত অধিকারানুসারে, নির্গুণোপাসনার প্রকারভেদ দেখিতে পাই। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নির্গুণ নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম। অপরোক্ষ অনুভূতি সহকৃত সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই সমস্ত উপনিষৎ এবং বেদান্তদর্শনের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত। তাহাই ব্রহ্মাত্মজ্ঞানরূপ স্বরূপ লক্ষণ। তাহার অনুশীলন, বিচার ও ধারণাই ঐ সমস্ত নির্গুণাধিকারে ব্রহ্মোপাসনা শব্দের বাচ্য। তাহাই সর্ব্বোচ্চ অধিকার। তন্নিম্নস্থ অধিকারসমূহের তারতম্য অনুসারে, বিবিধ সোপানের ন্যায় উপদেশ সকল দৃষ্ট হয়। সমস্তই নির্গুণ নিরঞ্জনের উপাসনা নামে অভিহিত হইয়াছে। সেই সমস্ত সোপান বা উপাসনারূপ উপায় দ্বারা ঐ সর্ব্বোচ্চ অধিকারে আরোহণ করিতে হইবে। তাহাই ব্রহ্মোপাসকের চরমলক্ষ্য। তাহাই বেদান্তশাস্ত্রের মহদুদ্দেশ্য। কোন কোন আচার্য্য ঐ সকল উপাসনাকে যোগ সংজ্ঞা দিয়াছেন. ফলে তাহা কর্ম্মযোগ নহে।

হিন্দুজাতির কামান বন্দুক।

আমরা ইতিপূর্ব্বে হিন্দুজাতির বিমান বা Balloon এবং লৌহবর্ত্ম ও বাষ্পীয় শকটের কথা বলিয়াছি, সম্প্রতি এই প্রবন্ধে তাহাদিগের কামান ও বন্দুকের কথা বলিব। অবশ্য পাশ্চাত্যমায়ামুগ্ধ স্বর্ণোপনেত্র যুবকেরা কেহ কেহ আমার বাষ্পীয় শকটের কথা কর্ণগত করিয়া বলিয়াছিলেন যে—"হিন্দুরা কথনই বিজ্ঞানে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন না।" এবং এবারও হয় ত বলিবেন যে "কামান ও বন্দুকের সত্তা শ্রুতিগোচর করিলেও কি হিন্দুরা বাঁশের ধনুক ও তীর দিয়া বর্ব্বর জাতির ন্যায় নামে যুদ্ধ করিয়া মরিতেন না? অতবড় রাম রাবণের যুদ্ধ, শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ ও ভারতযুদ্ধে কয়টা কামান ও বন্দুকের ব্যবহার হইয়াছিল, প্রধানতম যোদ্ধা গাণ্ডীবী কি কেবল বাঁশের গাণ্ডীব লইয়াই লম্ফ ঝম্প প্রদান করিয়া যান নাই?"

হাঁ, একথাগুলি ঠিকই, কিন্তু তথাপি আমরা বলিব যে, আমাদিগের দেশে বহুকালপূর্ব্বে কামান ও বন্দুকের ব্যবহার হইত, উহার

নির্ম্মাণপ্রণালী হিন্দুরাই অবগত ছিলেন, প্রয়োজন হইলে ব্যবহারও করিতেন এবং এই কামান, গন্ ও বন্দুক শব্দও সংস্কৃতমূলক, কিন্তু উহা অতি লোকক্ষয়কর বলিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা উহার পরিহার করেন।

অক্রোধনাঃ শৌচপরাঃ
সততং ব্রহ্মচারিণঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা মহাভাগাঃ
পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ॥ ১৯২—৩য়
মনুসংহিতা।

আমাদিগের পূর্ব্ব-পিতামহেরা দেবোপাধিক ছিলেন, তাঁহারা বহু যুদ্ধবিগ্রহ করার পর নরহত্যা পাপবোধে একবারেই অস্ত্রশস্ত্রের পরিহার করিয়া ক্ষমার বশবর্ত্তী হয়েন। ক্রোধ কাহাকে কহে, তাহা আর তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা শৌচপরায়ণ ও কি গুরুগৃহে কি স্বগৃহে সর্ব্বত্র সতত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শান্তিতে কাল কাটাইতে থাকেন। সুতরাং তখন আর তাঁহারা অস্ত্র দিয়া কি করিবেন? উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় উহার নির্ম্মাণকার্য্যও স্থগিত হইয়া গেল, যাহার যত কামান বন্দুক ছিল, তাহা মরিচা ধরিয়া বিনষ্ট হইল, ভূমিকম্পে ভূগর্ভে প্রোথিত লৌহবর্ম্মের লৌহাবলীর ন্যায় উহারাও অচিহ্ন হইয়া গেল। সব ফুরাইল।

ধরিয়া লইলাম এই কথাগুলিই ঠিক, কিন্তু এই সকল বৈজ্ঞানিকবিষয়ের গ্রন্থাবলীও ত দৃষ্ট হয় না, সেগুলি কোথায় গেল? পুনঃ পুনঃ গৃহদাহ, খণ্ডপ্রলয় বা জলপ্লাবন, কীটদংশন, এবং যবনজাতিকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ উৎপীড়ন ঘটায় তাঁহাদিগের অগ্নিশিখায় হিন্দুর গ্রন্থাবলী নিঃশেষিত হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি যে দুচারখানা গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহাতে যে ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্রের কথা একবারেই নাই তাহাও নহে।

হাঁ, নানা গ্রন্থে বিমান, বজ্র,স্বধিতি, শতঘ্নী ও কর্ণি-প্রভৃতি কথা রহিয়াছে, কিন্তু ঐ সকল শব্দকদম্বক যে কল্পনামহাসাগরের ক্ষণভঙ্গুর ফেণবুদ্বুদ নহে, তাহা কে বলিল? বজ্র প্রভৃতি শব্দের অর্থ ব্যক্তিচ্ছলেও ত কোন কোষকার বলিয়া যান নাই যে উহারা আমাদিগের কোন আগ্নেয়াস্ত্র?

কিন্তু তোমরা আমাদিগের পুরীর জগন্নাথ এবং ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিয়াছ। এই সকল অত্যুন্নত মন্দিরের গাত্রসংলগ্ন অবহনীয় প্রস্তরখণ্ড সকল কি কৌশলে উত্তোলিত ও যথাযথভাবে যোজিত হইয়া মন্দিরের আকারে পরিণত হইয়াছিল, তাহা তোমাদের বৈজ্ঞানিকেরা কি আজিপর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিয়াছেন?

আর তোমাদিগের অত্যুন্নত বিজ্ঞানবিৎ পাশ্চাত্যগণ কি আমাদিগের বহু প্রাচীনতম মন্দিরাদি দেখিয়া মহাবিস্ময়ের সমাশ্রয় করেন নাই? আমরা আমাদিগের এই উক্তির সমর্থনজন্য এখানে শিবপুরকলেজপত্রিকা হইতে একটি প্রবন্ধের এক দেশ অধ্যাহৃত করিব।

"দিল্লীর লৌহস্তম্ভ—পূর্ব্বকালে হিন্দুরা পূর্ত্তবিভাগে কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত এখনও অনেক পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়া আধুনিক সভ্যজগতের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ হন। এমন কি মুসলমানদিগের সময়েও এ বিদ্যার ভারতে গৌরব ছিল। তাহার প্রধান নিদর্শন আগ্রার তাজমহল। তাজমহলের ইমারতের শিল্প-

কুশলতা দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হন। শুধু ইমারতের সৌন্দর্য্য কেন? একটি প্রস্রবণের পূর্ত্তকৌশলও অনেকেই স্থির করিতে পারেন নাই। সেটি এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইংরাজেরা ইহার কৌশল দেখিতে গিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন বড় বড় ইঞ্জিনিয়রেরা পর্য্যন্ত ইহাকে আর সংস্কার করিতে পারিতেছেন না। প্রাচীন দিল্লীনগরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্তম্ভটি লৌহস্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করিলাম, কিন্তু লৌহ কিংবা অন্য কোন ধাতুদ্বারা ইহা গঠিত হইয়াছে, সে বিষয়ে এখনও বড় বড় পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে।" ১১৭—১৮ পৃষ্ঠা।

স্তম্ভটি ভূমি হইতে ২২ ফুট উচ্চ। কিন্তু মৃত্তিকার নীচে কতখানি পোথিত আছে, তাহা এখনও ধার্য্য হয় নাই। জেনারেল কানিংহাম ১৮৬৩ খৃঃ অঃ Proceedings of Archeology on Surveyor to the Govt of India লিখিয়াছেন যে—২৬ ফিট মৃত্তিকা খনন করিয়াও তিনি ঐ স্তম্ভের তলদেশ প্রাপ্ত হন নাই। শুধু তাহাই নহে, এত অধিক গহ্বর করাতেও স্তম্ভটি ঠিক একইভাবে দণ্ডায়মান ছিল। তাহাতেই তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, স্তম্ভটির দৈর্ঘ্য মোটের উপর ৬০ ফুট হইবে। তিনি পরে আরও বলিয়াছেন যে, স্তম্ভটির নিম্নাংশ সমস্ত নিরেট নহে। মৃত্তিকা হইতে ৩ ফুট নিম্নে ইহা শালগমের ন্যায় গোলাকৃতি। এবং তাহা হইতে মোটা মোটা লৌহদণ্ড নীচে নামিয়া গিয়াছে। সেগুলি কীলক ও প্রস্তরদ্বারা তাহাদের স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। স্তম্ভের উচ্চাংশের ব্যাস প্রায় ১৬ ইঞ্চ, নিম্নাংশের ১২৷৷০ ইঞ্চ হইবে। Cunningham সাঁহেবের মতে স্তম্ভটির ওজন ১৭ টন্ অর্থাৎ প্রায় ৪১০ মণ। এখন পর্যান্ত ইহার কোন অংশে মরীচা পড়ে নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা সমস্তই নিরেট। পুরাকালে অনেকানেক বৃহৎ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে হিউএন কর্ত্তৃক বর্ণিত বৌদ্ধদেবের মূর্ত্তি একটি ও রোডস্ দ্বীপের বৃহৎ মূর্ত্তি আর একটি। কিন্তু এই দুইটি প্রাচীন মূর্ত্তি পিত্তল বা তাম্রনির্ম্মিত, সমস্ত বিভিন্ন অংশ পৃথক্ নির্ম্মিত হইয়া একত্রীকৃত হইয়াছে, এবং মূর্ত্তিগুলি সমস্তই ফাঁপা। সুতরাং তাহাদের সহিত দিল্লী-স্তম্ভের তুলনাই হইতে পারে না। স্তম্ভটির গাত্রের অক্ষরগুলি সমস্ত জাতির অত্যাচার সহ্য করিয়াও এখনও স্পষ্টরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অক্ষরগুলি দেবনাগরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। * * স্তম্ভগাত্রের এই লিখন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রাজা ধব, তাঁহার দিগ্বিজয় চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। Mr. Prinsep F. R. S. বলেন যে ইহা তৃতীয় কিংবা চতুর্থ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। ১২০ পৃষ্ঠা।

অনেকে বলেন ইহা লৌহ, কিন্তু ঢালাই কিংবা হাপরে পেটাই করিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, সে বিষয়ে অনেকেরই মতভেদ আছে। স্তম্ভটিতে গোলার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। যেখানে চিহ্ন আছে, সেখানকার কতকাংশ গোলা দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছে, এবং অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা পিটিয়া কিংবা হাপরে ফেলিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। এই স্তম্ভের সামান্য অংশ কাটিয়া ইংলণ্ডে পাঠান হইয়াছিল। Dr.

Percy এই অংশ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ইহা ঢালাই হইতে পারে না। ইহা পেটাই কিংবা হাপরে প্রস্তুত হইয়াছে। ১২১ পৃষ্ঠা।

Times পত্রিকায় ১৮৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে একজন লিখিয়াছেন যে, তবে এরূপ হইতে পারে যে, সে সময়ের হিন্দুরা ঢালাই লৌহের স্তম্ভাদিনির্ম্মাণে দক্ষ ছিলেন। এবং তাহারই ফলে এই সুবৃহৎ স্তম্ভ এখনও তাঁহাদের কীর্ত্তি জ্ঞাপন করিতেছে। কালে সে বিদ্যা লোপ পাইয়াছে। ১২২পৃঃ

বাষ্প কিংবা বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার সাহায্যে যন্ত্রাদি পরিচালনা তখন সকলেরই অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং এ সমস্ত বাধা বিঘ্ন কি করিয়া সে সময়ের হিন্দুরা অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা অনেকেই স্থির করিতে পারেন নাই। ১২৩পৃঃ

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

এখন পাঠকেরা দেখুন, অতবড় একটা প্রকাণ্ড লৌহজগৎকে উত্তপ্ত করিলে, উহার কয় যোজন দূর পর্য্যন্ত মানুষকে সরিয়া যাইতে হয়? এমন অগ্নিকুণ্ডকে মানুষ কি প্রকারে পিটিতে পারে? সুতরাং ইহা যে ঢালাই লৌহ, তাহাতে কোন দ্বিধাই নাই। পেটা হইলে কখনই ফাটিয়া যাইত না। সুতরাং যাঁহারা সে দিনও লোহার ঢালাই কাজ করিতে জানিতেন, তাঁহারা যে লোহার ঢালাই করিয়া কামান নির্ম্মাণ করিবেন তাহাতে কি বৈচিত্র্য থাকিতে পারে? রামচন্দ্রের ইঞ্জিনীয়ার জাম্ববান্ কি বস্তুতই সাগরে ভাসমান সেতুর যোজনা করিয়াছিলেন না? হিন্দুরা বাষ্পের প্রকৃতি অনবগত থাকিলে কি প্রকারে তবে

মনোজবং কামগমং হেমজালবিমণ্ডিতং

বিমানের নির্ম্মাণ ও পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? কি প্রকারে তাঁহারা বাষ্পীয় শকট চালাইয়া গিয়াছেন? অর্জ্জুনের যে সম্মোহনাস্ত্রে কুরুকুল মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা কি এডিশনের প্রস্তাবিত বৈদ্যুতিক তারবিশেষের শ্রেণীবিশেষ নহে? কেমন করিয়া মেঘনাদ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া বিমানযুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? রামের পুষ্পকারোহণে লঙ্কা হইতে ভারতে আগমন কি প্রকৃত ঐতিহ্য নহে? মুর্শিদাবাদের ইতিহাস বলিতেছেন যে, "জাহানকোষার গাত্রে ৯ খণ্ড পিত্তল ফলকে আরবী ভাষায় ইহার বিবরণ লিখিত আছে। পিত্তলফলকে এইরূপ লিখিত আছে যে, এই জাহানকোষা সাহাজাহানের রাজত্বকালে ইসলাম খাঁর সুবেদারী সময়ে জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) দারোগা সের মহম্মদের অধীনে হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে জনার্দ্দন কর্ম্মকার কর্ত্তৃক ১০৪৭ হিজরী সনে ১১ই ইমাদিয়মসানি মাসে নির্ম্মিত হইল। ইহার ওজন ২১২৸ মণ, ইহাতে ২৮ সের বারুদ লাগিয়া থাকে।" ৪৬২ পৃঃ

এই কামানের দৈর্ঘ্য ১২ হাত, বেড় ৩ হাতেরও অধিক, মুখের বেড়টি ১ হাতেরও উপরে, সে কামানটি কি সহজেই নির্ম্মিত হইয়াছিল? নির্ম্মাতা একজন ঢাকাই হিন্দু কর্ম্মকার, তত্ত্বাবধায়কও একজন হিন্দু, নির্ম্মাণ স্থানও ঢাকা। যখন তোমরা দেখাইতে পারিতেছনা যে, উক্ত লৌহস্তম্ভ ও এই ঢাকাই কামানটি কোন গ্রীক বা ইংলণ্ডীয় অথবা কোন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের সহায়তায় বা পরামর্শে বিনির্ম্মিত, তখন এই অধঃপতিত ভারতের অধঃপতিত সন্তান জনার্দ্দনের পূর্ব্ব-

পিতামহগণ যে কতদূর শিল্পদক্ষ ছিলেন, তাহা কেন একবার নয়ন মুদিয়া ভাবিয়া দেখ না? অতএব হিন্দুরা পূর্ব্বে কামান বন্দুক প্রস্তুত করিতে জানিতেন না, অথবা তাঁহাদিগের এই সকল আগ্নেয়াস্ত্র ছিলনা, ইহা মনে ভাবা নিতান্ত অসঙ্গত। ঢাকার চকবাজারে যে একটা প্রকাণ্ড কামান পড়িয়া রহিয়াছে, উহাও কি ভারতবাসীর মহাগৌরব বিঘোষিত করে না?

বলিবে, তবে হিন্দুর কোন গ্রন্থে Cannon ও Gun বা বন্দুক শব্দের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? কেন পাওয়া যাইবে? হিন্দুর কোন গ্রন্থে কি Ganges, Benares ও Oude শব্দের অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে? কিন্তু গঙ্গা, বারাণসী ও অযোধ্যা শব্দ যে কোন হিন্দুশাস্ত্রেই বিরাজমান। তদ্রূপ কোন হিন্দু-গ্রন্থেই Cannon, Gun ও বন্দুক শব্দ বিদ্যমান নাই, কিন্তু রহিয়াছে ঐ সকল শব্দের আদি নিদান কর্ণকাবতী, কর্ণী ও বিন্দুক শব্দ। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে বিবৃত রহিয়াছে—

এষা বৈ সূর্ম্মী কর্ণকাবতী এতয়া হ স্ম বৈ দেবা অসুরাণাং শততর্হান্ তৃংহন্তি। যদেতয়া সমিধ মাদধাতি বজ্রমেব এতচ্ছতঘ্নীং যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি।

২য় খণ্ড—১৯৫পৃ—মহীশূর সংস্করণ।

তত্র ভট্টভাস্কর—জ্বলন্তী লোহময়ী স্থূলা-সূর্ম্মী। কর্ণকাবতী অন্তঃসুষিরবতী অন্তর্ব্বহিশ্চ জ্বলন্তী। দেবা এতয়া অসুরাণাং মধ্যে শততর্হান এক প্রহারেণ শতস্য হন্তৄন তৃংহন্তি স্মন্তি স্ম।

তত্র সায়ণভাষ্যঞ্চ—জ্বলন্তী লোহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী, সাচ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী অতএব জ্বলন্তী অর্থঃ। একেন প্রহারেণ শতসংখ্যাকান্ মারয়ন্তঃ শূরাঃ শততর্হাঃ। অসুরাণাং মধ্যে তাদৃশান্ এতয়া দেবা হিংসন্তি।

আমরা এই উভয় ভাষ্যের প্রতিই অনাস্থা-বান্। ভট্ট ভাস্কর, সায়ণভাষ্যের প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়াছেন। কিন্তু "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরাণ সাধয়তি?"। ফলতঃ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ইহাই—

এই যে কর্ণকাবতী (কর্ণবিশিষ্ট) লৌহময় অস্ত্র, ইহার নাম সূর্ম্মী (শর্ম্ম), দেবগণ ইহার দ্বারা অসুরগণের শত শত গোলন্দাজ সৈন্য বধ করিয়াছিলেন। সূর্ম্মীর সাহায্যে দেবতারা সমিধ আহরণ করিতেন, বজ্রই শতঘ্নী, দেব যাজ্ঞিকগণ ইহার দ্বারা ভ্রাতৃব্য অসুরগণকে প্রহার করিতেন।

কর্ণকাবতী কি? যাহার কর্ণকা বা কাণ আছে। প্রাচীন কালের কামান বন্দুকের কাণ থাকিত, উহাতে ছিদ্র থাকে ও সেই ছিদ্রে পলিতা বা বারুদ দেয়। সুতরাং কর্ণকা-বতী অর্থ, মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট বা অন্তঃসুষির নহে, অপিচ সূর্ম্মী অন্তর্ব্বহির্জ্বলন্তীও নহে। আর সূর্ম্মীও এই অস্ত্রের প্রকৃত নাম নহে, প্রকৃত নাম শর্ম্ম। যে প্রকার স্বর্গশব্দকে যজুর্ব্বেদ সুবর্গ করিয়াছেন, তদ্রূপ ঋগ্বেদের শর্ম্মশব্দ প্রাদেশিকত্বনিবন্ধন অপোগস্থানে যাইয়া সূর্ম্মী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

সপ্ত চৎ পুরঃ শর্ম্ম শারদীঃ
দর্ত্ত্ দাসীঃ। ১০-২০সূ—৬ম।

তত্র সায়ণভাষ্য—হে ইন্দ্র ত্বং শারদীঃ শরন্নাম্নঃ অসুরস্য সম্বন্ধিনীঃ সপ্ত পুরঃ পুরী (পুর্য্যঃ?) শর্ম্ম শর্ম্মণা বজ্রেণ দর্ত্ত্ বিদারিতবান্।

যাহা হউক, বেদের এই কর্ণকাবতী শব্দ বিকৃত হইয়া লাটিন ভাষায় Canna (কন্না)

হইয়া পরে ফরাসী ভাষায় Canon ও ইংরেজীতে Cannon হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ সংস্কৃত "কর্ণী" শব্দ বিকৃত হইয়া Gun শব্দের জন্মদান করিয়াছে। মনুতে বিবৃত রহিয়াছে যে—

> ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ
> যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
> ন কর্ণিভি র্নাপি দিগ্ধৈ-
> র্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥ ৯০—৭অ।

গুপ্তি প্রভৃতি কূটাস্ত্র, কর্ণি প্রভৃতি অগ্নিজ্বলিত তেজন ও বিষদিগ্ধ অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিবে না।

এই কর্ণী শব্দের অর্থ মেধাতিথি প্রভৃতি টেঁটা বা ঐরূপ কোন অস্ত্র করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। এই কর্ণী অর্থই কাণবিশিষ্ট সূর্ম্মী বজ্র বা শত শত লোকনাশক শতঘ্নী। উক্ত কর্ণী শব্দের অপভ্রংশে কন্নি হইয়া পরে গন্নি হইয়াছিল (যেমন সংস্কৃত কোণ গ্রীক Gonia, ত্রিকোণমিতি Trigonometry) পরে গন্নি, যাইয়া Gun এ পরিণত হইয়াছে। ঐরূপ আমাদেরই "বিন্দুক" শব্দ যাবনিক ভাষায় বন্দুকে পরিণত হইয়াছিল।

> বাণভঙ্গ করাবর্ত্ত
> কাষ্ঠচ্ছেদনমেব চ।
> বিন্দুকং গোলকযুগং
> যো বেত্তি স জয়ী ভবেৎ॥ ৫২॥
>
> বশিষ্ঠকৃত ধনুর্ব্বেদসংহিতা।

যে ব্যক্তি শত্রুর বাণ ভগ্নকরণ, শত্রুর বাণ হইতে দেহ রক্ষা করার আবর্ত্ত বা দেহ পরিবর্ত্ত, কাষ্ঠচ্ছেদন, বিন্দুক বা চাঁদমারী অর্থাৎ লক্ষ্যভেদ ও বন্দুকের মাছি এইটির ব্যবহার ভাল করিয়া জানে, সেই বিজয়ী হইয়া থাকে। এই "বিন্দুক" শব্দ হইতেই বন্দুকশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা দ্বারা বিন্দুক বা চাঁদমারী করে।

সুতরাং কামান, বন্দুক বা Gun শব্দ পরমার্থতঃ বৈদেশিক নহে, উহারা আমাদিগেরই পালের বাছুর। উহারা আমাদিগের বেদের বজ্র, স্বধিতি, শতঘ্নী, কুলিশ, অশনি, পবি ও ও শর্ম্ম প্রভৃতি শব্দেরই দায়াদবান্ধব। অবশ্য আমাদিগের এ কথায় সকলেই শিহরিয়া উঠিবেন যে "সে কি কথা, বজ্রাঘাত বা বাজ পড়িয়া প্রতিদিন যখন শত শত লোক মরিতেছে, বৃক্ষাদির চূড়া ভগ্ন হইতেছে ও গৃহ সকল দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তখন আমরা সেই প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া আজি একটা মিথ্যা কল্পনার আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক বজ্রকে কামান বলিয়া স্বীকার করিব? বজ্রের যে ঠাঁটা? এই ঠাঁটা পড়ার নামই ত বজ্রাঘাত বা বাজ পড়া অথবা অশনিসম্পাত!

হাঁ, কথা এইরূপই বটে। আমরা বহু পুরুষপরম্পরাক্রমে ভ্রান্তির দাস হইয়া যে সংস্কার বান্ধিয়া ফেলিয়াছি, তাহাতে সহসা কেহ ইহার বিপরীত কোন কথা শুনিতে চাহিবেন না, কিন্তু পরমার্থতঃ বজ্র ঠাঁটা বা বিদ্যুৎপাত নহে, উহা লৌহনির্ম্মিত কামানবন্দুক। তবে অমর কেন বলিলেন---

> স্ফূর্জথুর্বজ্রনিষ্পেষো
> মেঘজ্যোতিরিরম্মদঃ।

তত্র রঘুনাথচক্রবর্ত্তী—স্ফূর্জ্জেতি দ্বয়ং সাটোপমেঘসংঘজে শব্দে মেঘেতি দ্বয়ং অন্যোন্যসংঘট্টনাৎ মেঘাৎ নিঃসৃতা যৎ জ্যোতিঃ বৃক্ষাদৌ পততি তত্র। মেঘস্য জ্যোতিঃ অগ্নিঃ মেঘজ্যোতিঃ।

মেঘসমূহের যে ভীষণ ধ্বনি তাহার নাম স্ফূর্জথু ও বজ্রনিষ্পেষ, আর মেঘে মেঘে সম্মিলন হইলে উহা হইতে যে জ্যোতিঃ বা অগ্নি নিঃসৃত হইয়া বৃক্ষাদির উপর নিপতিত হয় উহার নাম মেঘজ্যোতিঃ বা ইরম্মদ।

হাঁ, অমর এইরূপই লিখিয়াছেন বটে,কিন্তু ইহা প্রমাদপরিশূন্য নহে। স্ফূর্জথু মেঘধ্বনি; পরন্তু বজ্রধ্বনি নহে। ঐরূপ মেঘমন্দ্রের নামান্তর বজ্রনিষ্পেষও হইতে পারে না। তবে বজ্রবৎ কামানবং নিষ্পেষ মর্দ্দন যাহার, এইরূপ বিগ্রহবাক্যে উহাকে বজ্রনিষ্পেষ বলা যাইতে পারে। ঐরূপ বিদ্যুৎপাতের নামান্তর ঠাটা পড়া, পরন্তু বজ্রপাত বা অশনিসম্পাত হইতে পারে না। বিদ্যুৎ ও বজ্র যে এক নহে, তাহা অমরের লিখনভঙ্গীদ্বারাও সপ্রমাণ হইয়া থাকে।

বিদ্যুৎ শম্পা শতহ্রদা হ্রাদ
নৈরাবত্যঃ ক্ষণপ্রভা।
তড়িৎ সৌদামিনী
বিদ্যুৎ চঞ্চলা চপলাপি চ॥

বজ্র হ্রাদিনী বজ্রমস্ত্রী স্যাৎ
কুলিশং ভিদুরং পবিঃ।
শতকোটিঃ স্বরুঃ শম্বো
দম্ভোলিরশনিদ্বয়োঃ॥

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যুৎ ও বজ্রের নামগত কোন সমতা নাই। অবশ্য একমাত্র হ্রাদিনী শব্দ উভয়ত্র গৃহীত হইয়াছে। এবং অমর ও মেদিনীকর গুপ্ত স্থানান্তরে বলিয়াছেন যে—"হ্রাদিন্যৌ বজ্রতড়িতৌ"—"হ্রাদিনী বজ্রতড়িতোঃ" কিন্তু ইহাও প্রমাদ। তড়িৎ হ্রাদিনী বটে, পরন্তু বজ্র হ্রাদিনী বাচক নহে। অবশ্য অমর ও মেদিনী নিশ্চয় কোন না কোন নিগম বা শিষ্টপ্রয়োগের অনুবর্ত্তী হইয়া এই প্রমাদের উদ্বমন করিয়াছেন এবং প্রথমখণ্ড অথর্ব্ববেদের একাশী পৃষ্ঠায় যে আছে—"স্তন য়িত্নবে অশনয়ে", উহাও সাধীয়ান্ প্রয়োগ নহে। কিন্তু পরমার্থতঃ বজ্র ও বিদ্যুৎ জিনিষ এক নয়, বজ্রকে হ্রাদিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করাও সমীচীন কার্য্য হয় নাই।

হ্রাদিন্য ইব মেঘেভ্যঃ
শল্যস্যন্যপতন্ শরাঃ।

২৫—১১অ, শল্যপর্ব্ব।

অর্থাৎ মেঘ হইতে যে প্রকার বিদ্যুৎপাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শল্যের ধনুক হইতে বাণ সকল পতিত হইতেছিল।

ইহাই প্রকৃত শিষ্টপ্রয়োগ। মহাভারত ও রামায়ণে যে ইহার কোন ব্যভিচার ঘটে নাই, আমরা তাহাও মনে করিয়া থাকি না। কিন্তু হ্রাদিনী শব্দ পরমার্থতঃ কেবল বিদ্যুদর্থবাচী। অমরাদি যে হ্রাদিনী শব্দকেও বজ্র বা অশনিপর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা ঠিক হয় নাই। পক্ষান্তরে মহামহোপাধ্যায় পুরুষোত্তম দেবগুপ্ত, তাঁহার ত্রিকাণ্ডশেষে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই নির্দ্দোষ বটে।

বজ্রাশনির্ভিদুর্ভিদ্রো
দম্ভোলিস্ত্রিদশায়ুধং।
শতধারং শতারঞ্চ
পোত্রং ভিদুরমক্ষজম্॥

অর্থাৎ বজ্র, অশনি, ভিদু, ভিদ্র, দম্ভোলি, শতধার, শতার, পোত্র, ভিদুর ও অক্ষজ শব্দ ত্রিদশায়ুধার্থবাচী। অমর—কুলিশ, পবি, শতকোটি, স্বরু ও শম্ব শব্দের যে গ্রহণ করিয়াছেন উহারাও ত্রিদশায়ুধ বটে। কিন্তু হ্রাদিনী বা বিদ্যুৎ ত্রিদশায়ুধ নহে। আমরা যে রাম-

ধনু বা ইন্দ্রধনু প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকি, উহাও ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদে বজ্র বা কামান স্বধিতি,শর্ম্ম,সূর্ম্মী ও শতঘ্নী প্রভৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন যে—

বজ্রো বৈ স্বধিতিঃ। ৩৯১পৃঃ
বজ্রমেব এতচ্ছতঘ্নীং
যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি।
৩২০ পৃষ্ঠা।

বজ্রই স্বধিতি, বজ্রই শতঘ্নী। দেবতারা আপনাদিগের ভ্রাতৃব্য দৈত্যদানবগণকে বজ্র বা শতঘ্নী প্রহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বজ্র বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ হওয়াতে তোমরা বিদ্যুৎপাতকে বজ্রাঘাত বা বাজ পড়া বলিতে পার না। ঠাঁটা পড়া বলিতে পার। বিদ্যুৎ-পাতকে ঠাঁটা পড়া বলে কেন?

আমরা মনে করি যে, যে "স্তন্তদার" শব্দের অপভ্রংশে ইউরোপে Thunder বলিয়া থাকে, সেই স্তন্তদার শব্দের বিকারেই আমাদিগের দেশে ঠাঁটা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

বলিবে, হাঁ বিদ্যুৎপাত ও বজ্রপাত যে এক কথা নহে, তাহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু বজ্রই যে কামান, তাহার প্রমাণ কি? কোন গ্রন্থে উহাদিগের আকারপ্রকার ও নির্ম্মাণপ্রণালীর কথাই বা না দেখা যায় কেন? স্বর্গ ও ভারতের লক্ষ লক্ষ কামানই বা কোথায় গেল? বন্দুক ও কামানের ব্যবহারই বা বন্ধ হইয়া গেল কি কারণে?

তোমাদিগের আড়াই হাজার বৎসরের বৌদ্ধ দন্তই যখন ত্রিশ ফিট মাটির নীচে প্রোথিত হইয়া যাইতে পারিল, তখন বহুসহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লৌহবর্ম্ম ও কামান সকল যে বহুসহস্র ফিট মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত হইয়া যাইবে, তাহা ধ্রুবই। রাষ্ট্রবিপ্লবে যবনজাতির হিন্দুসভ্যতার বিধ্বংসকারিণী বুদ্ধিতে এবং কীটদংশ ও অগ্নিদাহাদিতে ভারতের গৌরব-ভূমি গ্রন্থরাশি যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা কে না স্বীকার করিবেন? তবে বজ্র ও কামান যে একই তাহা বেদের বর্ণনাদ্বারাই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এবং রামায়ণ মহাভারতের বিবৃতি ও শুক্রনীতির বর্ণনা হইতে আমরা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি যে অতি অল্পদিন হইল আমাদিগের দেশ হইতে কামানবন্দুকের ব্যবহার তিরোহিত হইয়াছে। শুক্রনীতি বলিতেছেন যে—

নালাগ্নিচূর্ণস-যোগাৎ
লক্ষ্যে গোলনিপাতনং।
নালিকাস্ত্রেণ তৎ যুদ্ধং
মহাহ্রাসকরং রিপোঃ॥ ৩৬৬—৪অ
সপ্তম প্রকরণ।

কামান বা বন্দুকের নালে বারুদ ঢালিয়া দিয়া লক্ষ্যের উপর যে গোলা বা গুলির নিপাতন, তাহার নাম নালিকাস্ত্র-যুদ্ধ বা কামানবন্দুকের যুদ্ধ। ইহাতে শত্রুপক্ষের লোকদিগের অত্যন্ত ক্ষয় হইয়া থাকে। তাই ধর্ম্মপ্রাণ মহর্ষি মনু বলিতেছেন যে—

ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ
যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
ন কর্ণিভির্নাপিদিগ্ধৈ-
র্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥ ৯০—৭অ

রাজা কখন গুপ্তি প্রভৃতি কূটাস্ত্র, বিষ-দিগ্ধবাণ বা যাহা অগ্নিসংযোগে জ্বলিয়া উঠিয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ মারাত্মক হইয়া থাকে

এরূপ কর্ণী অর্থাৎ কাণবিশিষ্ট কামানবন্দু-কাদিদ্বারা যুদ্ধ করিবেন না।

সুতরাং ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীরা তদবধি মহালোকক্ষয়কর কামানবন্দুকের ব্যবহার করিতে বিরত থাকিলেন। শুক্রনীতি স্থানান্তরে বলিলেন যে—

অস্যতে ক্ষিপ্যতে যত্তু
মন্ত্রযন্ত্রাগ্নিভিশ্চ তৎ।
অস্ত্রং তদন্যতঃ শস্ত্রম্
অসিকুন্তাদিকং চ তৎ॥ ১৯১
অস্ত্রন্তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং
নালিকং মান্ত্রিকং তথা।
যদা তু মান্ত্রিকং নাস্তি
নালিকং তত্র ধারয়েৎ॥ ১৯২
নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং
বৃহৎক্ষুদ্রবিভেদতঃ। ১৯৫

যাহা মন্ত্র, যন্ত্র কিংবা অগ্নিসংযোগে দূরস্থ শত্রুর প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তাহার নাম অস্ত্র, আর যাহা হাতে রাখিয়া শত্রুর দেহে প্রহার করিতে হয়, সেই অসি বা কুন্ত (কোঁচ) প্রভৃতির নাম শস্ত্র। অস্ত্র আবার মান্ত্রিক ও নালিকভেদে দ্বিবিধ। যখন মন্ত্রপ্রযোজ্য অস্ত্রের অভাব হইয়া থাকে, তখনই যোদ্ধার নালিকাস্ত্রের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। নালিকাস্ত্র আবার বৃহৎ ও ক্ষুদ্রভেদে দুই প্রকার। বৃহন্নালিক বা কামান এবং ক্ষুদ্রনালিক বা বন্দুক। শুক্রাচার্য্য তৎপরে বলিতেছেন যে—

তির্য্যগূর্দ্ধচ্ছিদ্রমূলং
নালং পঞ্চবিতস্তিকং।
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি
তিলবিন্দুযুতং সদা॥ ১৯৬
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎ
গ্রাবচূর্ণধৃক্ কর্ণমূলকম্।
সুকাষ্ঠোপাঙ্গ বুধ্নঞ্চ
মধ্যাঙ্গুল বিলান্তরম্॥ ১৯৭
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাতৃ
শলাকাসংযুতং দৃঢম্।
লঘুনালিকমপ্যেতৎ
পধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ॥ ১৯৮

যাহার দৈর্ঘ্য আড়াই হাত, গোড়ার দিকে উত্তম কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি উপাঙ্গ বা বাঁট, নালের ভিতর মধ্যমাঙ্গুলিপ্রবেশযোগ্য গর্ত্ত, পার্শ্বদেশে বারুদ গাদিবার শলাকা, আগায় ও গোড়ায় লক্ষ্য ঠিক করিবার জন্য তিলবিন্দু-দ্বয় সংযুক্ত, এবং গোড়ার দিকে একটু উপরে আড়ভাবে পলিতা দিবার রন্ধ্র ও একখণ্ড প্রস্তর ও বারুদ ধারণক্ষম কর্ণ থাকে, ও যাহা কল টিপিলে আঘাতদ্বারা অগ্নির উৎপাদন করে, তাহার নাম ক্ষুদ্রনালিক। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিকেরা ইহা লইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে।

যথা যথা তু ত্বক্‌সারং
যথা স্থূলবিলান্তরং।
যথা দীর্ঘং বৃহদ্গোলং
দূরভেদি তথা তথা॥ ১৯৯॥
মূলকীলভ্রমাৎ লক্ষ্য
সমসন্ধানভাজি যৎ।
বৃহন্নালিকসংজ্ঞং তৎ
কাষ্ঠবুধ্ন বিবর্জ্জিতং।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু
সুযুক্তং বিজয়প্রদং॥ ২০০॥

৪অ—৭ম প্রকরণ।

আর যে নালিকাস্ত্রের ত্বক্ সমধিক পুরু ও কঠিন, নালের মধ্যের ছিদ্র অপেক্ষাকৃত বড়, যাহাতে বড় গোলা ব্যবহার করিতে হয়, যাহার গোড়ায় কোন কাষ্ঠনির্ম্মিত বাঁট থাকে না, দুইটী কীলক বা শঙ্কু থাকে, তাহা ঘুরাইয়া লক্ষ্যভেদ করিতে হয়, যাহা শকট বা হস্তি প্রভৃতিদ্বারা বাহিত হইয়া থাকে, তাহার নাম বৃহন্নালিক। ইহার দৈর্ঘ্য যত বেশী ও গর্ভ ছিদ্র যত স্থূল হইয়া থাকে, ইহা তত দূরভেদী হইয়া থাকে। ইহা উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়।

মহামতি শুক্র অতঃপর অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ নির্ম্মাণের প্রণালী ও নালিকাস্ত্রসমূহ কিরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়, তাহার কথা বলিয়াছেন। তৎপর বলিতেছেন যে—

নালাস্ত্রং শোধয়েৎ আদৌ
দদ্যাৎ তত্রাগ্নিচূর্ণকং।
নিবেশয়েৎ তু দণ্ডেন
নালমূলে যথা দৃঢ়ম্॥ ২১০
ততস্তু গোলকং দদ্যাৎ
ততঃ কর্ণেঽগ্নিচূর্ণকং।
কর্ণচূর্ণাগ্নিদানেন গোলং
লক্ষ্যে নিপাতয়েৎ॥ ২১১

৪অ—৭ম প্রকরণ।

যোদ্ধৃগণ প্রথমে নালাস্ত্র পরিষ্কার করিবে, পরে তন্মধ্যে অগ্নিচূর্ণ দান করিয়া শলাকাদ্বারা দৃঢ়রূপে আঘাত করিয়া উক্ত অগ্নিচূর্ণকে বসাইবে। পরে উহার মধ্যে গোলা ও কর্ণে অগ্নিচূর্ণ দিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবে, তাহাতেই গোলা যাইয়া লক্ষ্যে পড়িবে।

সুতরাং ইহা একালের উন্নত যুগের পাশ্চাত্য কামানবন্দুক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। রামায়ণে বিবৃত রহিয়াছে যে—

ততো নালীকনারাচৈ
স্তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ বিকর্ণিভিঃ।
ভীমমার্ত্তস্বরং চক্রু
শ্ছিদ্যমানা নিশাচরাঃ॥ ২৫—২৫অ

অরণ্যকাণ্ড।

অনন্তর রামচন্দ্র নালীক, নারাচ, তীক্ষ্ণশর বিকর্ণিপ্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসগণকে ছেদন করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

আগামীতে সমাপ্য।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

——:o:——

ছেলেবেলা হইতে মনে বড় সাধ ছিল যে বিদেশে যাইয়া কোনরূপ জিনিষ প্রস্তুত করিতে শিখিয়া আসিব। কতদূর যে তাহা সম্ভব হইবে সে বিষয়ে তখন বিশেষ সন্দেহ ছিল। যাহা হউক, অবশেষে স্থির হইল যে এমেরিকায় যাইয়া চামড়া প্রস্তুত করিতে শিখিয়া আসিব। তাহার পর ১৯০৮ সালে "ডনেরা" Dunera নামক ষ্টীমারে এখান হইতে বিলাতের

(London) জন্য যাত্রা করি। বাড়ী ছাড়িয়া অতদূর এবং এতদিনের জন্য যখন যাওয়া যায় তখন মনের অবস্থা যে কিরূপ হয় তাহা আপনারা সকলে সহজেই অনুভব করিতে পারেন। যাইবার পূর্ব্বদিন বৈকালে বাক্স (Trunk), ব্যাগ, জাহাজের ডেকের উপর বসিবার চৌকি (Deck chair ইত্যাদি জিনিষগুলি জাহাজে রাখিয়া আসিলাম। তাহার পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া পোষাক পরিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে সকলের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করা হইল। চাঁদপাল ঘাটে আমাদের সকলকে জাহাজে লইয়া যাইবার জন্য একখানি ছোট ষ্টীমার ছিল। প্রথমে ডাক্তারে আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিল। তাহার পর যাঁহারা আমাদিগকে জাহাজে উঠাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া বড় জাহাজে উঠাইয়া দিবার জন্য ষ্টীমার ছাড়িল। বেলা যখন ৯॥০ টা তখন জাহাজে উঠিলাম। আমাদের কেবিনে জিনিষ গুছাইয়া রাখিয়া ডেকের উপর যাইলাম। বেলা যখন প্রায় ১১ টা তখন জাহাজ ছাড়িয়া দিল; আমি ডেকের উপর দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। চিরপরিচিত স্থানগুলি ক্রমশঃ চোখের সাম্‌নে থেকে লুকাইয়া পড়িতে লাগিল। যতক্ষণ অবধি সেগুলিন দেখা গেল ততক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর নিজের কেদারা (Deck chair) খানিতে আসিয়া বসিলাম। ক্রমশঃ ১২ টা বাজিল এবং সেই সঙ্গে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা পড়িল। সমস্ত দিনের আহারের তালিকা পরে দেওয়া যাইবে। আহারের পর আবার ডেকের উপর আসিয়া বসা গেল। সে সময় সকলেই নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন; সেই জন্য কাহারও অপরের সহিত কথা কহিবার ইচ্ছা ছিল না। ক্রমশঃ দিন শেষ হইয়া আসিল। বেলা ৫ টার সময় আবার খাইবার ঘণ্টা পড়িল। আহারের পর আবার ডেকের উপর আসিলাম। সন্ধ্যার সময় ক্যাবিনে যাইয়া দেখি যে ভয়ানক গরম। তখন আমাদের ক্যাবিনে যে ছোকরা চাকরটি (Cabin boy) ছিল তাহাকে জাহাজের ডেকের উপর বিছানা আনিবার জন্য বলিলাম। রাত্রি যখন ৯॥০ টা তখন ক্যাবিনে যাইয়া পোষাক বদলাইয়া রাত্রের পোষাক (Sleeping Suit) পরিয়া উপরে ডেকে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রে বেশ্ সুনিদ্রা হইল। ভোর হইলে যখন বিছানা হইতে উঠিতে চেষ্টা করিলাম তখন দেখি মাথা ভয়ানক ঘুরিতেছে এবং গা-বমি করিতেছে। বুঝিলাম সমুদ্রের অসুখ (Sea sickness) হইয়াছে। কোন রকম করিয়া ক্যাবিনে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমার সৌভাগ্যবশতঃ এইরূপ অসুস্থ অবস্থা ৪। ৫ ঘণ্টার বেশী ছিল না। জাহাজ অল্প অল্প দুলিতে থাকে বলিয়াই এইরূপ অসুখ হয়। ক্রমশঃ যখন দোলাটা অভ্যস্ত হইয়া যায় তখন আর কোন কষ্ট হয় না। কাহারও ৪। ৫ দিন এই অসুখ থাকে। কাহাকেও আবার ১০। ১৫ দিন অবধি এই অসুখে ভুগিতে শোনা যায়। এখন আহারের সম্বন্ধে কিছু বলি। ভোর ৬ টার সময় এক পেয়ালা চা এবং দুই খণ্ড পাঁউরুটী মাখন দেওয়া হয়। তাহার পর ৮॥০ টার সময় ছোট হাজরী (Breakfast) হয়। তাহাতে মাছ ভাজা,

ডিম, মাংস, আলুসিদ্ধ ভাত, রুটী, মাখন ও চা দেওয়া হয়। তাহার পর বেলা ১২ টার সময় সুপ, মাংস (তিন রকম), আলু ও কপী সিদ্ধ ভাত, রুটি, পুডিং, কেক্ ও ফল দেওয়া হয়। আবার ৫৷৷০টার সময় রুটী, মাংস জেলী, চা ও মিষ্ট রুটী (Bun)। তাহার পর রাত্রি ৮৷৷০টার সময় রুটী, মাখন ও পনীর (Cheese)। খাবার খুব যথেষ্টই দেওয়া হয়, কিন্তু এইরূপ খাদ্যে অভ্যস্ত না থাকায় গোড়ায় কষ্ট বলিয়া মনে হয়। ক্রমশঃ এইরূপ আহার অভ্যাস হইয়া যায়।

চারি দিন পরে আমাদের জাহাজ মাদ্রাজ (Madras সহরে আসিয়া পৌঁছিল। অনেক মাল লইতে হয় বলিয়া জাহাজ দুই দিন সেখানে থাকে। সে সময় আমি নামিয়া আমার একটি বন্ধুর মাদ্রাজে যখন Tanning অর্থাৎ চামড়ার কাজ শিখিতে যাই তখন তাঁহার সহিত আলাপ হয়) নিকটে যাইয়া এই চার দিন যে দেশী খাবার খাইতে পাই নাই তাহার শোধ লইলাম। অর্থাৎ দুই দিন আমাদের চির-অভ্যস্ত ডাল ভাত খাওয়া গেল। দুই দিন বাদে জাহাজ আবার যাত্রা করিল। চারিদিকে সেই নীল সমুদ্র এবং তাহার মধ্যে আমাদের জাহাজখানি চলিয়াছে; সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এই জগৎ যে কত বড় এবং তাহার তুলনায় আমরা যে কত ছোট তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সন্ধ্যার পর যখন মাথার উপর অগণ্য তারকারাশি আর নিচে সেই অপার নীলজল দেখা যায় তখন চোখের জল না ফেলিয়া থাকা যায় না। তাহার পর আকাশে চাঁদ উঠে, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। কোথাও কোন কোলাহল নাই, তাহার মধ্যে জাহাজখানি চলিয়াছে এবং নীল জলে শত সহস্র চাঁদ খেলা করিয়া যেন জাহাজকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। তখন মনে হয় ভগবানের রাজ্যে যেন সুন্দর ভিন্ন আর কিছু নাই। যাহা হউক, আমাদের জাহাজ ৪ দিন বাদে লঙ্কাদ্বীপে (Ceylon) আসিয়া পৌঁছিল। লঙ্কাদ্বীপকে "কলম্বো" বলিয়া ডাকা হয়। কলম্বো সহরটি দেখিতে বড় সুন্দর। লঙ্কাদ্বীপ রাক্ষসের রাজ্য বলিয়া শুনা গিয়াছে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে রাক্ষসরা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর স্থানে থাকিত। এখানে "ক্যানডী" (Kandy) বলিয়া একটি স্থান আছে। তাহাতে সরোবর গুলিন এবং তাহার চতুর্দ্দিক তাল ও খেজুর গাছে বেষ্টিত। গাছের উপর কত সুন্দর পাখী গান করিতেছে। "কলম্বো" সহরের লোক-দিগের ভাষা একেবারেই অবোধ্য। জাহাজ সেখানে এক দিন থাকিয়া আবার যাত্রা করিল। ৮ দিন ক্রমাগত রাত দিন চলিয়া "এডেনে" (Aden) আসিয়া পৌঁছিল। "এডেন" সহরটি চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের দ্বারা বেষ্টিত। দূর হইতে যখন "এডেন" সহর দেখা যায় তখন মনে হয় ঠিক যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে একটি পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এখানে পাহাড়ের দৃশ্যটি বড় সুন্দর। এখানকার লোকদিগের মধ্যে কতকগুলিন খুব কাল এবং কতকগুলিন খুব সুন্দর। এখানে অষ্ট্রীচ পাখীর (Ostrich) পালকের কারবার খুব প্রচলিত। এখানকার খাইবার জল চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের দ্বারা বেষ্টিত টেঙ্কে (Tank) রাখা হয়। জাহাজ কিনারা হইতে দূরে নোঙ্গর করা হয়। জাহাজ

হইতে বোটে করিয়া সহরে যাইতে হয়। বন্দরের (Port) সামনেই কয়েকটি বড় বড় দোকান এবং একটি বড় হোটেল আছে। সহরের ভিতর (Interior) আদৌ পরিষ্কার নয়। জাহাজ সেখানে ৮ ঘণ্টা থাকিয়া ছাড়িয়া দিল। ক্রমশঃ জাহাজ লোহিত সমুদ্রে (Red Sea) আসিয়া পৌঁছিল। এখানটা খুব গরম। একপার্শ্বে আরবদেশের মরুভূমি, অপর পার্শ্বে আফ্রিকার মরুভূমি। এ সময় জাহাজে দুই প্রহরের খাবারের সঙ্গে "আইস ক্রীম" (Ice Cream) দেওয়া হয়। ৫ দিন জাহাজ চলিয়া "সুয়েজ" (Suez) এ আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে জাহাজ ৩।৪ ঘণ্টার বেশী দাঁড়ায় না। তাহার পর জাহাজ "সুয়েজ কেনালের" (Suez Canal) ভিতর আসিয়া পৌঁছিল। কেনালটি চওড়ায় এতই কম যে মনে হয় লাফাইয়া পার হওয়া যায়। ইহার মাঝে মাঝে ষ্টেশন (Station) আছে। অর্থাৎ মনে করুন একখানি জাহাজ আসিতেছে এবং একখানি জাহাজ যাইতেছে। এ অবস্থায় একখানি জাহাজকে ষ্টেশনে আটক্ করিয়া রাখা হয় এবং আর একখানি জাহাজ যখন ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছায় তখন তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পাছে রাস্তার মাঝে আবার অন্য জাহাজ আসিয়া পড়ে সেই জন্য ষ্টেশন হইতে জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে পরবর্ত্তী ষ্টেশনে খবর দেওয়া হয় এবং খবর লওয়া হয়। এই "কেনালটি" একজন ফরাসীদেশীয় ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা তৈয়ারী করা হয়। তাঁহার নাম "ফারডিনাণ্ড ডী লেসেপ্স (Ferdinand de Lesseps)। ইঁহার একটি প্রতিমূর্ত্তি কেনালের গোড়ায় দাঁড় করান আছে কেনালের ভিতর জাহাজ ঘণ্টায় পাঁচ মাইল হিসাবে যায়। অন্য সময় জাহাজ আন্দাজ ১১ মাইল হিসাবে যায়।

"সুয়েজ কেনাল" পার হইয়া জাহাজ "পোরট্ সেড" "Port Said" আসিয়া পৌঁছিল। ইউরোপীয় দেশগুলির কতকটা আভাস এই "পোরট্ সেড" হইতে পাওয়া যায়। এই স্থানে বেশীভাগ ফরাসী এবং আরব দেশের লোকেরই বসতি। এখানে জাহাজ প্রায় দশ ঘণ্টা কাল অবস্থিতি করে। তাহার পর জাহাজ সাত দিন যাইয়া "জেনোয়া" (Genoa) সহরে উপস্থিত হয়। "জেনোয়া" সহরটি ইটালীর অন্তর্গত। এ সহরটি দেখিতে খুব সুন্দর। দেশটি পাহাড়ে পরিপূর্ণ। পাহাড়ের উপর স্তরে স্তরে বাড়ীগুলি উঠিয়াছে এবং সন্ধ্যাকালে যখন সেই সকল বাড়ীতে আলো দেওয়া হয় তখন মনে হয় সহস্র সহস্র নক্ষত্র পাহাড়ের গায়ে ফুটিয়া রহিয়াছে। জেনোয়া সহরের গোরস্থানটি একটি দেখিবার জিনিষ। ইটালী চিরকাল সুন্দর ছবি এবং পাথরের পুঁতুল তৈয়ারী করিবার জন্য বিখ্যাত। এই গোরস্থান সেই সকল পাথরের পুঁতুলের দ্বারা পরিপূর্ণ। পুঁতুলের কতকগুলি মানুষপ্রমাণ উঁচু। কোন কোনটি ছোট আকৃতির। সে গুলি এমনি সুন্দরভাবে তৈয়ারী যে দেখিলে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। শুনিয়াছি জগতের মধ্যে এইরূপ আর কোথাও নাই। তাহা ছাড়া রাজবাটী (King's Palace), পাহাড়ের উপর বেড়াইবার জন্য বাগান (Public Garden) ইত্যাদি অনেক সুন্দর জিনিষ দেখিবার আছে। জাহাজ সেখানে দুই দিন থাকে, কিন্তু সে দুই দিনে মনে হয় কিছুই দেখা হইল না।

তাহার পর জাহাজ প্রায় দেড় দিন চলিয়া "মারসেল" নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। "মারসেল" সহরটি ফরাসীদেশের অন্তর্গত। এখানকার লোকদের সহিত কথা কওয়া বড় মুস্কিল। তাহারা অনেকেই ফরাসী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানে না। এখানে দোকানগুলি সুন্দরভাবে সাজান এবং রাস্তায় লোকের ভিড়। এখানে জাহাজ প্রায় তিন দিন থাকে। তাহার পর জাহাজ সাত দিন চলিয়া Plymouth এ আসিল। যখন জিব্রল্টারের (Gibraltar) ভিতর যায় তখন দেখিতে বেশ্। দুই ধারে পাহাড় যেন দুইটা দরজার মতন দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মধ্য দিয়া জাহাজ খানি যেন কোন নূতন দেশে যাইতেছে এইরূপ মনে হয়। Plymouth এ জাহাজ চারি ঘণ্টা থাকিয়া লণ্ডন সহরের দিকে রওনা হয়। তাহার পর দিন লণ্ডন (London) যাইয়া পৌছায়। লণ্ডন ডকের ভিতর যখন জাহাজ প্রবেশ করে তখন দেখা যায় যে দুই ধারে অনেক লোক তাহাদের আত্মীয় বন্ধুদিগকে লইবার জন্য আসিয়াছে। সে সময়কার ভাব দেখিলে চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকা যায় না। জাহাজের আরোহীদের মধ্যে কাহারও চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে, আবার কাহারও মুখে আনন্দের হাঁসি ফুটিয়া পড়িতেছে। যাঁহারা তাঁহাদের আপনার প্রাণের জিনিষকে ভারতবর্ষে চিরদিনের মতন রাখিয়া দেশে ফিরিতেছেন তাঁহাদের চক্ষু শোকাশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছে। তাঁহারা যেন কত অপরাধ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন, যেন লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিতেছেন না। আবার যাঁহারা অনেক দিনের পর কয়েক মাসের জন্য আত্মীয় স্বজনের নিকট থাকিবার জন্য যাইতেছেন তাঁহাদের চক্ষে আনন্দাশ্রু পড়িতেছে। এই দুই অশ্রুতে অনেক প্রভেদ। একটা হৃদয়ের গভীর বেদনা প্রকাশ করিতেছে। আর একটা হৃদয়ের নিভৃতস্থানে যে ভালবাসা, স্নেহ, মমতা আছে তাহা ফুটাইয়া তুলিতেছে। যাহা হউক, আমি তখন নামিবার জন্য সমস্ত প্রস্তুত করিয়া জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিলাম। ক্রমশঃ বেলা প্রায় ১ টার সময় জাহাজ এলবারট্ (Albert Dock) ডকে যাইয়া লাগিল। সেই প্রথম লণ্ডন সহরে পদার্পণ।

ক্রমশঃ।

প্রয়াগরাজ।

বুধনন্দন রাজর্ষি পুরুরবা যখন তাঁহার এই অমরাবতীকল্প পুরীর মণিহর্ম্ম্য পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া অনন্তমিত নবীন হিমাংশুর সুস্নিগ্ধ কিরণজালে অমানিশার ঘোর অন্ধকারেও ইহাকে দিব্য জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত করিতেন, এবং চন্দ্রিকাপায়ী চকোরগণ যখন পালে পালে আসিয়া মহানন্দে তাঁহার প্রমোদ-বন কলরবে পূর্ণ করিত, তখন এই প্রতিষ্ঠান নগরের শোভায় সপ্তভূবন মুগ্ধ হইত। ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় স্বর্গচ্যুত দেববালা উর্ব্বশী যখন পুরুরবার অঙ্কশায়িনী হইয়া এই প্রতিষ্ঠান নগরে স্বর্গীয় বিলাস বিনোদের পরাকাষ্ঠা করিয়াছিলেন, আবার প্রিয়াবিয়োগ-ক্লিষ্ট প্রেমোন্মত্ত রাজর্ষি যখন দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ সেই প্রিয়ার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তখন না জানি এই প্রয়াগে প্রবৃত্তির কি চূড়ান্ত লীলাই অভিনীত হইয়াছিল। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির চরম লীলা স্থল, প্রয়াগের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে এজগতে প্রচারিত হইবে বলিয়াই বুঝি রাজর্ষি পুরুরবা এই পুণ্যধাম প্রয়াগে স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্য ও সুখ উপভোগ করিয়া ত্রিদিববাসিগণেরও ঈর্ষার বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি পুরুরবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অচিন্ত্য প্রভাব সম্পন্ন প্রয়াগ মাহাত্ম্যে এক দিন এই ধরাধামই স্বর্গধামে পরিণত হইয়াছিল।

আবার যখন নির্ধূম পাবক সদৃশ সুদীপ্তকায়, বহুশিষ্যগণে পরিবৃত মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ তাঁহার সুরম্য পবিত্র আশ্রমে মহাকঠোর তপশ্চর্য্যায় রত ছিলেন, এবং ধর্ম্মজগতের অশ্রুতপূর্ব্ব মহান সত্যগুলি জগতে প্রচার করিয়া জীবের পরম কল্যাণ সাধনে তৎপর ছিলেন যখন জটাবল্কলধারী সানুজ শ্রীরাম জানকী সদ্যঃপ্রাপ্ত সুবিশাল রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবরের বিচিত্র পর্ণকুটীরে বন্য ফল-মূলাশী হইয়া পরম সুখে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, তখন না জানি, এই প্রয়াগধাম কি প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছিল। না জানি, নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী মনীষিগণ তখন এই প্রয়াগে কি চরম শান্তিই লাভ করিতেন। আবার যখন রামানুজ ভরত, সপরিজন অযোধ্যাবাসিগণকে লইয়া অপ্রতিমবীর্য্য মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, সত্যসঙ্কল্প মহর্ষির ইচ্ছায় যখন নিমেষের ভিতর এই পবিত্র ভূমিতে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের অপার ঐশ্বর্য্যরাশির আবির্ভাব হইয়াছিল এবং মুনিবরের যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া যখন অযোধ্যাবাসিগণকে অতিমাত্র বিস্মিত হইতে হইয়াছিল, তখন এই প্রয়াগ মাহাত্ম্যের বিচিত্রতা সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

কান্যকুব্জাধিপতি শিলাদিত্যরাজ হর্ষবর্দ্ধন "মহামোক্ষ" নামক পাঞ্চবার্ষিকী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যখন তাঁহার পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত বিপুল ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার কেবল জন

সাধারণের অভাব মোচনার্থে এই পুণ্যধাম প্রয়াগে নিঃশেষিত করিতেন, তখন জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমানভাবে এই অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন প্রয়াগ মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইতে হইত। পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধ জগতেও প্রয়াগ মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাহা বিশেষরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিল। শিলাদিত্যরাজ হর্ষবদ্ধন তাঁহার সুবিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে তীর্থরাজ প্রয়াগকেই তাঁহার সেই অলৌকিক মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের মধ্যে তিনি যে কয়েকবার সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা এই প্রয়াগেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক, মহাত্মা হিয়ান্ সাং শিলাদিত্যরাজের বিশেষ অনুরোধে এক বৎসর স্বয়ং এই প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া সেই অদ্ভুত মহাযজ্ঞ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার আমূল বিবরণ তিনি স্বীয় অমূল্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই আজ আমরা সকলে সেই অপূর্ব্ব মহাযজ্ঞের কথা জানিতে পারিতেছি। শিলাদিত্যরাজ হর্ষবর্দ্ধন, যেরূপ মুক্ত হস্তে তাঁহার অপরিমিত ধনরাশি এই প্রয়াগে দান করিতেন, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। সেরূপ অসাধারণ ও অলৌকিক দান বোধ করি ভারতের এই মহাতীর্থ প্রয়াগেই সম্ভবে। মহাত্মা হিয়ান্ সাং লিখিয়াছেন যে, কেবল সমর সংক্রান্ত অস্ত্র শস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ভিন্ন রাজভাণ্ডারে আর কোনও ঐশ্বর্য্যই অবশিষ্ট থাকিত না, এমন কি, রাজকীয় পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত জনসাধারণের হিতার্থে অর্পিত হইত। কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন ৫।৬ বার এই প্রয়াগেই সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় অসীম দানশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ধন্য রাজা হর্ষবদ্ধন! কেবল অসংখ্য বাস্ত মনুষ্যের কষ্ট নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে হৃষ্ট করিবার জন্যই বুঝি তুমি জন্মিয়াছিলে এবং এই লুপ্ত গৌরব ও হতমান ভারতের অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার জন্যই বুঝি সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের শাসন দণ্ডভার লইয়া জগতে তাহার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ দেখাইয়াছিলে!

মহাত্মা হিয়ান্ সাং-এর অলৌকিক ত্যাগ, অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে আজ সমগ্র সভ্যজগৎ ভারতের সেই অদ্ভুত মহাযজ্ঞের কথা জানিতে পারিয়া চমৎকৃত হইয়া রহিয়াছে। নিতান্ত স্বার্থপর পাশ্চাত্য গৌরবাভিমানী ব্যক্তি না হইলে আর ভারতের এই গৌরবদৃপ্ত সত্য ঘটনার অপলাপ করিতে কেহ সাহসী হইবেন না। এইরূপ কত শত হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজা মহারাজাগণের বিশ্বজিৎ যজ্ঞে যে এই অলৌকিক সুমহান্ পবিত্রক্ষেত্র জগতে আপন মহিমায় অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এই ঘোর দৈন্যদশাপ্রাপ্ত ভারত এখনও প্রয়াগের সেই অচিন্ত্যদান মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখনও এই প্রয়াগে প্রতিদিন যে, কত শত, সহস্র সহস্র দান ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার তুলনা আর কোথাও আছে কিনা বলিতে পারি না। প্রয়াগের দান মাহাত্ম্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। গঙ্গা-যমুনারূপ দুই মহাশক্তির সম্মিলন হইতেই

প্রয়াগের এই অলৌকিকত্ব ও বিচিত্রতা এবং ইহাই এই সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রের অসামান্য প্রভাব সম্পন্ন হওয়ার একমাত্র কারণ।

সমগ্র ভারতের আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা দেখিব যে, প্রকৃতই এই প্রয়াগ মাহাত্ম্যের বিচিত্রতা ও পবিত্রতা কিরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সুদীর্ঘ কাল যাবৎ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুন্ন থাকিয়া যখন তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল, তখন বৈদিকধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় সাধন করিয়া সর্ব্বাগ্রেই যে মহাপুরুষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সুবিখ্যাত কুমারিল ভট্ট, স্বকার্য্য সাধন করিয়া অন্তে এই সুমহৎ পবিত্রক্ষেত্রে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম্মুখে তুষানল করিয়া স্বদেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বহু বৌদ্ধ বিনাশ-জনিত মনস্তাপে ভট্ট অবশেষে এই প্রয়াগ ধামে আসিয়াই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। শত দেশ থাকিতে তিনি কি কেবল অপূর্ব্ব গঙ্গা যমুনাসঙ্গম মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়াই এইখানে আসিয়া দেহত্যাগ করেন নাই? মূর্ত্তিমান্ কর্ম্মকাণ্ড ভট্টের শেষ, মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানকাণ্ড ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রথম প্রকাশ, যেন এই প্রয়াগধামে হইয়াছিল। এই পবিত্র ধাম হইতেই ভট্টের পরামর্শানুসারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া প্রথমেই তাঁহার প্রধান শিষ্য, কর্ম্মিশ্রেষ্ঠ মণ্ডন মিশ্রের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুণরুদ্ধার; বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের পুণরুদ্ধার কর্ত্তা কুমারিল ভট্ট, যেমন একদিন এই প্রয়াগেই সাক্ষাৎ জ্ঞানাগ্নি স্বরূপ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম্মুখে লয় পাইয়া পরানিবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার প্রধান শিষ্য প্রবল প্রবৃত্তি পরায়ণ, মণ্ডন মিশ্রের সমুদয় যুক্তিজালও সেই জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়াছিল। যে জ্ঞানরূপ মহাসূর্য্যের দিব্যালোকে একদিন ভারতের ঘোর অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছিল, উষাগমের নিশাপগমের ন্যায় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের উদয়ে একদিন শত শত ভ্রান্তমত নিরস্ত হইয়া এই সুবিশাল ভারতাকাশ চির-শান্তিপ্রদ অনন্ত জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়াছিল, সেই মহাসূর্য্যের শুভ অরুণোদয় বুঝি এই মহাক্ষেত্রেই হইয়াছিল। কুমারিল ভট্টের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মকাণ্ডের শেষ, এবং জ্ঞান-কাণ্ডের আরম্ভ হইল বলিতে হইবে। ভারতের এই মহা গৌরবাস্পদ স্মরনীয় ঘটনাটির সহিত যেন গঙ্গাযমুনা সঙ্গম ক্ষেত্রের কি এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রবৃত্তির হেতুভূতা যমুনা, যেমন আপন অপূর্ব্ব লীলা সমাপন করিয়া অন্তে নিবৃত্তিরূপা, শান্তবী ভাগীরথীর গর্ভে চিরবিলীনা হইয়া রহিয়াছেন; সেইরূপ প্রবৃত্তির হেতুভূত কর্ম্মকাণ্ডও যেন এই খানেই অগাধজ্ঞানরূপ মহাসমুদ্রে লয় পাইল।

প্রয়াগ মাহাত্ম্য স্মরণ করিতে করিতে আমরা দেখিতে পাই যে, এই পরম মহাক্ষেত্রে উপ্তবীজ হইতেই অচিরকাল মধ্যে উৎপন্ন মহাবেদান্ত মহীরুহে ভারত আচ্ছন্ন হইয়াছিল। যে সুবিশাল অনন্ত বিস্তীর্ণ মহাবৃক্ষের সুশীতল ছায়া ত্রিতাদগ্ধ জীবের একমাত্র আশ্রয়; যে বেদান্ত ডিণ্ডিমের মহাবিজয় নির্ঘোষে আজ সমগ্র জগৎ প্রতিধ্বনিত, পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিলে মনে হয়, বুঝি তাহা প্রথমেই এই প্রয়াগে বাজিয়া উঠিয়াছিল।

বৌদ্ধারি কুমারিল ভট্ট, যেমন আত্মঅপরাধ স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইয়াছে মনে করিয়াই এই মহা-বিচিত্র তীর্থে আসিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই মহাসঙ্গম হিন্দু মাত্রেরই মৃত্যু বাঞ্ছনীয় ছিল। যে স্থানের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করিতে করিতে প্রাচীন ভারতের মহা গৌরবাস্পদ, অগণ্য, অদ্ভুত ঘটনাবলী আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়; সেই অপার মহিমাময় সুপবিত্র ক্ষেত্রে মৃত্যুকামনা করিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ প্রকৃত হৃদয়-বত্তারই পরিচয় দিয়াছিলেন। বহু প্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহা দৃষ্ট হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই প্রয়াগে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করার প্রথা এদেশে প্রচলিত ছিল। স্বেচ্ছায় মৃতব্যক্তিগণের বিপুল অস্থিরাশি, হিয়ান্ সাং স্বয়ং এইখানে দেখিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুর এই আত্মবিসর্জ্জন ব্যাপারকে অনেকেই বর্ব্বরোচিত কার্য্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহারা হিন্দুর এই অমানুষিক আচরণে যে, কি নিগূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না, বা তাহা জানিবার জন্য কোন চেষ্টাও করেন না। শাস্ত্রোক্ত প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে দেখিতে পাওয়া যায় যথা,—"যত্র স্নাত্বা দিবম্ যান্তি যে মৃতাস্তেহপুনর্ভবা" এইরূপ শত শত শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মোক্ষধাম প্রয়াগে প্রাণত্যাগ করিতে প্রাচীন হিন্দুগণ কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না।

যে আর্য্যশাস্ত্রের প্রতি পত্রে আত্মঘাতীর মহা নিরয়গামী হইবার কথা পরিদৃষ্ট হয়, সেই শাস্ত্রই আবার স্থানবিশেষে আত্মবিসর্জ্জন জীবের সদ্গতি বিধায়ক বলিয়া সমর্থিত হইয়াছে। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থবোধক শাস্ত্রীয় বিধি-বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না বলিয়াই আত্মজ্ঞান-প্রবণ প্রাচীন আর্য্যজাতির আচরণে অনেকেই দোষদৃষ্টি করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য শিক্ষালোকপ্রাপ্ত জনসাধারণের ধারণা এই যে, বিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হিন্দুর কতকগুলি বর্ব্বরোচিত আচার ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় সভ্যতালোকে ভারতের চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে এবং আমাদের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং খৃষ্টিয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের পরকীয় ধর্ম্মে অনভিজ্ঞতা এবং তাহাতে অযথা দোষারোপ করিবার দুরাগ্রাহে আজকাল আর্য্য সন্তানগণের মধ্যেও অনেকে মনে করেন যে, বঙ্গরমণীগণের প্রাণ-পুত্তলিকাসম শিশুসন্তানগণকে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে বিসর্জ্জন; ভক্ত হিন্দুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথচক্রতলে নিষ্পেষিত হওন, সতীর পতির সহিত এক চিতায় শয়ন এবং তীর্থবিশেষে দেহত্যাগ প্রভৃতি প্রথাগুলি নিতান্ত নৃশংস ও বর্ব্বরজনোচিত কার্য্য। বিদেশীয় ও বিজাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গগুণে স্বজাতীয় আচার ব্যবহার ও সংস্কার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও পরকীয় আচার ব্যবহারাদির অভিজ্ঞতায় পরিপক্কতা লাভ করিয়া যাঁহারা স্বজাতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেন, তাঁহারা যে কতদূর আত্মঘাতী হন, তাহা তাঁহারা আদৌ বুঝিতে পারেন না। জন্ম, মৃত্যু, পাপ, পুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিতে করিতে যে প্রাচীন আর্য্য মনীষিগণ প্রাণপণ যত্ন করিয়া তাহার চরম মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই যে আত্মহত্যারূপ মহাপাপের প্রশ্রয়দাতা হইবেন তাহা

কখনই সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সকল অনুষ্ঠানের মূলই যে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য সকলের নাই বলিয়াই এইরূপ ভ্রান্তি হইয়া থাকে। পরকীয় রাজ্যাধিকার এবং স্বরাজ্য সংরক্ষণ প্রয়াসে যে সকল মহাপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী মহারথিগণ, অসংখ্য নরশোণিতে এই ধরা কলুষিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই জাতীয় জীবন দান করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু শান্তিপ্রিয় প্রাচীন হিন্দুগণ ধর্ম্মের জন্য স্ব স্ব পুত্র, কলত্র, বিত্ত এবং অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া আর্য্যজাতির যে অক্ষয় জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাহার অক্ষুণ্ণ প্রভাব আজিও সমগ্র সভ্যজগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে। আমরা যতই দুর্ব্বল, যতই নিঃস্ব ও পরাধীন হই না কেন, আমরা ইহা অকপট-চিত্তে বলিতে পারি যে, সেই অসামান্য প্রভাবসম্পন্ন আত্মজ্ঞানী আর্য্য-মহর্ষিগণের পদত্ত অমৃতের আমরা অধিকারী। কোন প্রাচীন সাম্রাজ্যলিপ্সু জাতির ভাগ্যে এ সুযোগ ঘটে নাই। শত সহস্র কৌশল ও অসিচালনায় যে সকল প্রাচীন সুসভ্যজাতি, পৃথিবীর মধ্যে অজেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের অস্তিত্ব আজ অনন্ত কালসমুদ্রে বিলুপ্ত। অচিন্ত্য-মহিমামণ্ডিত আর্য্যমহর্ষিগণের অনুকম্পায় এবং তাঁহাদের অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানের বলে, সুদীর্ঘকালাবধি লাঞ্ছিত ও পরপদানত হইয়া আমরা আজিও জীবিত রহিয়াছি। আমাদের জাতীয় জীবনের মর্ম্মস্থান আজিও কেহ স্পর্শ করিতে পারেন নাই

বঙ্গরমণীগণ যে, কি ঐশ্বরিক মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাণাধিক শিশুসন্তানগণকে মোক্ষদায়িনী গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতেন, কি আধ্যাত্মিক ভাবে তদ্গত চিত্ত হইয়া যে হিন্দুগণ বিশ্বম্ভরদেবের রথচক্রতলে নিষ্পেষিত হইয়া অবলীলাক্রমে আত্মবিসর্জ্জন করিতেন এবং কি অলৌকিক পাতিব্রত্য ধর্ম্মের প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া আর্য্য সতীলক্ষ্মীগণ মৃত পতির সহিত একচিতায় শয়ন করিয়া পতি-সহগামিনী হইতেন, তাহা নির্ণয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি জানি, এক বৎসর ৺গঙ্গোত্রির পথে জনৈক সাধু ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ দর্শনে বিহ্বল হইয়া এক লম্ফেই সেই উদ্দাম স্রোতে নিপতিত হইয়া ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সাধুর অন্তঃকরণে যে কি স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে? স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়া সেই সাধুর দুর্গতি হইল বা সদ্গতি হইল, তাহাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিবে? তবে আমরা ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যদি তিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারেই পতিত পাবনী ভাগীরথীতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রকৃত হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, তাঁহার মৃত্যুতে মৃত্যুই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তিনি ক্ষণভঙ্গুর দেহের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ যে, অতি সহজে মরিয়াই যে অমর হইতে জানেন, জগতে এই মহাসত্য প্রচার করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে ভারতে প্রায়োপবেশন ও কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি করিয়া দেহপাত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বেশীদিনের কথা নহে, শ্রীকেদার শৈলোপরিস্থিত মহাপথে যে কত সাধু দেহত্যাগ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। পার্ব্বত্য প্রদেশে এমন অনেক "ভৃগুপতন"

আছে, যে সকল স্থান হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। এই ভারতবর্ষময় অনেক সাধুর "জীবৎ সমাধি" স্তম্ভ সমুদয়, আজও ভারতের স্বেচ্ছামৃত্যুর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এমন কত সাধু মহাপুরুষ যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মৃত্তিকাগর্ভে জীবন্ত চির-সমাধিস্থ হইতেন, তাহা বলা যায় না। এইরূপে কোনও উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর ভৌতিক দেহের মমতা ত্যাগ করার স্বভাব হিন্দুর অনেক দিন হইতেই আছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কঠোর শাসন সত্বেও ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুর এই স্বেচ্ছামৃত্যু লোপ পায় নাই। এখনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ অনাহারে প্রায়োপবেশন করিয়া দেহত্যাগ করেন। পতিব্রতা রমণীকে এখনও কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারেন না। সতী স্বীয় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কর্তৃক গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াও পতির বিশুদ্ধ মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পতি-সহগামিনী হন।

আর্য্যজাতির এই আবহমান কালাচরিত প্রথার মূল উৎপত্তি স্থান যে কোথায়, তাহা যদি কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে আর ইহা বলিতে পারিবেন না যে, হিন্দুর ইচ্ছামৃত্যু বর্ব্বরোচিত কার্য্য। অবশ্য যাহারা কোন উচ্চভাব বা আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইয়া, কেবল কোন সাংসারিক কষ্ট বা মনোবেদনায় দেহপাত করে তাহারা আত্মহা বলিয়া আর্য্যসমাজে পিণ্ডোদকবর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

যে হিন্দু অতিথি সৎকারের জন্য প্রাণাধিক পুত্র সন্তানকে অম্লানবদনে স্বহস্তে বলি প্রদান করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন; যে নিঃস্ব হিন্দু গৃহস্থ একদিন সপরিবারে অতিথি সৎকার করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য অকাতরে সুদীর্ঘকাল যাবৎ অনশনে থাকিয়া মৃত্যু পণ করিতেন; সেই মৃত্যুঞ্জয়, নির্ভীক, হিন্দু সমাজ প্রচলিত সহমরণাদি আচরণগুলিতে যে কি অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব, কি জলন্ত বিশ্বাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং মৃত্যুতে নির্ভীকতা নিহিত আছে, তাহা আত্মজ্ঞান বিহীত ঐহিকসুখাসক্ত জনগণের কথনই বোধগম্য হইতে পারে না। মৃত্যু-ভয়-কাতর অজ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষে প্রকৃত হিন্দুর আচরণ সম্পূর্ণ বর্ব্বরোচিত কার্য্য বলিয়াই মনে হইবে। যে সকল আচরণের জন্য, হিন্দুকে তাঁহারা অতি অসভ্য ও বর্ব্বর বলিয়া মনে করেন, সেইগুলিই তাঁহার মহান্ চরিত্রের পরিচায়ক। প্রকৃত হিন্দুর চক্ষে নিঃশেষাঘ-বিলাসিনী ভাগীরথী মা গঙ্গা যে কি, তাহার মর্ম্ম অপর সাধারণে কি বুঝিবে? মহা মহাজ্ঞানা, ভক্ত, ভাবুক ও কবিগণ যে গঙ্গা মাহাত্ম্য শত মুখে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন. ঐহিক পারত্রিক সুখে অনাসক্তচিত্ত প্রাচীন ভারতীয় সুধীবৃন্দ. নগণ্য তুচ্ছ জীব শরীর ধারণ করিয়াও যে পুণ্য সলিলা ভাগীরথীর বিমলতটে নিবাস আকাঙ্ক্ষা করিতেন, যে গঙ্গাহিল্লোলের মধুময়ী বিপুল গীতি হিন্দুর হৃদয় তন্ত্রীতে আজিও বাজিয়া উঠে, যাঁহার দর্শন, স্পর্শন ও অবগাহনে, হিন্দু, পাপ, তাপ ও মোহ বিমুক্ত হন, অনার্য্য অহিন্দুগণের পক্ষে তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। যাঁহার মাহাত্ম্য কথায় প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র সমুদয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, শত বীণাঝঙ্কারিত মনোহারী

ভাষায় "শশ্বোরম্ভোময়ী মূর্ত্তি" বলিয়া মহাকবি কালিদাস যাঁহার দিব্য মহিমা জগতে প্রচার করিয়াছেন, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখে যাঁহার "ব্রহ্ম বারি" নাম শুনিয়াছি, এবং যাঁহার অনন্ত পুণ্যময় সলিলে হিন্দু আজন্ম মরিতে বাঞ্ছা করেন, সেই স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তী জাহ্নবী-কোলে প্রাচীন হিন্দুগণ যে কি ঐশ্বরিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া স্ব স্ব শিশু সন্তান-গণকে অর্পণ করিতেন, তাহা কি আধুনিক সভ্যতাভিমানী জড়বাদিগণ অমনি সহজে বুঝিতে সক্ষম হইবেন? আপন আপন ক্রোড় হইতে প্রাণপ্রিয় শিশু সন্তানগণকে মোক্ষ-দায়িনী মা গঙ্গার ক্রোড়ে দিয়া হিন্দু রমণিগণ শিশু পুত্রের ভাবী বিপদ আপদ হইতে নিশ্চিন্ত হইতেন। তাঁহারা দিব্য চক্ষে যেন মা গঙ্গার ক্রোড়ে অর্পিত শিশুপুত্রগণের চিন্ময় বপু দর্শন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেন এবং সেই জন্যই বুঝি তাঁহারা শোক মোহে আচ্ছন্ন হইতেন না। হিন্দু রমণিগণের অসীম ও অগাধ বিশ্বাসের পরিমাণ কে করিবে? পতিত-পাবনী ভাগীরথী মা গঙ্গাকে সামান্য নদী বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে হিন্দুর এরূপ অলৌকিক আত্মসমর্পণ বর্ব্বরোচিত কার্য্য বলিয়াই মনে হইবে, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুর চক্ষে "সর্ব্বতীর্থ-ময়ী গঙ্গামাহাত্ম্য" তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। এখনও "অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" বলিয়া প্রত্যহ কত শত সহস্র সহস্র হিন্দু যে মা গঙ্গার ক্রোড়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন, তাহা বলা যায় না।

স্ব স্ব অভীষ্ট দেবদেবীর অর্চ্চনায় এ সংসারে হিন্দুর অদেয় বস্তু কিছুই নাই। ভগবৎপ্রীত্যর্থে প্রাচীন হিন্দু নরনারিগণ যে অমানুষিক ত্যাগের জলন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা আর কোথাও নাই। অলৌকিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বলে হিন্দু রমণি-গণ যে সকল অদ্ভুত ও অমানুষিক মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আমাদিগকে স্তম্ভিত হইতে হয়। বঙ্গরমণীগণ আপন আপন শিশু সন্তানগণকে পূতসলিলা ভাগীরথীর গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হিন্দুর স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য আত্মত্যাগের যে চরম আদর্শ রাখিয়া গিয়া-ছেন, তাহা যে তাহাদের অপত্যস্নেহের অভাব বশতঃ নহে, ইহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। যদি প্রকৃতই তাঁহারা অপত্যস্নেহের অভাব-বশতঃ কেবল অজ্ঞানসম্ভূত কুসংস্কারের প্রভা-বেই নিতান্ত বর্ব্বরের ন্যায় পুত্রঘাতিনী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আর এই অল্প কালের মধ্যে সেই সকল কঠোরহৃদয়া বঙ্গরমণিগণ সুসভ্য সমাজের আদর্শস্থানীয়া ও দয়াধর্ম্ম ও স্নেহমমতার আধারস্বরূপ হইয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে সুখ ও শান্তি বিতরণ করিতে সমর্থ হইতেন না। অতি প্রাচীন সুসভ্য আর্য্য-সমাজপ্রচলিত আচার ব্যবহারের সম্যক পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কেবল ধর্ম্মের জন্য অসাধ্য সাধন করিতে আর্য্যগণ কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না। সন্তানের অপঘাত মৃত্যু হইবে ও স্বয়ং পুত্র-ঘাতিনী হইবেন মনে করিলে আর্য্যরমণিগণ কখনই সেরূপ স্বহস্তে নিজ শিশুগণের বধসাধন করিতে সক্ষম হইতেন না।

ভক্ত বিশ্বাসী হিন্দুর চক্ষে যে কি ভাবে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা

অবিশ্বাসী ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তিগণ কি বুঝিবে? কোন দেবপ্রতিমা, তীর্থ বা অন্য যে কোন স্থান বিশেষেই হউক না কেন, ভক্ত হিন্দুগণ যদি তাহাতে ভগবৎসত্তা অনুভব করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বতঃই সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার এই অকিঞ্চিৎকর দেহের প্রতি তীব্র অনাস্থা জন্মায় এবং সেই শুভক্ষণে যদি তাঁহার দেহপাত হয়, তাহা হইলে আর তাঁহার আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। আবালবৃদ্ধবনিতা হিন্দুমাত্রেই জানেন যে, আত্মার বিনাশ নাই। সে জন্য আত্মজ্ঞানপ্রবণ আর্য্যজাতি পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় সভ্যজাতির প্রকৃত অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই মৃত্যুভয়রহিত হইয়াছিলেন। সে আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট জাতির পক্ষে মৃত্যু অতি অকিঞ্চিৎকর, সর্পনির্ম্মোক পরিত্যাগের ন্যায় অতি সহজেই সে জাতি দেহান্তর গ্রহণে সমর্থ, সেই আত্ম-বিজ্ঞান-সম্পন্ন আর্য্যবংশধরগণের পক্ষে স্বীয় অভীষ্টদেবের আরাধনায়, যজ্ঞে, জীবসেবায়, কোন মহৎকার্য্যসাধনোদ্দেশ্যে তীর্থে বা ঐশ্বরিক ভাবোদ্দীপক প্রাকৃতিক দৃশ্যে, তদ্গত-প্রাণ হইয়া আত্মসমর্পণ করা যে নিতান্ত স্বাভাবিক, ভারত ইতিহাসের পত্রিপত্রে আমরা তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।

মুসলমান রাজত্বকালে এই ভারতে যে প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যমহিলাগণ জলন্ত অনলে প্রবেশ করিয়া স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য অবলীলাক্রমে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহা কি আর্য্যজাতির মৃত্যুভয়রাহিত্যের এক বিশিষ্ট প্রমাণ নহে? যে জাতির অতি কোমলপ্রাণ নারীসমাজেও এরূপ মৃত্যুঞ্জয়-ভাব পরিদৃষ্ট হয়, সেই সুমহৎ জাতির অপূর্ব্ব চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করা আধুনিক সভ্যতাভিমানী, দেহাত্মবাদী, বিমূঢ়-চিত্ত ব্যক্তিগণের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর্য্যচরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়াই তাঁহারা ভারতে কেবল নিতান্ত বর্ব্বরোচিত আকার সমূহেরই ছড়াছড়ি দেখিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই বুঝি তাঁহারা বিভীষিকাগ্রস্তের ন্যায় হইয়া আর্য্যজাতির বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহাদের কঠোর শাসনে অত্যাচারমূলক বীভৎস দুই একটি লোকাচার নিষিদ্ধ হইলেও হিন্দুর স্বেচ্ছামৃত্যু আজিও লোপ পায় নাই। আত্মজ্ঞানরূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত আর্য্যজাতি আজিও মৃত্যুভয়রহিত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতিকেও সেই পথে লইয়া যাইতেছেন। হৃতসর্ব্বস্ব আর্য্যজাতি জগতে জন্মমৃত্যুর প্রকৃত রহস্য প্রচার করিয়া বহুতর সুসভ্যজাতিকে উন্নত করিতেছেন। নিঃস্ব ভারত আজিও আপন অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের অনুপম রত্নসমূহ অকাতরে বিতরণ করিয়া স্বীয় অসীম উদারতার পরিচয় দিতেছেন। প্রবল পরাক্রান্ত বৃটীশ শাসনের প্রভাবে সহমরণে অপারগ বিধবার প্রতি বলপ্রয়োগ ও পৈশাচিক নিষ্ঠুরাচরণ নিষিদ্ধ হইয়া আমাদের দেশের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু পতিব্রতা আর্য্যরমণীর সঙ্কল্পিত কার্য্যে বাধা দিতে আজিও কেহ সমর্থ হয় নাই।

বিদেশীয়গণের উপর্য্যুপরি আক্রমণে ভারতীয় আর্য্যসমাজ যখন অতিশয় দীনদশা প্রাপ্ত হইল, তখন তাহাতে নানাপ্রকার কুসংস্কার আসিয়া দেখা দিল। অধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে বলপ্রয়োগ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। সেই জন্যই

বুঝি হিন্দুসমাজে কিছুদিন অতিশয় নিষ্ঠুরভাবে সতীদাহ করিবার দুরাগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই দুরাগ্রহের জন্যই অতি প্রাচীন সুসভ্য হিন্দুসমাজকে আজ অনেকেই অতিশয় ঘৃণিত ও হেয় বলিয়া পরিচিত করিতে উদ্যত।

কোনও আত্মজ্ঞানবিহীন জাতিই হিন্দুর ন্যায় ঐশ্বরিকভাবে মত্ত হইয়া অনায়াসে দেহপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা হিয়ান্ সাং যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন তো ভারত, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম ও ঐশ্বর্য্যে জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল। তাহা না হইলে কি আর বহুপ্রাচীন সুসভ্য চীনদেশ হইতে অমানুষিক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া তিনি এই ভারতে ছুটিয়া আসিতেন? মহাত্মা হিয়ান্ সাং যখন এ প্রয়াগ ধামে দেহপাত করিবার প্রথা হিন্দুসমাজে প্রচলিত দেখিয়া গিয়াছিলেন, তখন কি ভারতীয় আর্য্যসমাজ এতই ঘৃণিত ছিল, আর এই অত্যল্পকালমধ্যেই বিজাতীয় শিক্ষালোক প্রাপ্ত হইয়া সেই বর্ব্বরসমাজ একেবারে সুসভ্য হইয়া উঠিল?

হতভাগ্য ভারতে এখন আর ঘরে ঘরে হিন্দুর সেই সহমরণ নাই, এখন আর দেহাদি ভাবশূন্য হিন্দুর স্বীয় অভীষ্টদেবের সম্মুখে কথায় কথায় অকপট আত্মনিবেদন নাই, এখন আর চিন্ময়ী গঙ্গা ও যমুনাসঙ্গমের অপরূপ লহরী দর্শনে বিভোর হইয়া কাহারও আত্মবিসর্জ্জন করিবার উপায় নাই, সত্য, কিন্তু প্রকৃত আত্মহত্যার হ্রাস না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। পারিবারিক বিবাদ কলহে বা অন্য কোন অকিঞ্চিৎকর কারণে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নরনারীগণ, এক্ষণে যেমন কথায় কথায় উদ্বন্ধনে ও অন্যান্য উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া সাংসারিক ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করেন, তখনকার লোক বোধ করি এত মূর্খ ছিলেন না।

সে যাহা হউক, ঘটনা বৈচিত্র্যে প্রয়াগ ভূমি যে আমাদের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কত অদ্ভুত ও লোকাতীত ঘটনাই যে প্রয়াগরাজের দর্শনে আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়, তাহা এই প্রবন্ধে লিখিয়া শেষ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এখনও এই বিচিত্র ভূমির চমৎকারিতা সমানভাবেই আছে। প্রয়াগের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের সহিত তুলনা করিলে যদিচ ইহার বর্ত্তমান অবস্থার হীনতা প্রকাশ পাইবে তথাপি তীর্থমাহাত্ম্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এখন প্রকৃত চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেখিবেন যে, এই গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম লহরীর কি অসীম শক্তি, এবং সেই মহাশক্তির প্রভাবে আবহমান কালাবধি এই বিচিত্র ক্ষেত্রে কত অদ্ভুত লোকপাবন মহৎকার্য্য সমুদয় অনুষ্ঠিত হইতেছে। যে শুভ মুহূর্ত্তে এই পবিত্র ভূমি গঙ্গাযমুনাসঙ্গম লহরীতে পরিপ্লাবিত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই এই অপূর্ব্ব ক্ষেত্র অনন্ত শক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে এবং সেই অবধি অসংখ্য অদ্ভুত, বিচিত্র, ও অলৌকিক কীর্ত্তি সমুদয়ের আধারভূমি হইয়া পুণ্যধাম প্রয়াগ আমাদিগকে চমৎকৃত করিতেছে। গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম হওয়াতেই প্রয়াগ ভূমির এত বিচিত্রতা, এত শক্তি, এত মহত্ত্ব। এখনও প্রয়াগে প্রত্যহ কত দান ও ব্রত অনুষ্ঠিত হইতেছে যে তাহার ইয়ত্তা হয় না। প্রয়াগের এই বিচিত্রতার মুখ্য কারণই গঙ্গা ও যমুনার একত্র সম্মিলন।

অপরা-বিদ্যারূপিণী শ্রীযমুনা, যেন পরা-বিদ্যা-রূপিণী ভাগীরথীর সলিলে মিলিতা হইয়াছেন; প্রবৃত্তিরূপা-যমুনা আপন লীলা শেষ করিয়া যেন নিবৃত্তিরূপা ভাগীরথীর শান্তি-বারিতে নিমগ্না হইয়াছেন। শ্রীভগবানের লীলা-সঙ্গিনী যমুনাদর্শনে যেমন আসন্নমুক্ত পুরুষের হৃদয়েও সেই অনুপমা, মধুময়ী ভগবল্লীলার রসমাধুরী পান করিবার ইচ্ছা বলবতী হয় তেমনি অনন্তসলিলা ভাগীরথীদর্শনেও জীবের সকল বাসনার নিবৃত্তি হয়। গতিদায়িনী ভাগীরথী যেমন জীবের মোক্ষদায়িনী হইয়া স্বীয় অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য আজিও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, শেষের সেই দিন স্মরণ করাইয়া যেমন জীব সমূহের বৈরাগ্য সাধন করিতেছেন, কালিন্দী যমুনাও তেমনি শ্রীভগবানের সেই অপূর্ব্ব ব্রজলীলার কথা স্মরণ করাইয়া মুক্ত পুরুষগণকেও যেন এই মর্ত্ত্যে আহ্বান করিতেছেন; মহাবৈরাগ্যবান্ পুরুষের হৃদয়েও যেন পুনরায় সেই ভগবল্লীলা দর্শন করিবার বাসনা জাগরূপ করিয়া দিতেছেন।

বিচিত্র সভাব-সম্পন্না গঙ্গা ও যমুনার মাহাত্ম্য প্রভাবে প্রয়াগরাজ অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও ভোগ এবং অপূর্ব্ব বিবেক, বৈরাগ্য ও ত্যাগের লীলা-ভূমি হইয়া হতভাগ্য ভারতের অপার মহিমায় এখনও সকলকে চমৎকৃত করিতেছে। যমুনা যেন স্বীয় অনন্ত ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার প্রয়াগের বিচিত্র কূলে ঢালিয়া রাখিয়াছেন এবং স্বকার্য্য সাধন করিয়া বহুকালের পর জাহ্নবী-সঙ্গিনী হইয়া এ জগতে নিবৃত্তির জয় ঘোষণা করিতে করিতে অপূর্ব্ব গঙ্গামাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন।

হিন্দু-জ্যোতিষ।

—:০:—

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

জ্যোতিষ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; গণিত ও ফলিত। ইহাদের শেষোক্তটি প্রথমটির মুখাপেক্ষী। গণিত জ্যোতিষের সাহায্য ব্যতীত বাস্তবিক ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা অসম্ভব। সুতরাং গণিত জ্যোতিষ শিক্ষা ভিন্ন জ্যোতিষজ্ঞ হওয়ার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই—আজকাল জ্যোতিষ বলিলেই ফলিত জ্যোতিষ বুঝায় এবং রাশিচক্রের নাম শিখিয়াই লোকে জ্যোতিষের ব্যবসা করিতে বসে।

আমরা নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দিনেরবেলা একটি তেজোময় গোলাকার পদার্থ

ও রাত্রিবেলা ভিন্ন ভিন্ন আকারের দীপ্তিশালী অনেকগুলি পদার্থ পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত হইতে দেখি। এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিলে স্বতঃই এই প্রশ্নটি মনে উদয় হয় যে এই গুলি কি? এবং কেনই বা প্রতিদিন ইহাদিগকে এইরূপ প্রদক্ষিণ করিতে হয়?

প্রাচীন মানবজাতিসমূহ সম্ভবতঃ এই ভাবেই প্রণোদিত হইয়া জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং সত্যতত্ত্বপ্রাপ্তি মানসে যত্নপর হন।

ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের কিরূপ আলোচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্যসমূহ কাল, ঋতুর সহিত কিরূপ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, তাহা দেখিলেই প্রতীয়মান হয়।

হিন্দু-জ্যোতিষ প্রধানতঃ তিন স্তরে বিভক্ত—

১ম স্তর—জ্যোতিষপ্রারম্ভ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রণালীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

২য় স্তর—বৌদ্ধ ও জৈনগণের প্রাদুর্ভাবের সময়।

৩য় স্তর—হিন্দুধর্ম্ম প্রণালীর পুনরভ্যুদয় হইতে আরম্ভ।

কোন্ সময় আর্য্যগণ জ্যোতিষের প্রথম আলোচনা করেন, তৎসম্বন্ধে অনেক মতবিরোধ আছে। হিন্দুগণের বেদে অচল, অটল বিশ্বাস। তাঁহাদের মতে বেদ অনাদি, ভগবন্মুখ-প্রসূত। বেদে জ্যোতিষের আলোচনা আছে; জ্যোতিষ একখান বেদাঙ্গ। সুতরাং হিন্দুমতে জ্যোতিষ অনাদি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী হিন্দু-জ্যোতিষের প্রারম্ভ সময় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বহুপ্রকার মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এত বিরোধ যে তাহাদের সামঞ্জস্য একপ্রকার অসম্ভব। নিম্নে কাহারও কাহারও মত উদ্ধৃত করিলাম।

যুগ সম্বন্ধে আলোচনার সময় ফরাসী দেশীয় পণ্ডিতবর (M. Bailly) বেইলি সাহেব বলেন ৩১০২ খৃঃপূঃ অব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারী মধ্যরাত্রে কলিযুগোৎপত্তি হয়। এই সময় একটি বিশেষ জ্যোতিষিক ঘটনা ঘটে, হিন্দুগণ তাহা পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই মতানুসারে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণের জ্যোতিষ সম্বন্ধে এইরূপ অভিজ্ঞতা ছিল যে তাঁহারা এই সমুদয় অদ্ভুত ঘটনা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কত শতাব্দীর যত্নের ফলে তাঁহারা এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

অধ্যাপক Playfair সাহেব বিশেষ বিবেচনা ও বিচারের পর এই মত সমর্থন করেন।

পণ্ডিতবর (Laplace) লাপ্লাস্ তাঁহার "Exposition du systeme du Monde" নামক গ্রন্থে বলেন যে The equation of the Sun's centre which they (the Hindus) fix at 2·4713° could not have been of that magnitude, but at the year 4300 before the Christian Era." অর্থাৎ সূর্য্য মন্দফল যাহা হিন্দুগণ ২·৪৭১৩° অংশ নির্দ্দেশ করেন, খৃষ্টজন্মের ৪৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ভিন্ন এই পরিমাণ হইতে পারে না।

ইহা হইতে দৃষ্ট হয় যে আর্য্যগণ প্রায় ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতিষের অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কতশত শতাব্দীর আলোচনার ফলে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ, তদুপযোগী যন্ত্রনির্ম্মাণ ও তৎসাহায্যে

গণিতের এই সব অতি সূক্ষ্ম হিসাব ঠিক হইতে পারে, তাহা আপনারাই বিবেচনা করিতে পারেন।

উপরোদ্ধৃত দুইটি মত হইতে জ্যোতিষের আরম্ভ সময় ও প্রথম স্তরে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা সহজেই বোধগম্য।

২য় স্তরে --অশোকের রাজত্বের পূর্ব্বে ২।৩ শত বৎসর পর্য্যন্ত কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে এই অনুমিত হয় যে কোন কোন অংশে জ্যোতিষের উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু মোটের উপর অবনতিই হয়।

অনেকে মনে করেন, আর্য্যভট্ট এই বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাবের সময় আবির্ভূত হন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে পৃথিবী সচলা এবং নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্ররাজি ও সূর্য্য নিশ্চল। পৃথিবীর আবর্ত্তন দ্বারা গ্রহ, নক্ষত্র সমূহের দৈনিক উদয় ও অস্ত হয়।

ভট্টপাল এবং অন্যান্য গণিতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের মতানুসারে দেখা যায়, বায়ুপ্রবাহকর্তৃক পৃথিবী তাহার কক্ষে পরিভ্রমণ করে এবং এই বায়বীয় পদার্থ পৃথিবী হইতে কিঞ্চিদধিক শত মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ইহাই আর্য্যভট্টের বিশ্বাস ছিল।

তৃতীয় স্তর—হিন্দুগণের পুনরভ্যুদয় সময়ে কয়েকজন জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন; তন্মধ্যে ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁহারা বৌদ্ধ ও জৈনগণের কতকগুলি ভ্রান্ত মত খণ্ডন করেন এবং আর্য্যগণের জ্যোতিষ গ্রন্থের কতক পুনরুদ্ধার করিয়া সঙ্কলন করেন।

পুরাতন জ্যোতির্গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক খানের নাম পাওয়া যায়।

১। ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত।
২। সূর্য্য সিদ্ধান্ত।
৩। সোম সিদ্ধান্ত।
৪। বৃহস্পতি সিদ্ধান্ত।
৫। গর্গ সংহিতা।
৬। নারদ সংহিতা।
৭। পরাশর সংহিতা।
৮। পুলস্ত্য সংহিতা।
৯। বশিষ্ঠ সংহিতা।
১০। ব্যাস সংহিতা।
১১। অত্রি সংহিতা।
১২। কাশ্যপ সংহিতা।
১৩। মরীচি সংহিতা।
১৪। মনু সংহিতা।
১৫। অঙ্গিরস সংহিতা।
১৬। লোমশ সংহিতা।
১৭। পুলিশ সংহিতা।
১৮। যবন সংহিতা।
১৯। ভৃগু সংহিতা।
২০। চ্যবন সংহিতা।

ইহা ব্যতীত ভাস্করাচার্য্যের প্রণীত সিদ্ধান্তশিরোমণি, বরাহমিহির প্রণীত পঞ্চাঙ্গসিদ্ধান্তিকা, বৃহজ্জাতক, বৃহৎ সংহিতা ইত্যাদি কয়েকখানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মগুপ্ত ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত নাম দিয়া ব্রহ্মসিদ্ধান্তের পুনরুদ্ধার করেন।

এই কয়খানি গ্রন্থমধ্যে প্রথম চারিখানি দেবোক্ত, অন্যান্য গ্রন্থ মনুষ্য প্রণীত। প্রথমখানি ব্রহ্মা, দ্বিতীয় সূর্য্য, তৃতীয় চন্দ্র, চতুর্থ বৃহস্পতি কর্তৃক উক্ত। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্ম-

সিদ্ধান্ত কি সূর্য্যসিদ্ধান্ত, কোন্‌টি প্রাচীনতম গ্রন্থ তাহা বলা বড়ই দুরূহব্যাপার।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ আমাদের বাসস্থান পৃথিবীর বিষয় মনে উদয় হয়; তৎপর অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টি পড়ে। পৃথিবী সম্বন্ধে হিন্দুদের কি বিশ্বাস, তাহাই প্রথম বলা হউক।

ব্রহ্মাণ্ডমেতৎ সুষিরং
তত্রেদং ভূর্ভুবাদিকম্।
কটাহ দ্বিতয়স্যৈব
সম্পুট· গোলকাকৃতিঃ॥

পরস্পর সমান দুইটি কটাহ মুখে মুখে মিলিত হইলে যেরূপ গোলাকার হয়, এই ব্রহ্মাণ্ডের আকৃতিও তদ্রূপ। এই ব্রহ্মাণ্ড আকাশপূর্ণ এবং তাহাতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য প্রভৃতি অবস্থিত।

ইহা হইতে দৃষ্ট হয় যে, ব্রহ্মাণ্ড ঠিক বর্ত্তুলাকার নহে কিন্তু ডিম্বাকৃতি।

মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য
ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।
বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং
ব্রহ্মণো ধারণাত্মিকাম্॥

এই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে ব্রহ্মদেবের নিরাধারাবস্থান রূপ শক্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী শূন্যে অবস্থিতি করিতেছে।

ধ্রুবোন্নতির্ভচক্রস্য নতির্মেরুং প্রযাস্যতঃ।
নিরক্ষাভিমুখং যাতুর্বিপরীতে নতোন্নতে॥

যদি উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, তবে অক্ষান্তরানুসারে ক্রমশই ধ্রুবকের উন্নতাংশ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু নিরক্ষবৃত্তাভিমুখে (দক্ষিণদিকে) গমনকালে ক্রমশই হ্রাস হয়।

এই কারণটির অর্থ বুঝিতে হইলে জ্যামিতির জ্ঞানের দরকার। এই যুক্তিটি অত্যন্ত দরকারী। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ পৃথিবীর গোলাকৃতি সম্বন্ধে যে তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করেন তন্মধ্যে ইহাও একটি।

"The most conclusive proof, however, depends on the fact, which is found by observation, that equal distances gone over by the observer due north or south produce almost equal variations in the meridian altitude of any chosen star (or of celestial pole). This could not happen except on the supposition that the earth is nearly spherical"

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ঠিক উত্তরাভিমুখে বা দক্ষিণাভিমুখে সমান দূর গমন করিলে, অক্ষান্তরের এবং কোন নির্দ্দিষ্ট তারা অথবা ধ্রুব নক্ষত্রের উন্নতাংশের তুল্য পরিবর্ত্তন হয়; ইহাই পৃথিবীর গোলাকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা অকাট্য যুক্তি।

মনে করুন ম বিন্দুতে দৃষ্টিকর্ত্তা দাঁড়াইয়াছেন। ব ম ব বৃত্ত, বিষুবরেখাকে ব, ব বিন্দুতে ছেদ করিতেছে। চ ক, ম ক এই দুইটি সরল

রেখা ধ্রুবকের (Pole) দিক নির্ণয় করিতেছে, ধ্রুবক পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে এই দুইটি সরল রেখাকে সমান্তরাল বলা যায়। ম বিন্দুতে ব ম ব বৃত্তের একটি স্পর্শিনী রেখা ম জ (Tangent টানিলে দৃষ্টিকর্ত্তার খিতিজের (Horizon দিক নির্ণয় হইবে।

ক ম, চ ক পরস্পর সমান্তরাল হওয়াতে ক ম ন কোণ ক চ ম কোণের সমান। কিন্তু জ ম ন কোণ ক চ ব কোণের সমান, কারণ ইহারা প্রত্যেকেই সমকোণ। অতএব ক ম জ কোণ ম চ ব কোণের সমান, (ধ্রুবকের) উন্নতাংশ (altitude) = স্থানের অক্ষান্তরের (latitude) সমান।

ইহা হইতে সহজেই দেখা যায় যে, যেমন আমরা উত্তরে কি দক্ষিণে যাই, ধ্রুবকের উন্নতাংশের পরিবর্ত্তন অক্ষান্তরের পরিবর্ত্তনের সমান হয়।

কিন্তু যদি পৃথিবী গোলাকারই হইবে তবে দৃষ্টাংশ কেন সমতল ?

অল্পকায়তয়া লোকাঃ
স্বস্থানাৎ সর্ব্বতোমুখম।
পশ্যন্তি বৃত্তামপ্যেতাং
চক্রাকারাং বসুন্ধরাং॥

মনুষ্যগণ অতি ক্ষুদ্র বিধায় গোলাকার পৃথিবীর যে অংশটুকু দেখে, তাহা সমতল মনে হয়।

এখানে বৌদ্ধ ও জৈনগণের মতের একটু আলোচনা করি। বৌদ্ধ ও জৈনগণের বিশ্বাস ছিল পৃথিবী সমতল, এবং তাঁহাদের প্রাদুর্ভাবের সময় এই মতই প্রচার করেন। কিন্তু হিন্দুগণের পুনরুভ্যদয়ের সময় জ্যোতির্ব্বিদ্গণ এই মত খণ্ডন করেন।

যদি সমা মুকুরোদর সন্নিভা
ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ।
উপরি দূরগতোঽপি পরিভ্রমন্
কিমু নরৈরমরৈরিব নেক্ষ্যতে॥

পৃথিবী যদি বাস্তবিকই একখানা আয়নার ন্যায় সমতল হইত, তবে ঊর্দ্ধে ভ্রমণকারী সূর্য্য আমরা কেন দেবতাদিগের ন্যায় সর্ব্বদা দেখিতে পাই না ?

বৌদ্ধগণ বলেন যে, স্বর্ণমেরুর অন্তরালে যখন সূর্য্য যায়, তখন আমাদের রাত্রি হয় ও আমরা সূর্য্য দেখিতে পাই না।

যদি নিশাজনকঃ কনকাচলঃ
কিমু তদন্তরগঃ সন দৃশ্যতে।
উদগয়ং ননু মেরুরথাংশুমান্
কথমুদেতি চ দক্ষিণভাগকে॥

যদি কনকাচল রাত্রির কারণ হইত, তবে কেন সেই সময়ে আমরা কনকাচল দেখিতে পাই না ?

পুরাণে উক্ত আছে, কনকাচল উত্তরভাগে অবস্থিত, তবে কেন সূর্য্যকে দক্ষিণ দিকে উদিত হইতে দেখি ?

বৌদ্ধগণ প্রচার করেন যে, পৃথিবী শূন্যে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু গুরুত্ববিধায় ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

ভূঃ খেঽধঃ খলু যাতীতি
বুদ্ধির্বৌদ্ধ মুধা কথং।
জাতায়াতন্তু দৃষ্ট্বাপি খে
যৎ ক্ষিপ্তং গুরু ক্ষিতিং॥

ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত শর কি কোন ভারী পদার্থ পুনরায় পৃথিবীতে পতিত হয় ইহা দেখিয়া, রে বৌদ্ধ, পৃথিবী নীচে পতিত হইতেছে এই বুদ্ধি তোমার বৃথা। কারণ পৃথিবী শর কি অন্য

কোন সাধারণ ভারী পদার্থ হইতে অধিক গুরু, সুতরাং ইহা এত বেগে পতিত হইতে যে উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত কোন পদার্থ পুনরায় পৃথিবীতে পড়িতে পারিত না।

দিন রাত্রি কিরূপে হয়? ইহার উত্তরে আর্য্যভট্ট ও তৎপশ্চাদ্বর্তী কয়েকটী জ্যোতির্ব্বিদ ভিন্ন সকলে বলেন পৃথিবী নিশ্চলা; সূর্য্য, চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহগণ ও নক্ষত্র সমূহের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ দ্বারা দিন রাত্রি সংঘটিত হয়।

বাস্তবিক আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করেন, তন্মধ্যে মাত্র দুই একটি যুক্তিহেতু পৃথিবীর গতি স্বীকার্য্য, নচেৎ অন্যান্য কারণ দ্বারা পৃথিবীর গতির বিশেষ কোন পমাণ পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পরিধি-
র্ব্যোম কক্ষাভিধীয়তে।
তন্মধ্যেভ্রমণং ভানা
মধোঽধঃ ক্রমশস্তথা॥

এই ব্রহ্মাণ্ড পরিধি ব্যোমকক্ষা নামে অভিহিত; তন্মধ্যে নক্ষত্র ও গ্রহগণ ক্রমশঃ উপর ও নীচ অবস্থায় পরিভ্রমণ করিতেছে।

ভচক্রং ধ্রুবয়োর্বদ্ধমা-
ক্ষিপ্তং প্রবহানিলৈঃ।
পর্যেত্যজস্রং তন্নদ্ধা
গ্রহকক্ষা যথাক্রমম্॥

এই রাশিচক্র প্রবহবায়ু কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিতেছে এবং গ্রহগণও তাহাদের স্বকীয় কক্ষাতে পরিভ্রমণ করিতেছে।

কিন্তু জৈনগণের বিশ্বাস ছিল –

দ্বৌ দ্বৌ রবীন্দু ভগণৌ চ
তদ্বদেকান্তরৌ তাবুদয়ং ব্রজেতাং।
যদব্রুবন্নেবমনম্বরাদ্যা
ব্রবীম্যতস্তান্ প্রতি যুক্তিযুক্তং॥

অর্থাৎ দুইটি সূর্য্য, দুইটি চন্দ্র এবং দুইটি রাশিচক্র চতুষ্কোণ স্তম্ভনিভ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ দ্বারা দিন রাত্রি ভেদ করে।

ইহার উত্তরে হিন্দুগণ বলেন—

কিং গণ্যং তব বৈগুণ্যং
দ্বৈগুণ্যং যোরৃথা কৃথাঃ।
ভার্কেন্দূনাং বিলোক্যাহ্ণা
ধ্রুবমৎস্য পরিভ্রমম্॥

ধ্রুবের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণকারী নক্ষত্র দেখিয়া রে জৈন, তোমার গ্রহও নক্ষত্রসমূহের দ্বিগুণ কল্পনা বৃথা মনে হয় না। যে সকল নক্ষত্র ধ্রুবতারার নিকটবর্ত্তী, তাহাদের উদয়াস্ত নাই। তাহাদের গতি দেখিলেই রাশিচক্রের পরিভ্রমণ প্রতীত হয়।

প্রত্যহ কি দিবা রাত্রিমান এক থাকে?

অতস্তত্র দিনং ত্রিংশ-
ন্নাড়িকং শর্বরী তথা।
হানিবৃদ্ধী সদা বামং
সুরাসুর বিভাগয়োঃ॥

নিরক্ষপ্রদেশে দিন রাত্রি সমান; উভয়ই ৩০ দণ্ড। কিন্তু ইহার উত্তর দক্ষিণদেশে দিন রাত্রি সমান হয় না। উত্তর দিকে দিনের বৃদ্ধি ও রাত্রি হ্রাস হইলে দক্ষিণ দিকে দিনের হ্রাস ও রাত্রি বৃদ্ধি হয়; তদ্রূপ উত্তর দিকে রাত্রির বৃদ্ধি ও দিনের হ্রাস হইলে দক্ষিণ দিকে দিনের বৃদ্ধি ও রাত্রি হ্রাস হয়। এই জন্যই দেখা যায় বিষুব সংক্রান্তি দিবসে দিন রাত্রি সমান হয়। খগোল ব্যতীত ইহার অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করা কষ্টকর।

দিনরাত্রি এইরূপে সংঘটিত হইল কিন্তু

তবে দিনের বেলা সূর্য্য ব্যতীত অন্য কোন গ্রহ কি নক্ষত্র দেখি না কেন ?

তদুত্তরে হিন্দুগণ বলেন—

অথোদয়াস্তময়য়োঃ
পরিজ্ঞানং প্রকীর্ত্ত্যতে।
দিবাকরকরাক্রান্ত
মূর্ত্তীনামল্পতেজসাম্॥

অল্প তেজবিশিষ্ট অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ সূর্য্যরশ্মি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায়, তাহাদের উদয়াস্তের জ্ঞান জন্মে।

হিন্দুগণ নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্ক পদার্থ গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন, গ্রহ ও তারা।

চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইহারা গ্রহ এবং অন্যান্য গুলি তারা।

আধুনিক মতে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহ নহে। সূর্য্য একটি তারা এবং চন্দ্র একটি উপগ্রহ, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে।

এই গ্রহগুলি কি পৃথিবী হইতে সমদূরে অবস্থিত ? তদুত্তরে হিন্দুগণ বলেন—

মন্দামরেজ্য ভূ পুত্র
সূর্য্য শুক্রেন্দুজেন্দবঃ।
পরিভ্রমন্ত্যধোঽধস্থাঃ
সিদ্ধবিদ্যাধরা ঘনাঃ॥

শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ, চন্দ্র অধোঽধবস্থায় পরিভ্রমণ করিতেছে।

আচ্ছা, যদি নক্ষত্ররাজি এবং গ্রহগণ প্রবহবায়ুকর্ত্তৃক চালিত হয়, তবে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট গ্রহ এবং কোন একটি নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রের ব্যবধান সব সময় একই থাকে না কেন ? উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট গ্রহের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে গ্রহগণের গতি নক্ষত্রগণের গতি হইতে অন্য প্রকার, ইহার কারণ কি ?

পশ্চাদ্ ব্রজন্তোঽতিজ-
বান্নক্ষত্রৈঃ সততং গ্রহাঃ।
জীয়মানাস্তুলম্বন্তে
তুল্যমেব স্বমার্গগাঃ॥

গ্রহগণ নক্ষত্র রাশি সহিত স্ব স্ব কক্ষাতে প্রবহবায়ুকর্ত্তৃক পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। পরন্তু গ্রহগণ নক্ষত্রসমূহকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যেন সলজ্জ ভাবে সমভাবে পিছাইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু শুধু যে পিছাইয়া পড়িতেছে তাহা নয়, উত্তর দক্ষিণ দিকেও অগ্রসর হয়।

অদৃশ্যরূপাঃ কালস্য
মূর্ত্তয়ো ভগণাশ্রিতাঃ।
শীঘ্রমন্দোচ্চপাতাখ্যা
গ্রহাণাং গতিহেতবঃ॥
তদ্বাতরশ্মিবদ্ধাস্তৈঃ
সব্যেতর পাণিভিঃ।
প্রাকপশ্চাদপকৃষ্যন্তে
যথাসন্নঃ স্বদিঙ্মুখম্॥
প্রবহাখ্যো মরুৎ তাংস্তু
স্বোচ্চাভিমুখমীরয়েৎ।
পূর্ব্বাপরাপকৃষ্টাস্তে
গতিং যান্তি পৃথগ্বিধাম্॥

শীঘ্রোচ্চ, মন্দোচ্চ, পাত ইত্যাদি গ্রহগণের গতির কারণ। তাহাদের বায়ুরূপ রজ্জুপ্রভাবে সম্মুখ দিকে ও পশ্চাৎ দিকে, গ্রহগণ আকৃষ্ট হইতেছে। শীঘ্রোচ্চ ও মন্দোচ্চ আকর্ষণ হেতু পূর্ব্ব পশ্চিমে ও পাত হেতু উত্তর দক্ষিণে আকৃষ্ট হইতেছে।

শীঘ্রোচ্চ, মন্দোচ্চ, পাত কাহাকে বলে ?

ইহাদের সংজ্ঞা একটু দেওয়া আবশ্যক, নচেৎ এই শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে না।

গ্রহগণ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে, ঠিক বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে না; পরন্তু বৃত্তাভাস (Ellipse) পথেই পরিভ্রমণ করে।

কোন টেবিল বা বোর্ডের দুইটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে একখণ্ড সুতার প্রান্তদ্বয় যদি নিবদ্ধ হয়, এবং ঐ সুতা-সংলগ্ন একটি পেন্সিলের অগ্রভাগ এরূপভাবে চতুর্দ্দিকে চালিত হয় যে, সুতা সর্ব্বদা সম্পূর্ণ বিস্তৃত থাকে, ঐ পেন্সিলের অগ্রভাগ কর্ত্তৃক অঙ্কিত ক্ষেত্রকে বৃত্তাভাস (Ellipse) বলে। ঐ নির্দ্দিষ্ট বিন্দুদ্বয়কে অধিশ্রয় (Focus) বলে ও বিন্দুদ্বয় যোজক রেখাকে জ্যোতিষশাস্ত্রে মন্দরেখা (Line of apsides) বলে। এই রেখাও বৃত্তাভাসের সম্পাত বিন্দুদ্বয়কে জ্যোতিষ শাস্ত্রে শীঘ্রোচ্চ ও মন্দোচ্চ বলে। গ্রহগণের কক্ষা ও সূর্য্যকক্ষার সমতলের সমপাত বিন্দুদ্বয়কে পাত (Node) বলে।

এখানে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে গ্রহগণের কক্ষা কিরূপ? গ্রহগণের কক্ষা বৃত্তাভাসাকার, পৃথিবী তাহার একটি অধিশ্রয়ে অবস্থিত। কক্ষাগুলি এক সমতলে অবস্থিত এবং পরস্পর সমান্তরাল নহে।

এবং ত্রিমনরন্ধ্রার্কি
রসার্কার্কা দশাহৃতাঃ।
চন্দ্রাদীনাং ক্রমাদুক্তা
মধ্যাবিক্ষেপলিপ্তিকাঃ॥

চন্দ্রক্রান্তি বিক্ষেপ	...	৪°৩০′
মঙ্গলক্রান্তি „	...	১°৩০′
বুধক্রান্তি „	...	২°
বৃহস্পতি „	...	১°
শুক্রক্রান্তি „	...	২°
শনিক্রান্তি „	...	২°

বাস্তবিক গ্রহগণ পরিধিবৃত্ত (Epicycle) পথে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহাই হিন্দুগণের বিশ্বাস ছিল।

যদি গ্রহগণ সমভাবে পিছাইয়া পড়ে, তবে গ্রহগণের গতির পার্থক্য কেন?

পাগ্গতিত্বমতস্তেষাং
ভগণৈঃ প্রত্যহং গতিং।
পরিণাহ বশাদ্ভিন্না
তদ্বশান্তানি ভুঞ্জতে॥
শীঘ্রগস্তান্যথাল্পেন
কালেন মহতাল্পগঃ।
তেষাং তু পরিবর্ত্তেন
পৌষ্ণান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ॥

নক্ষত্রগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়াতে ইহাদের পূর্ব্বদিকে গতি অনুমিত হয়। কিন্তু গ্রহগণের কক্ষা সমান নহে; ভিন্ন ভিন্ন কক্ষানুরোধে ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে তাহাদিগকে দেখা যায়। এই গ্রহগণের মধ্যে যাহারা দ্রুতগামী তাহারা অল্প সময়ে, যাহারা ধীরগামী তাহারা বেশী সময়ে, অশ্বিনী নক্ষত্রপ্রমুখ রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে।

হিন্দুগণ চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি গ্রহগণের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাহারা কতগুলি নক্ষত্র হইতে বেশী দূরে কখনও ভ্রমণ করে না। এই নক্ষত্রসমূহের কক্ষার সাধারণ নাম রাশিচক্র। প্রকৃতপক্ষে এই রাশিচক্র গ্রহগণ অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত।—সর্ব্বনিম্নে আমাদের অবস্থান বিধায় আমাদের উপরিভাগস্থ কোন দুইটী জ্যোতিষ্ক পদার্থ এক সমসূত্রে থাকিলেই মনে হয় যেন

তাহারা নভোমণ্ডলের একই স্থান অধিকার করিয়া আছে। এইরূপে যখন কোন গ্রহ রাশিচক্রের কোন এক বিশেষ অংশে অবস্থান করে, তখন বলা হয় উক্ত গ্রহ অমুক রাশিতে আছে।

বিকলানাং কলা ষষ্ট্যা
তৎষষ্ট্যা ভাগ উচ্যতে।
তত্রিংশতাভবেদ্রাশি-
র্ভগণো দ্বাদশৈব তে॥

এই রাশিচক্রকে ১২ ভাগ করিলে ১ রাশি হয়। এক রাশিকে ৩০ ভাগ করিলে ১ অংশ; এক অংশকে ৬০ ভাগ করিলে ১ কলা, এক কলাকে ৬০ ভাগ করিলে ১ বিকলা হয়।

এই দ্বাদশ রাশির নাম মেষ বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন।

ইহা হইতে কোন গ্রহ রাশিচক্রের কোন স্থানে থাকিলে কোন্ রাশিতে আছে বলা যায়, কারণ পূর্ব্বের একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে রেবতী নক্ষত্রের শেষ বিন্দু হইতে অর্থাৎ অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম বিন্দু হইতে রাশিচক্রের আরম্ভ হয়।

তারাগ্রহাণামন্যোন্যং
স্যাতাং যুদ্ধ সমাগমেত॥
সমাগমঃ শশাঙ্কেন
সূর্যেণাস্তমণং সহ।

মঙ্গলাদি পাঁচটি গ্রহ যদি পরস্পর যুক্ত হয় অর্থাৎ এক রাশিস্থ এক নক্ষত্রে থাকে তবে তাহাকে যুদ্ধসমাগম বলে। চন্দ্রের সহিত যুক্ত হইলে সমাগম, সূর্য্যের সহিত যুক্ত হইলে অস্তমিত বলা হয়।

কখনও গ্রহগণ সূর্য্য সমভিব্যাহারে এক দিকে ধাবিত, কখনও বা সূর্য্যের বিপরীত অভিমুখে ধাবিত হইতেছে দেখা যায়। পঞ্জিকার কোন কোন দিনের গ্রহস্ফুট দেখিলেই ইহা সহজে নির্ণীত হইতে পারে। যখন সূর্য্যের বিপরীত দিকে যায় তখন গ্রহগণকে বক্রগতি বিশিষ্ট বা বক্রী বলা হয়, আর যখন সূর্য্যের সহিত একদিকে যায় তখন তাহাদিগকে ঋজুগতিবিশিষ্ট বলা হয়।

শীঘ্রে মন্দাধিকেঽতীতঃ
সংযোগো ভবিতান্যথা।
দ্বয়োঃ প্রাগ্যায়িনোরেবং
বক্রিণোস্তু বিপর্য্যয়াৎ॥
প্রাগ্যায়িন্যধিকেঽতীতো
বক্রিণ্যেষ্যঃ সমাগমঃ।

*　　*　　*

*　　*　　*

দুইটি গ্রহের দ্রুতগামী গ্রহ অপর ধীরগামী গ্রহের অগ্র বা পশ্চাতে থাকিলে তাহাদের সমাগম অতীত হইয়াছে কি ভবিষ্যতে হইবে এইরূপ বুঝায়। যখন গ্রহসমূহ পূর্ব্বাভিমুখে ঋজুগতিতে গমন করে অথবা যখন উভয়েই বা একটি বক্রী হয়।

কিরূপ অবস্থায় গ্রহগণ কোন্ রাশি ভোগ করে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং গ্রহযুতি (সমাগম) অর্থে তাহারা যে একবারে মিলিত হয় তাহা নহে, পরন্তু তাহারা আমাদের সহিত এক সমসূত্রপাতে থাকে ইহাই বুঝিতে হইবে।

ভাবাভাবায় লোকানাং
কল্পনেয়ং প্রদর্শিতা।
স্বমার্গগাঃ প্রযান্ত্যেতে
দূরমন্যোন্যমাশ্রিতাঃ॥

এই গ্রহগণ নিজ কক্ষাতে অবস্থিত হইয়া

একটি অপরটির ঠিক উপরিভাগে বা নিম্নে থাকে। মনুষ্যগণের হিতাহিত গণনা করিবার জন্যই এই গ্রহযুক্তি কল্পনা করিতে হয়।

এই গ্রহগণের মধ্যে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে কোন দিন প্রথম রাত্রি, কোন দিন মধ্যরাত্রে, কোন দিন শেষ রাত্রে উদয় হইতে দেখি। কিন্তু বুধ ও শুক্র হয় সন্ধ্যার কিছু পরে অস্ত বা সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে উদিত হইতে দেখি। গ্রহগণের উদয়াস্ত সম্বন্ধে এত পার্থক্য কেন?

নরসিংহ-পূজা।

"ত্রাহীতি ব্যাহরন্তং ত্রিদশরিপুসুতং ত্রাতুকামো নৃহস্তে
বিস্রস্তং পীতবস্ত্রং নিজকটিযুগলে সব্যহস্তেন গৃহ্নন্ ।
বেগশান্তং নিতান্তং খগপতিমমৃতং পায়যন্নস্যপাণৌ
সিংহাদ্যো শীঘ্রপাতাক্ষিতিপিহিতপদঃ পাতু মাং নারসিংহঃ ॥"

ধর্ম্ম মনুষ্য-হৃদয়ে কি শক্তি সঞ্চার করে, জগতের ইতিহাসে তাহার প্রদীপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। আশৈশব ভগবান্ নৃসিংহদেবের অনন্ত মহিমার কথা শুনিয়া আসিতেছি। পুরাণে পড়িয়াছি; কথকতায় তন্ন তন্ন করিয়া শুনিয়াছি; যাত্রায় দেখিয়াছি; থিয়েটারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কি দয়া, কি কৃপা, কি অপার করুণা! ভক্তের জন্য ভগবান্ সকল প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারেন। প্রহ্লাদ তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাঁহার অপার মহিমায় সর্ব্বদাই তন্ময় হইয়া থাকিতেন; তাঁহার অনন্ত বিভূতি-সমুদ্রে অনুদিন অনুক্ষণ নিমগ্ন হইয়া বিভোর হইতেন। বর্ণমালার প্রত্যেক বিন্দু ও রেখায় প্রহ্লাদ ভগবানের অনন্তমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন; প্রত্যেক শব্দে তাঁহার অনন্ত গুণ-গান শুনিতে পাইতেন। শিক্ষকের বেত্র, দৈত্য-রাজের ভ্রূকুটী, ঘাতুকের বধযন্ত্র—অগ্নি, বিষ, সমুদ্র, পাষাণ, করিপদ, সর্পদংশন—সেই ভগবানেরই প্রসাদ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেন, সেইজন্য কিছুতেই তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় নাই। সেইজন্য ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বীয় মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত প্রহ্লাদকে সকল বিপদে, সর্ব্ববিধ সঙ্কটে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজি সেই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর বরাভয় প্রদ মূর্ত্তি স্বচক্ষে দেখিয়া জন্ম সার্থক করিব।

প্রাণের ভিতর একটা প্রবল আবেগ প্রতি মুহূর্ত্তে বলবত্তর হইতে লাগিল। ভাবিলাম ভগবান কি অধমকে দেখা দিবেন না? কিন্তু

আমার সে ঐকান্তিকতা কোথায়? নানা সন্দেহে আন্দোলিত হইতে হইতে মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দ্বার-সম্মুখে এক প্রকাণ্ড ধ্বজস্তম্ভ;—সমস্তই লৌহ-ময়; বিশাল দেহ, সিংহাচলের উচ্চ চূড়াকে স্পর্দ্ধা করিয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। দ্বারের সম্মুখস্থ দীর্ঘ পথিমধ্যে একটি ছোটখাট বাজার। তাহাতে ফল ও মনোহারীর দোকান সাজান। ফলের মধ্যে আম, আনারস, রম্ভা, নারিকেল প্রচুর; মনোহারী দ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশই বিলাতী। চুড়ি, আরশি, চিরুণি, কৌটা, ছোট ছোট বাক্স, তিন চারি প্রকার রঙ্গিণ কাপড়, কুলি, চন্দন ইত্যাদি। দোকানী প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক। অনেকে কিনিতেছে; অনেকে দর করিয়া সরিয়া যাইতেছে; কেহ কেহ দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে। লোক আছে অনেকগুলি, কিন্তু কোন গোলমাল নাই, আড়ম্বর নাই। সর্ব্বত্রই তরলতা; কিন্তু তাহার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য্য যেন স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, পাণ্ডার দণ্ডপাণি মূর্ত্তি, কিংবা তাঁহার দূতগণের স্তবেশ দেখিতে পাইলাম না। সুতরাং আমার গাড়োয়ান মলয় প্রদর্শকের কাজ করিল। প্রথমেই দ্বারদেশে এক আনা প্রাবেশিকা লাগিল।

প্রবেশ করিয়াই একবার সম্মুখে চাহিলাম, দূরে মন্দির মধ্যে বিরল অন্ধকারের ভিতর অস্পষ্ট দীপালোকে গৃহটি কেমন স্তিমিত ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আর বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম—ঐ গৃহেই ভগবান্ নৃসিংহ দেব বিরাজমান। উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। ভাবমন্থর গতিতে সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। কোথাও কিছুমাত্র জনতা দেখিলাম না; দুই তিনটি যাত্রী দেব-দর্শন করিয়া প্রতিগমন করিতেছিল। তাহা-দের সকলেরই হাতে আধখানি করিয়া নারি-কেল। তাহারা ত্রৈলঙ্গী। সিংহাচলে ত্রৈলঙ্গী যাত্রিরই আধিক্য; বাঙ্গালী, পশ্চিমে বা অন্য দেশীয় কোন লোক দেখিলাম না। বাঙ্গালীর মধ্যে তখন আমি একাকী। যে গৃহে দেবতা অধিষ্ঠিত, তাহা দেবালয়ের মধ্যস্থলে স্থাপিত। তাহা একটি স্বতন্ত্র মন্দির। মন্দিরের চারি-দিকে সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের পর দরদালান, —চকমিলান। দালানের ছাদ বড় বড় পাষাণ-স্তম্ভের উপর ধৃত।

একদিকে দুইটি মুহুরী কি হিসাব পত্র লিখিতেছিল। তাহাদের পার্শ্বে একটু দূরে সন্ন্যাসী ধরণের একটি লোক বসিয়াছিল; তাহার পার্শ্বে একটি ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতে-ছিলেন। আমার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। আর একজন ব্রাহ্মণ সসম্ভ্রমে সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আপনার এত বিলম্ব হইল কেন?" তিনি হিন্দীভাষায় জিজ্ঞাসা করি-লেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম, পথে আসিতে আসিতে এক স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন ভাবিয়া-ছিলাম তিনি একজন যাত্রী;—এখন দেখিলাম, পুরোহিত। আমি সংস্কৃত ভাষায় উত্তর করিলাম,"সোপানাবলি অতিক্রম করিতে বড়ই কষ্ট হইয়াছে।"

আমার সংস্কৃত উক্তি শুনিয়া তিনি অধিকতর শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। তখন আমা-দের উভয়ের মধ্যে সংস্কৃত ভাষাতেই আলাপ হইতে লাগিল। পরিচয়ে জানিলাম, তাঁহার

নাম দ্বিবেদী সর্ব্বেশ্বর শাস্ত্রী ;—নিবাস বিজয়-নগরম্। পরস্পরের পরিচয়-জিজ্ঞাসার পর শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "ষোড়শোপচারে না দশোপচারে পূজা হইবে।" আমি বলিলাম "কিছুই আয়োজন নাই, পঞ্চোপচারেই হউক।" তুলসী ও পুষ্প সেইখানেই পাইলাম এবং যথাজ্ঞান ভগবানের পূজা করিলাম। দেবতার সম্মুখে আর একটি ব্রাহ্মণ ছিলেন ;—তিনিই পূজক। তিনি এক আছাড়ে নারিকেলটি ভাঙ্গিয়া তৎসঙ্গে রম্ভা নিবেদন করিলেন এবং কর্পূরটুকু জ্বালিয়া আরতি করিলেন।

বড়ই দুঃখের বিষয়, ধ্যানে যে মূর্ত্তি দেখিলাম, প্রকাশ্যে তাহা দেখিতে পাইলাম না। সেই কুন্দসন্নিভসুন্দরতনু, ও ত্রিনেত্রশোভিত—পরিপূর্ণচন্দ্রবিড়ম্বকারি বদনমণ্ডল—কিছুই নয়নগোচর হইল না। চন্দনের পুরু লেপে আপাদমস্তক আবৃত। কোথায় সেই—

"বিস্রস্তং পীতবস্ত্রং নিজকটিগলিতং সব্য-হস্তেন গৃহ্ণন্ বেগশ্রান্তং নিতান্তং খগপতি-মমৃত পায়য়ন্নন্যপাণৌ।"

প্রিয় ভক্ত প্রহ্লাদকে বাঁচাইবার নিমিত্ত ভগবান্ ব্যস্ত হইয়াছিলেন সেই ব্যস্ততা বশতঃ তাঁহার কটিতট হইতে পীতবসন খসিয়া পড়িতেছিল। হরি বামহস্তে তাহা তুলিয়া ধরিতেছেন ; আর অপর হস্তে একান্ত পরিশ্রান্ত খগপতিকে অমৃত পান করাইতেছেন। সেই অপূর্ব্ব রূপ যে, আজি দেখিব মনে করিয়াছিলাম। যাঁহাকে পিতামহ ভীষ্ম একদিন রথচক্র ধারণ করাইয়া প্রতিজ্ঞা পালনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন সার্থক করিয়াছিলেন ; ভীষণ দৈত্য হিরণ্যকশিপু-বধের পর রুধিরসিক্ত বাম হস্তে স্খলিতবসনধারণে তাঁহার সেই ব্যস্ত বিব্রত ভাব দেখিতে পাইলাম না কেন? আহা! ভগবানের একটি নয়ন, এক দিকের বদনাংশ, একটি হস্ত ও কটিতটের অর্দ্ধভাগ সেই ব্যস্ত, বিব্রত, বিক্ষুব্ধভাবের চাঞ্চল্যে বিচলিত ; অন্য দিকের ভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহা শান্ত, সুশীতল, স্নেহ-মধুর কারুণ্যে অমৃতময় ; সেই দক্ষিণ চক্ষু আনন্দে হাস্যোৎফুল্ল,—তাহা ভক্তের হৃদয়ানন্দকর ; যেন অনন্ত অভয়বাণী তাহা হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে ; তাই ভগবান্ সেই দক্ষিণ হস্তে গরুড়কে অমৃতপান করাইতেছেন। একাধারে এই ভীমকান্ত, ভ্রান্ত শান্ত, কঠোরকোমলরূপ আর কোথায় দেখিতে পাইব? কিন্তু কৈ? পুরাণে যাহা পড়িয়াছি, আজি সিংহাচলে ভগবানের সম্মুখে আসিয়া তাহা ত দেখিতে পাইলাম না। এ যে অন্য রূপ। ইহা ধাতুময়ী প্রতিমা ;—চারিটি হাত। ঊর্দ্ধ দক্ষিণ হস্ত অভয়দানে উদ্যত ; অবশিষ্ট হস্তত্রয়ে শঙ্খ চক্র ও গদা। লোকে সচরাচর এই ধাতু-মূর্ত্তিই দেখিতে পায় এবং ইহাঁরই পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু এই মূর্ত্তিটী ভগবানের আদি মূর্ত্তির আবরণ মাত্র। কারণ ইহার ভিতর সেই চন্দনভারলিপ্ত বরাহ নৃসিংহ মূর্ত্তি নিহিত। শুনিলাম, স্নানের সময়, এই ধাতব বহিরাবরণ খুলিয়া লওয়া হয়, সেই সময়ে ভগবানের সেই আদি রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সৌভাগ্যবশতঃ আমি ঠিক স্নানের সময় উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং সেই জন্যই ভগবানের সেই মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলাম।

কিন্তু তাহাতে আমার তৃপ্তি হইল না। চন্দনের গাঢ় গভীর আবরণে সেই অপরূপ রূপ

ঢাকা রহিয়াছে। আকুলপ্রাণে তাঁহার চরণ খুঁজিতে লাগিলাম; কিন্তু হায়.সেই রাতুল চরণ তিনি আর কাহাকেও দেখাইবেন না; সেই জন্যই সিংহাচলে ভগবান্ "ক্ষিতিগুপ্তপাদ।" দারুণ নৈরাশ্যে কাতর হইয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "ভগবান্ কি এইরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবেই সিংহাচলে চিরকাল থাকেন?"

দ্বিবেদী বলিলেন, কল্যাণম্ ও চন্দনযাত্রা উপলক্ষে বৎসরে দুইটি মহাযোগ হয়; তন্মধ্যে শেষোক্ত যোগে অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে ভগবানের মুখাবরক চন্দন আপনি কাটিয়া যায় এবং তাঁহার প্রকৃত রূপ বাহির হইয়া থাকে। সেই দুইটি পর্ব্বদিন যথাক্রমে চৈত্র ও বৈশাখ মাসের শুক্লা একাদশী ও তৃতীয়াতে দেখা যায়। কল্যাণ পর্ব্ব উপর্য্যুপরি পাঁচদিন এবং চন্দনযাত্রা কেবল এক দিনের জন্য থাকে। দুইটি পর্ব্বোৎসবেই মান্দ্রাজ প্রদেশের নানাস্থান হইতে প্রত্যহ প্রায় ৮ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

অনন্তর দ্বিবেদী মহাশয় আমাকে নরসিংহদেবের ভাণ্ডার ও গুপ্তগৃহ দেখাইলেন। বলিলেন, এই গুপ্তগৃহ যাহাকে তাহাকে দেখান হয় না; কারণ ইহার মধ্যে গোষ্ঠীদেবতারা বিরাজ করিতেছেন। ভাণ্ডারে একটি লোহার সিন্দুক, কতকগুলি নূতন বস্ত্র, ও তাম্র তৈজসপত্র ভিন্ন আর কিছুই দেখিলাম না; কিন্তু গুপ্তগৃহে যে সকল গোষ্ঠীদেবতা দেখিলাম, তাহাতে মন ভুলিয়া গেল। গোষ্ঠীদেবতার সংখ্যা কুড়ি। সকলগুলিরই প্রতিমূর্ত্তি সুগঠিত ও সুন্দররূপে চিত্রিত এবং উচ্চ কাষ্ঠমঞ্চের উপর স্থাপিত। কেহ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রবরাভয়প্রদ; কেহ বা দ্বিভুজ কেবল বরাভয়দাতা। মূর্ত্তিগুলি শ্বেতপ্রস্তর হইতে উৎকীর্ণ, বিশেষ সুন্দর। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, তাঁহাদেরও প্রত্যহ পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে।

গোষ্ঠীদেবতাগুলি দেখাইয়া দ্বিবেদী মহাশয়, আমাকে মন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে একটি বড় ঘরে লইয়া গেলেন। সেই গৃহমধ্যে অনেকগুলি সুন্দর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছিলেন। সম্মুখে সিংহাসনে রামসীতা বসিয়া আছেন, পার্শ্বে হনুমান, জাম্ববান, কতকগুলি সখী, ভক্তিনম্রভাবে দণ্ডায়মান। গৃহের অন্যদিকে নাগ, কূর্ম্ম, হস্তী, অশ্ব, গো প্রভৃতি কতকগুলি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। তাঁহারা ভগবানের বাহন। সেই গৃহটি উচ্চ ও আয়ত। তন্মধ্যে যতগুলি পাষাণস্তম্ভ আছে, সেগুলিতে সুন্দর কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়।

অনন্তর "কুন্দাভসুন্দরতনু পরিপূর্ণচন্দ্রবিম্বানুকারিবদনো" ইত্যাদি স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে নৃসিংহদেবের মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। প্রদক্ষিণ করিবার সময় দেখিলাম মন্দিরগাত্র অনেক স্থলেই চূণবালিতে ঢাকা রহিয়াছে। বড়ই সন্দেহ হইল, দ্বিবেদী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, মন্দিরের চারিদিকে বিস্তর অশ্লীল মূর্ত্তি ছিল; কিছুদিন পূর্ব্বে বিজয়নগরের বর্ত্তমান রাজার পিতামহী কাশীযাত্রা করিবার সময় এই মন্দির দর্শনে আসিয়া ঐ সকল অশ্লীল মূর্ত্তি দেখিতে পান। তাহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া তিনি সেই সকল পুতুল ঢাকিয়া ফেলিতে বলেন। সেই অবধি ঐরূপ পলস্তা।

প্রদক্ষিণ শেষ হইলে একবার চারিদিকের চক ও দরদালানটি ভাল করিয়া দেখিলাম।

দরদালানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ হাত এবং প্রস্থে অনুমান ১৫০ হাত হইবে। দীর্ঘাংশে দুই-দিকে ষোলটি করিয়া বত্রিশটি পাথরের বড় বড় থাম। প্রায় প্রত্যেক থামেই এক একটি লিপি খোদিত আছে। তন্মধ্যে প্রায়ই তিন-প্রকার বর্ণমালা দেখা যায়, তেলুগু, তামিল ও উড়িয়া। শিলালিপিগুলির প্রতিলিপি লই-বার বড়ই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সেরূপ কিছুমাত্র আয়োজন না থাকাতে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। দ্বিবেদী মহাশয় বলিলেন, এই সকল শিলা-লিপির মধ্যে কোনটিই বিশেষ প্রাচীন নহে। রাজরাজড়া ও বড়লোকের মধ্যে কে কবে মন্দিরদর্শনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এক একটা বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। সিংহাচলে উঠিবার সময় দুই একটি সোপান-পংক্তিতেও ছোটখাট লিপি দেখিয়াছিলাম।

পরে জানিলাম, সেই সকল স্তম্ভে প্রাচীন বিজয়নগরের সার্ব্বভৌম রাজা মহাবীর কৃষ্ণদেব রায় সম্বন্ধে একটি লিপি আছে। কৃষ্ণদেব রায় অন্ধ্রদেশ জয় করিয়া ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাচল দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। বারান্দার তিনটি কোণে তিনটি মূর্ত্তি দেখিলাম; একটিতে তারাদেবী, অপরটিতে লক্ষ্মীনারায়ণ বিরাজমান; অন্য একটি কোণে আচার্য্য শ্রীমৎ রামানুজ ও অপর কয়েকটি মূর্ত্তি আসীন। ইহাঁ-দের সকলেরই পূজা হইয়া থাকে। মন্দিরের বাহিরে উত্তরাংশে নৃসিংহ দেবের একখানি রথ দেখিলাম। শুনিলাম, সেই রথে চন্দন-যাত্রা দিনে ভগবানের পরিক্রম হইয়া থাকে।

মধ্যাহ্ন ১২টার পূর্ব্বেই আমার দেব-দর্শন ও মন্দির-দর্শন হইয়া গেল। তাহার পর বাসায় আসিয়া আহার করিলাম এবং তদন্তে এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া অনুমান ১॥ টার সময় মন্দির হইতে নামিতে আরম্ভ করিলাম। সিংহাচলে উঠিবার সময় তাহার ঝরণাগুলি ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। দ্বিবেদী মহাশয় বলিয়াছিলেন, প্রস্রবণগুলিই সিংহাচলের প্রধান সম্পত্তি। ইহাদের হইতেই এই দেব-শৈলের তত শস্যসম্পৎ। সেইজন্য আসিবার সময় একে একে সমস্ত ঝরণা দেখিতে লাগি-লাম। সেই সকল প্রস্রবণ তথায় ধারা নামে বিদিত। সর্ব্বোচ্চ উৎসের নাম পুত্রধারা; তাহার পর পুষ্করধারা, তন্নিম্নে গঙ্গাধারা। গঙ্গাধারার নীচে আকাশধারা এবং তন্নিম্নে অন্নপূর্ণাধারা। সর্ব্বনিম্ন ধারার নাম হনুমান-ধারা। এই সকল প্রস্রবণ-বারি ও তদুত্থিত শীকররাশি সমগ্র সিংহাচলকে বিবিধ বৃক্ষ-রাজির ছায়া-সংস্পর্শে এমনই স্নিগ্ধ ও শীতল করিয়া রাখিয়াছে যে, হৃদয়ের অতি দারুণ সন্তাপও অচিরে দূরীভূত হইয়া যায়।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আইনের ইতিবৃত্ত।

সাল	নম্বর	বিষয়
১৮২২	১১	বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য ভূমি বিক্রয়ের নিয়ম পরিবর্ত্তন, বিচারাদালতের কার্য্য প্রণালীর ভুল বা বিশৃঙ্খলতার জন্য গবর্ণমেণ্টের দায়ী না হইবার কথা ইত্যাদি।

৩৬ ধারা। গবর্ণমেণ্ট বা বোর্ড কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যদি কালেক্টর বকেয়া রাজস্বের জন্য বিক্রয় করা কোনও মহাল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খরিদ করেন তবে ঐ মুহাল এবং গবর্ণমেণ্টের খাস অন্যান্য সকল মহালের প্রতি খাসে রাখা বা ইজারা দেওয়া সাধারণ মালগুজারি মহালের শাসনের নিয়ম বর্ত্তিবে।

৩৮ ধারা। কোনও আদালতের কোনও হুকুম, কার্য্য বা ডিক্রিতে কোনও ভুল বা বিশৃঙ্খলতা থাকিলে, ঐ হুকুম, কার্য্য বা ডিক্রি জারি করিবার জন্য কোনও রাজস্ব বা গবর্ণমেণ্টের অন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হউক বা নাই হউক, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট দায়ী নন বা হইবেন না। পূর্ব্বোক্ত কোনও হুকুম, কার্য্য বা ডিক্রি অনুযায়ী কোনও কাজ করা গেলে বা কষ্ট ভোগ হইলে তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের কোনও কর্ম্মচারী দায়ী হইবে না এবং ঐরূপ কাজ বা কষ্ট ভোগের জন্য যদি কোনও ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট বা গবর্ণমেণ্টের কোনও কর্ম্মচারীর নামে নালিশ করে তবে ঐ নালিশ মায় খরচ অগ্রাহ্য হইবে। অন্য বিশেষ বিধান না থাকিলে, যে মোকর্দ্দমা, নালিশ বা খরচ গ্রহণ করিতে তিনি আইনানুযায়ী ক্ষমতাপন্ন সেই সম্বন্ধে কোনও সরকারী কর্ম্মচারীর কোনও হুকুম, কার্য্য বা ডিক্রির প্রতি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম বর্ত্তিবে।

সাল	নম্বর	বিষয়
১৮২৩	৬	নীল গাছের চাস ও আদায়ের লিখিত চুক্তি জারি করিবার সরাসরি মোকর্দ্দমা রুজু করা প্রভৃতি।

ভূমিকা—ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণী লোকের, বিশেষতঃ কৃষক শ্রেণীর, দারিদ্র্যনিবন্ধন ব্যবসা ও ব্যবহারের দ্রব্য উৎপন্ন করার জন্য ধার করা মূলধন সাধারণতঃ ব্যবহার হয়। নীলের গাছ চাস করার বঙ্গদেশে সাধারণ প্রথা এই যে, মহাজন টাকা এবং কখনও বীজ দাদন দেয়—এইরূপ কড়ার থাকে যে নির্দ্ধারিত জমির উৎপন্ন নির্দ্ধারিত মূল্যে বা নির্দ্ধারিত সময়ের বাজার দরে সে পাইবে।

মর্ম্ম—নীলগাছ চাসের জন্য লিখিত দলিল দ্বারা টাকা দাদন দিলে ঐ নীলগাছের উপর মহাজনের দাওয়া থাকিবে এবং মহাজন বর্ত্তমান আইনের নির্দ্ধারিত সরাসরি উপায়ে দলিলের সর্ত্ত আদায় করিতে পারিবেন।

সাল	নম্বর	বিষয়
১৮২৩	৭	স্বীয় রাজকীয় ক্ষমতাধীন ব্যক্তিগণের নিকট কভেন্যাণ্টেড্ সিবিলিয়ান্ কর্ম্মচারীগণের টাকা কর্জ্জ লওয়ার নিষেধ সম্বন্ধে।

২ ধারা—স্বীয় তাঁবেদার বা তাঁবেদারের তাঁবেদার কোনও দেশীয় কর্ম্মচারী বা তাহার জ্ঞানিত জামিনদার, কার্য্যাধ্যক্ষ, আত্মীয়, সম্পর্কীয় বা প্রতিপাল্য বা ঐ দেশীয় কর্ম্মচারী যে ব্যক্তির বর্ত্তমানে বা অতীতে চাকর, কর্ম্মচারী, জামিনদার বা প্রতিপাল্য আছে বা ছিল জানা যায় তাহার নিকট রাজকীয় কর্ম্মের যে কোনও বিভাগে নিযুক্ত কোনও কভেন্যাণ্টেড সিবিলিয়ান্ বর্ত্তমান আইন প্রচলন হওয়ার পর কোনও টাকা কর্জ্জ লইবেন না, বা কোনও প্রকারে ঋণগ্রস্ত হইবেন না—অন্যথায় চাকরী হইতে বরখাস্ত হইবেন। ঐরূপ রাজকীয় কর্ম্মে কোনও প্রকারে জবাবদিহি কোনও ম্যানেজার, গার্জ্জেন, একজিকিউটার, আমিন, সাজয়াল, গোমস্তা, ইজারাদার, মুতোলি বা অন্য ব্যক্তি বা তাহার জ্ঞানিত জামিনদার, কার্য্যাধ্যক্ষ, আত্মীয়, সম্পর্কীয় বা প্রতিপাল্য ব্যক্তির নিকট কোনও টাকা কর্জ্জ লইবেন না বা কোন প্রকারে ঋণগ্রস্ত হইবেন না—অন্যথায় চাকরী হইতে বরখাস্ত হইবেন।

৩ ধারা—স্বীয় এলাকাভুক্ত সহর, জেলা বা ডিবিসনে প্রকৃত সম্পত্তিবিশিষ্ট বা বাসিন্দা বা ব্যবসায় স্থানবিশিষ্ট কোনও জমিদার, তালুকদার, রায়ত বা অন্য ব্যক্তির নিকট জেলা কোর্টের জজগণ, ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, ম্যাজিষ্ট্রেটের রেজিষ্টার ও এ্যাসিষ্টাণ্ট কর্ম্মচারীগণ, রাজস্বের কালেক্টর ও ডিপুটি কালেক্টরগণ, কালেক্টর বা কালেক্টারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারীর এ্যাসিষ্টাণ্টগণ কোনও টাকা কর্জ্জ লইবেন না বা কোনও প্রকারে ঋণগ্রস্ত হইবেন না—অন্যথায় চাকরি হইতে বরখাস্ত হইবেন।

৪ ধারা—পূর্ব্বোক্ত বিধানের ব্যতিক্রমে কোনও কভেন্যাণ্টেড সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীকে কর্জ্জ দিতে বা অন্য প্রকারে ঋণগ্রস্ত করিতে সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা হইতেছে, যদি কেহ এই বিধান উল্লঙ্ঘন করে তবে যত টাকা কর্জ্জ দিবে তাহার সমান টাকা গবর্ণমেণ্টে জরিমানা দিবে।

৬ ধারা—কোনও কভেন্যাণ্টেড কর্ম্মচারী কোন নূতন পদ পাইবার পূর্ব্বে, যদি তিনি ঐ পদে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে এরূপ কোনও ঋণ করিয়া থাকেন যে তাহা ঐ পদে ভর্ত্তি হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুযায়ী বেআইনি হইবে, সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলকে সে বিষয় জানাবেন—*অন্যথায় পদ পাইবার পরে ঋণ করার* দণ্ড পাইবেন।

৮ ধারা—বর্ত্তমান আইন অনুযায়ী ধার্য্য জরিমানা আদায়ের মোকর্দ্দমা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের বিশেষ উপদেশ অনুযায়ী রুজু হইবে বা হইতে পারিবে এবং আইন কার্য্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্ব্র্যান্সার অথবা ঐ কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত অন্য কর্ম্মচারী ঐ মোকর্দ্দমা চালাইবেন। ঐ মোকর্দ্দমা ঘটনার স্থান যে বিভাগের ভিতর বা মহাজন যেখানে বাস করে বা প্রকৃত বা স্বীয় সম্পত্তি ভোগ করে সেই আদালতে রুজু হইবে। অন্যান্য অরিজিনাল মোকর্দ্দমার ন্যায় এই সকল

মোকর্দ্দমার আপিল চলিবে এবং দেওয়ানী আদালতের অন্য ডিক্রীজারির বিধান এই সকল মোকর্দ্দমার ডিক্রীজারির প্রতি বর্ত্তিবে।

সাল	নম্বর	বিষয়
১৮২৫	৬	ব্রিটিশ এলাকার ভিতর যাইবার সময় সৈন্যগণের রসদাদি যোগাড় সম্বন্ধে।

ভূমির দখলকার বা কার্য্যাধ্যক্ষ কোনও ভূস্বামী, ইজারদার, তহশীলদার বা অপর ব্যক্তি রাজস্বের কালেক্টর বা তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত কোনও সরকারী কর্ম্মচারী কর্তৃক সৈন্যগণের রসদাদি যোগাড় ও গমনের জন্য নৌকাদি রাখিতে ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী আদিষ্ট হইয়া যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক হুকুম অমান্য বা অবহেলা করেন অথবা সন্তোষজনক কারণ ব্যতীত ঐ কার্য্য করিতে উদ্যোগী না হন তবে ঐ হুকুমদাতা কালেক্টর বা তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত অন্য কর্ম্মচারী বা তাঁহার স্থলাভিষিক্তের নিকট সন্তোষজনকভাবে ঐ বিষয় সপ্রমাণ না হইলে, ব্যক্তির অবস্থা ও বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী ১০০০৲ হাজার সিক্কা টাকার অনধিক জরিমানা কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী ধার্য্য করিতে পারিবেন। ঐ জরিমানার হুকুমের ছয় সপ্তাহ মধ্যে বোর্ড অব রেভিনিউয়ের নিকট আপিল করিলে ও আপিলের হুকুম তামিল করার জন্য উপযুক্ত জামিন দিলে, কালেক্টর জরিমানা আদায় করিবেন না। আপিল বোর্ডের নিকট বা কালেক্টরের নিকট দায়ের করা যাইবে এবং উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে, হুকুমের ছয় সপ্তাহের পর আপিল গ্রহণ করা হইবে না।

সাল	নম্বর	বিষয়
১৮২৫	৯	১৮২২ সালের ৭ আইনের এলাকাবৃদ্ধি; মেয়াদী বন্দোবস্তী মহালের মালগুজারী সম্বন্ধে খাজানা না দিলে কয়েক বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া বা খাসে রাখা; ১৮১৯ সালের ২ আইনের বিধান পরিবর্ত্তন ইত্যাদি।

১ ধারা প্রথম দফা—১৮২২ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ষষ্ঠ দফা ও পরবর্ত্তী ৩৩টি ধারার বিধান, ১৭৯৩ সালের ৮ আইন, ১৭৯৫ সালের ২ ও ২২ আইন নির্দ্ধারিত প্রকারে যাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই এরূপ সমুদায় জমি মায় জায়গীর, মোকররী এবং নিষ্কর বা বিশেষ দলিলানুযায়ী অল্প খাজানায় ভোগী মধ্যস্বত্বের প্রতি বর্ত্তিবে।

দ্বিতীয় দফা—বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে যে সমুদায় মহাল খাসে আছে বা থাকিবে, তাহার প্রতি পূর্ব্বোক্ত বিধান খাসে থাকার সময়ে বর্ত্তিবে।

৩য় দফা—সুন্দরবন, ভাগলপুরের পার্ব্বত্য জমি, বন্দোবস্তের সময় তৎকালীন করধার্য্য মহালের সামিল বলিয়া উল্লিখিত পরগণা, মৌজা বা অন্য রাজস্ব বিভাগের অন্তর্গত নহে এরূপ বিস্তৃত জঙ্গল এবং পতিত জমি ও তাহার সংলগ্ন যাবতীয় মহালের প্রতি পূর্ব্বোক্ত বিধান বর্ত্তিবে।

৩ ধারা। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও বেনারস প্রদেশের ভিতর কোনও কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারীকে ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২০ধারার নির্দ্ধারিত

প্রকারে আবশ্যক মত এলাকার ভিতর সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল দিতে পারিবেন এবং ২১ ও পরবর্ত্তী ১৪টী ধারার লিখিত বিধান ঐ এলাকার প্রতি বর্ত্তিবে।

৪ ধারা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই এরূপ মহালের ভূস্বামী বা ভূস্বামী বলিয়া লিখিত ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত হইলে যদি রাজস্ব বাকী পড়ে এবং রাজস্ব দাখিল করার নির্দ্ধারিত তারিখের এক মাস মধ্যে মালগুজার ঐ টাকা না দিতে পারে তবে মহাল বিক্রয় করার আপত্তি থাকিলে এবং বকেয়া টাকা আদায় করার অন্য উপায় না থাকিলে—এই বিষয়ে রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী বোর্ডের মঞ্জুরি লইয়া এবং গবর্ণমেণ্ট হুকুম সাপক্ষে মালগুজারের সহিত বর্ত্তমান বন্দোবস্ত রদ করিয়া সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল যেরূপ আদেশ করেন ১৫বৎসরের অনধিক কালের জন্য মহাল ইজারা দিতে বা খাসে রাখিতে পারিবেন। এইরূপ স্থলে মালগুজারের সহিত যত টাকায় বন্দোবস্ত ছিল তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা যদি মহাল হইতে আদায় হয় তবে অতিরিক্ত টাকা হইতে প্রথমতঃ বকেয়া রাজস্ব বা তাহার যে পরিমাণ ইজারাদার পৃথকভাবে দিতে সম্মত না হইয়া থাকে বা অন্য প্রকারে আদায় না হইয়া থাকে তাহা দেওয়া হইবে এবং উদ্বৃত্ত হইতে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল যেরূপ আদেশ করেন, মালগুজারি বন্দোবস্তের শেষ বৎসরের জমার উপর শতকরা ৫৲ টাকার কম নহে বা ১০৲ টাকার বেশী নহে এরূপ মালিকানা মালগুজারকে দেওয়া হইবে।

৫ ধারা প্রথম দফা—১৮১৯ সালের ২ আইনের ৫, ৬, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ২২, ৩০ ধারার নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন হইবে।

দ্বিতীয় দফা—১৮২২ সালের ৭ আইনের নির্দ্ধারিত প্রকারে বন্দোবস্ত করার জন্য কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী কোনও মহাল পরিদর্শন করিলে বা পরিদর্শন করিতে উদ্যত হইলে ঐ মহালের জমি বা তাহার কিয়দংশ যে গ্রামে অবস্থিত তাহার ভিতর বা সংলগ্ন লাখেরাজ বা মোকররি বৃত্তিভোগী যাবতীয় ব্যক্তিকে নোটিশজারির তারিখ হইতে এক মাসের অনধিক কোনও যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে মহালের ভিতর নির্দ্ধারিত স্থানে যাবতীয় সনদ বা অন্য দলিল এবং দাবির অন্য প্রমাণসহ স্বয়ং বা উকীল দ্বারা উপস্থিত হইতে এবং প্রতিদিন হাজির থাকিতে, মহাল এবং গ্রামের ভিতর প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া নোটিশ জারি করিতে পারিবেন।

তৃতীয় দফা—পূর্ব্বোক্ত আইন অনুযায়ী কোনও মহালের বন্দোবস্ত কার্য্যে বা তাহার আয়োজনে নিযুক্ত কালেক্টর এবং পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মচারী বোর্ড অব রেভিনিউয়ের নিকট পূর্ব্বে এতলা না দিয়া ঐ মহাল বা তাহার কিয়দংশ যে গ্রামে অবস্থিত তাহার মধ্যে বা সংলগ্ন যাবতীয় মালগুজারি বা লাখেরাজ জমি মাপ করিতে বা করাইতে পারিবেন।

চতুর্থ দফা—কালেক্টর বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মচারী পূর্ব্বোক্ত নোটিশ দিয়া কোনও মহালের বন্দোবস্ত কার্য্য আরম্ভ করিলে, নোটিশের লিখিত পক্ষগণের উপস্থিত হইবার সময় আগতপ্রায় হইলে, নিষ্কর বা মোকররি বৃত্তিভোগী ব্যক্তিগণের দাবি শুনা সনদ ও অন্যান্য

দলিল গ্রহণ করার পূর্ব্বে, যে তারিখে তিনি কার্য্য করিবেন তাহার পূর্ব্বের দিবস, নিজের অফিসে এবং মহালের ভিতর কোনও প্রকাশ্য স্থানে ইস্তাহার লট্‌কাইয়া তাহা জানাইবেন।

পঞ্চম দফা—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নোটিশ দেওয়ার পর নিষ্কর বা মোকররী বৃত্তিভোগী কোনও ব্যক্তি স্বয়ং বা উকিল দ্বারা উপস্থিত না হইলে কালেক্টর, ঐ ব্যক্তির দখলীয় জমি নিষ্কর ভোগ করার স্বত্ব সম্বন্ধে একতরফা তদারক করিবেন এবং স্বত্ব অসিদ্ধ জ্ঞান করিলে বোর্ড অব রেভিনিউয়ের মঞ্জুরি লইয়া ঐ জমি বাজেয়াপ্ত করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনুপস্থিত অথবা ১৮১৯ সালের ২ আইন অনুযায়ী নির্দ্ধারিত প্রকারে উপস্থিত হইয়া জবাব দিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া সে বিষয়ে ত্রুটী করিয়া কোনও ব্যক্তি উক্ত আইনের ২২ ধারার লিখিত নিয়মে জমি বাজেয়াপ্ত ও করধার্য্য করা স্থগিত রাখিতে পারিবে না। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১১ ধারার দ্বিতীয় দফার নিয়ম ঐ ব্যক্তির প্রতি এবং ঐ আইন অনুযায়ী বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমন দিয়া হাজির করা ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।

ষষ্ঠদফা—পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত কালেক্টর এবং অন্য কর্ম্মচারী নিষ্কর বা মোকররী বৃত্তিভোগী ব্যক্তিগণের দাবীর তদন্ত পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনসহ ১৮১৯ সালের ২ আইনের পঞ্চদশ ও পরবর্ত্তী ধারা অনুযায়ী বন্দোবস্ত কার্য্যের ভিতর সমাধা করিতে পারিবেন অথবা দখলীয় জমি নির্দ্ধারণ এবং পক্ষগণের দাখিলা স্বত্বের দলিল লিপিবদ্ধ করিয়া তদন্তের অবশিষ্ট কার্য্য ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রাখিলে কোন্ সময়ে ও স্থানে পুনরায় তদন্ত হইবে তাহা কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী পক্ষকে সেই সময়ে জানাইবেন। যদি কারণবশতঃ তিনি জানাইতে না পারেন তবে তদন্ত পুনরায় আরম্ভ করিবার এক মাস পূর্ব্বে পক্ষকে উপস্থিত হইবার নোটিশ দিবেন এবং নোটিশ পাইয়া পক্ষ অনুপস্থিত হইলে কালেক্টর বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মচারী মোকর্দ্দমা একতরফা বিচার করিতে ও বোর্ডের মঞ্জুরি লইয়া জমি বাজেয়াপ্ত ও করধার্য্য করিতে পারিবেন।

সপ্তম দফা—বন্দোবস্ত কার্য্যের ভিতর নিষ্কর জমির তদন্তে নিযুক্ত কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী পক্ষগণ উপস্থিত হইয়া জমি করধার্য্যের উপযুক্ত নহে বলিয়া আপত্তি করিলে, পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনসহ ১৮১৯ সালের ২ আইনের পঞ্চদশ ও পরবর্ত্তী ধারার নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিবেন।

অষ্টম দফা—নিম্নলিখিত স্থল ব্যতীত জমি করধার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া পক্ষগণ স্বীকার করিলেও বোর্ড অব রেভিনিউয়ের মঞ্জুরী না লইয়া কালেক্টর কোনও জমি বাজেয়াপ্ত করিবেন না; স্বীকার রীতিমত লিপিবদ্ধ হইলে, আর তদন্ত না করিয়া বোর্ড তৎক্ষণাৎ জমির খাজানা ধার্য্য করার হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু ঐ জমি গ্রাম বা জমিদারী কর্ম্মচারী বেতনের পরিবর্ত্তে দখল করিলে, গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি না লইয়া উহা বাজেয়াপ্ত হইবে না।

নবম দফা—১৮১৯ সালের ২ আইন বা বর্ত্তমান আইন অনুযায়ী কালেক্টর যে তদন্ত করিবেন তাহাতে ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার প্রথম দফা ও ২৮ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

দশম দফা—নিষ্কর জমির খাজানা ধার্য্য

করার জন্য কালেক্টর বা গবর্ণমেণ্টের অন্য কর্ম্মচারী যে মোকর্দ্দমা করিবেন তাহাতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর আদালতে কোনও কার্য্যে বা দাখিলা দলিলে ষ্ট্যাম্প কাগজ ব্যবহার করা আবশ্যক হইবে না, কিন্তু ঐ সকল মোকর্দ্দমায় ও অন্যান্য যে সকল মোকর্দ্দমায় রাজস্ব কর্ম্মচারীদের বর্ত্তমান আইন অনুযায়ী বিচারের ক্ষমতা আছে তাহাতে তাঁহারা উপযুক্ত খরচ সাক্ষীদের দিতে পারিবেন ও ঐ খরচ এবং অন্যান্য যে খরচ তাঁহারা ডিক্রী দেন তাহা বকেয়া গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব আদায়ের বিধানে আদায় করিতে পারিবেন।

সমুদ্রবক্ষে প্রবল ঝড়বৃষ্টি।

উন্মাদিত রুদ্রগণ;
সপ্তপাতালের রোষে,
অনন্তের অন্তহীন শ্বাসে,
প্রলয়ের ভীষণ হুঙ্কারে—
আলোড়িত একীভূত-সপ্তসিন্ধু-জল।
অধঃ—ঊর্দ্ধ—দশ দিক, খর বরষণে
প্লাবিত ধরণী-গাত্র,—ভূধর—সাগর।
কুলিশের প্রচণ্ড নির্ঘোষে
শত বজ্র কাঁপে বিশ্বময়!
ছিন্ন ভিন্ন শত খণ্ডে বিদীর্ণ গগন
বিকট সে বজ্রানলে;—বুঝি খসি পড়ে
সাগরের জলরাশি শোষিতে সবলে।
তাই সিন্ধু মিলি যত যাদোদল সহ
উগারিছে সর্ব্বপ্রাণে সলিল-সম্ভার;—
উত্তাল তরঙ্গ তুলি সহস্র—অযুত
প্রকটিয়া ভ্রূকুটী বিলোল,
মহাভীম দশন-নিষ্পেষে
দিগন্ত আবরি ছুটে পুঞ্জ ফেনরাশি।

অনাবিল অন্ধকারে ধবল উচ্ছ্বাস
দৃশ্যমান শুধু ; স্বর্গ, মর্ত্ত, ব্যোম-গাত্র
দিশাহারা যেন বা বিলীন।
মুহুর্মুহু দামিনীর অট্ট অট্ট হাসে
স্ফুটীকৃত সমুদ্রের তাণ্ডব নটন।
অথবা যেনবা—
অতল, বিতল, কিংবা মহাতল হ'তে
মানবের পূর্ণ অগোচর—
প্রলয়ের গাঢ় ধূমে আচ্ছন্ন সে দেশ—
প্রগাঢ় আঁধার-রাশি
ঘূর্ণ্যমান বিশ্বব্যাপি কালচক্র সম
উলটি পালটি ছুটি' ধাই'ছে সবেগে
গ্রাসিবারে জগতের এ বপুঃ বিরাট।

বিশাখাপত্তন,
বীচ রোড।
৩।৬।০

উপাসনা।

ব্রহ্মোপাসনাতত্ত্ব।

(৫ম অংশ।)

১১৬। নিরঞ্জন জ্ঞান ও মোক্ষস্বরূপ পরব্রহ্মের বিবিধ নির্গুণোপাসনার মধ্যে যে সামান্য বিভিন্নতা আছে তাহা ধরিয়া তৎসমূহের শ্রেণীভাগ করা সুকঠিন। ফলে শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মোপাসনার যে কয়েকটি লক্ষণ ও অবলম্বন পাওয়া যায় তাহা বলিতেছি।

(১) যতোবাইমানীত্যাদিশ্রুতি এবং জন্মাদ্যস্যযতঃ ইত্যাদি বেদান্তসূত্রানুমোদিত তটস্থলক্ষণ ধরিয়া উপাসনা। (২) প্রণব ও গায়ত্রী অবলম্বনে উপাসনা। (৩) অন্তর্যামি অধি দৈবতাদিরূপে উপাসনা। (৪) শ্রুতিবেদান্তপ্রতিপাদ্য নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলনরূপী উপাসনা। (৫) প্রত্যগাত্মরূপ গুণাভিধানে ব্রহ্ম চিন্তা। (৬) আত্মাকে পরমাত্মাতে যোগ ও একীকরণার্থ চিন্তা। (৭) নির্গুণব্রহ্মেতে নির্গুণশ্রুতির সহিত সগুণশ্রুতির উপসংহাররূপ অবলম্বনদ্বারা উপাসনা। (৮) প্রীতি ও প্রেমযোগে আত্মোপাসনা। এই অষ্টপ্রকার লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা একই আত্মপ্রকরণস্থ এবং অমন্ত্রক। একই ব্যক্তি একাসনে এই সমস্ত উপকরণ যোগে ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারেন। যিনি ইতিপূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোচ্চ অধিকারী তিনিও তাহা করিতে পারেন, এবং তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব তত্ত্বজ্ঞানানুশীলন, ব্রহ্মবিচার ও উপাসনার অবিরোধে সম্যক্‌রূপে লৌকিক ব্যবহারের আচরণ এবং জনকাদি ঋষির ন্যায় লোকশিক্ষার্থ সদক্ষিণ সমন্ত্রক যজ্ঞাদিকর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানও করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন নিত্য-নৈমিত্তিক দেবসেবাদি কার্য্য তাঁহাদের অবশ্যকরণীয়। এসম্বন্ধে কর্ম্মযোগ পরিচ্ছেদে বিস্তারিতরূপে বলা গিয়াছে। আবশ্যক মতে পরেও বলিব। সম্প্রতি নিম্নে ক্রমশঃ ঐ অষ্টপ্রকার উপাসনাঙ্গের এবং তদবান্তরে সর্ব্বোচ্চ অধিকারস্থ ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনরূপ উচ্চ-উপাসনার শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথমতঃ। তটস্থ লক্ষণ।

১। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম
যত্তৎ শব্দোপলক্ষিতং।
যতোবেতি যতোবাচ
ইত্যাদি শ্রুতিসম্মতং॥

যৎ আর তৎ শব্দ-উপলক্ষিত যে পরব্রহ্ম

তাঁহার যতোবা ও যতোবাচ ইত্যাদি শ্রুতি-সম্মত উপাসনা করিবেন। ইতি

শ্রীগোবিন্দাচার্য্যের কারিকা।

২। "যতোবা ইমানিভূতানি জায়ন্তে" তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত ইত্যাদি শ্রুতিতে কহেন 'যৎ' যিনি এই বিশ্বের এবং ইহার অন্তর্গত সর্ব্ব-ভূতের-জন্মস্থিতিভঙ্গের কারণ, 'তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্ম' তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম। আর "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ, আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান নবিভেতি কুতশ্চন" মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পর-ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। ইত্যাদি শ্রুতি-সম্মতরূপে তাঁহার উপাসনা করিবেক।

৩। এই প্রকার শ্রুতিবিহিত জগৎরূপ কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনাকে তটস্থলক্ষণে উপাসনা কহে। ইহার নির্ণয়বাক্যসকল ঐ শ্রুতিতেই পরে পরে আছে। যথা—তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি রসস্বরূপ ইত্যাদি। তাঁহার বিশেষজ্ঞানই সর্ব্বোচ্চ অধিকার।

৪। ঐ শ্রুতিটি বেদান্তসূত্রের "জন্মাদ্যস্যযতঃ" সূত্রের উপলক্ষিত বাণী। সুতরাং উক্তরূপ উপাসনা "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" বেদবাণি-সম্মত এবং "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রানুমোদিত। অতএব এ উপাসনা ক্রিয়াধর্ম্মী অনুষ্ঠানের অতীত জ্ঞানলক্ষণা উপাসনা। অতঃপর ইহা সগুণব্রহ্মের অর্চ্চনা নহে। কেননা উক্ত সূত্রদ্বয়ে নির্গুণব্রহ্মের জিজ্ঞাসাই স্থাপিত হইয়াছে।

৫। শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে তটস্থলক্ষণ-উপাসনাকে সগুণ-উপাসনারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, নানাবিধ যজ্ঞবন্দনা-উপলক্ষিত দেবদেবীর অর্চ্চনা যেরূপ সগুণ-উপাসনা, এই তটস্থলক্ষণ-ব্রহ্মোপাসনা সেরূপ সগুণ-উপাসনা নহে। এ উপাসনায় ব্রহ্মের রূপ, গুণ ও নাম স্বীকার করা যায় না। ইহা কেবল শ্রুতিবিহিত যৎ তৎ শব্দ এবং আনন্দাদি বিধেয়-লক্ষণ এবং ভার্গবিবাকণি-বিদ্যার সমহারবাক্যপ্রতিপাদ্য হৃদয়গুহাস্থিত-ব্রহ্মজ্ঞান, এই ত্রিবিধ অবলম্বনদ্বারা সম্পাদ্য। অতএব ইহা সগুণের উপাসনা বা ক্রিয়ালক্ষণা অর্চ্চনা নহে। যে বস্তুতত্ত্বস্বরূপ জ্ঞানলক্ষণা-উপাসনা উক্ত বেদান্তসূত্রদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে ইহা তাহারই ব্যঞ্জক। যদি কোন উপাসকের স্বকীয় সগুণভাব পরিত্যক্ত না হইয়া থাকে এবং তৎকারণে উপাসনার পরিপক্কতা না হয়, তবে তাঁহার সগুণমোক্ষ অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গতি হয়। সাক্ষাৎ মোক্ষ হয় না, কিন্তু প্রতীকো-পাসকের দেবস্বর্গে গতি হয় মাত্র। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় না।

দ্বিতীয়তঃ। প্রণব ও গায়ত্র্যাবলম্বন।

১। প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ
গায়ত্র্যাত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম
আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিত॥

যে পরব্রহ্মে আত্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন, প্রণব ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদয়ের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিবে। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

২। এই ত্রিপদা গায়ত্রী সমুদয়ই বেদবাক্য। ইহা কর্ম্মাধিকারে ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকা মহামন্ত্রস্বরূপ; কিন্তু জ্ঞানাধিকারে ইহা আর

মন্ত্ররূপী নহে। ইহার প্রত্যেক পদ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের অভিব্যঞ্জক। ইহার অর্থচিন্তা দ্বারা আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত পরব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যিনি সূর্য্যদেবে বিষ্ণুতেজ-স্বরূপ, আমাদের আত্মায় অন্তর্যামিস্বরূপ, চিদাত্মারূপে বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক, সর্ব্বব্যাপী, এবং যিনি জন্মমরণধর্ম্মী সংসারভীরু জনগণের শরণ্য তাঁহার উপাসনাতে এই প্রণবাদি সহিত গায়ত্রীর অর্থ ধ্যান অবলম্বনীয়।

৩। তথাচ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ। বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তোবাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ বাচকেপিচ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি। ওঙ্কারের যিনি বাচ্য তিনি পরব্রহ্ম। ওঙ্কার তাঁহার বাচক। বাচককে জানিলে, বাচ্য প্রসন্ন হয়েন। অর্থাৎ ওঙ্কারের অর্থচিন্তাদ্বারা পরমাত্মাকে জানা যায়।

৪। দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডে, ষষ্ঠ শ্রুতিতে আছে—"ওঁ ইত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং।" শাঙ্কর—ওমেৎ আত্মানং ওঁ ইতি এবং ধ্যায়থ চিন্তয়ত"। সেই এই আত্মাকে ওঁকারের অবলম্বনে ধ্যান কর। ঐ খণ্ডে তৃতীয় শ্রুতিতে আছে, "প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে"। শাঙ্কর। "প্রণবঃ ওঁকারঃ ধনুঃ, শরঃ হি আত্মা উপাধিলক্ষণঃ, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যং উচ্যতে, আত্মভাবেন লক্ষ্যমানত্বাৎ"। প্রণব অর্থাৎ ওঁকার ধনুস্বরূপ; অবলম্বন। উপাধি-লক্ষণ আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা শররূপী। ব্রহ্ম লক্ষ্যস্বরূপে উক্ত হন। জীবাত্মার আত্ম-ভাবেতে তিনি লক্ষ্যমান্। এই হেতু এত-দুক্তি।

৫। শ্বেতাশ্বতরে। ২।৮। "ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণিভয়াবহানি।" শাঙ্কর—"ব্রহ্মশব্দং প্রণবং। তেন উড়ুপ স্থানীয়েন প্রণবেন প্রতরেত অতিক্রমেৎ বিদ্বান্ স্রোতাংসি সংসারসরিতঃ স্বাভাবিকী অবিদ্যা-কামকর্ম্ম প্রবর্ত্তিতানি ভয়াবহানি"। ব্রহ্মরূপ ভেলকাশ্রয়ে বিদ্বান্ সংসারসরিতের ভয়াবহ স্রোতসকল অতিক্রম করিবেন। এই শ্রুতিতে প্রণবকে ব্রহ্মরূপ উড়ুপ বলা হইয়াছে। তাদৃশ প্রণবাবলম্বনে উপাসক সংসার সাগর পার হইবেন। প্রণবের অমাত্র পরমাক্ষর চিন্তাদ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়। অতএব তাৎপর্য্যতঃ ব্রহ্মই উড়ুপ—ব্রহ্মই গন্তব্য।*

৬। গায়ত্রীও ঐরূপ ব্রহ্মোপাসনার অবলম্বন হইয়াও লক্ষণাপ্রয়োগে ব্রহ্মরূপে উক্ত হইয়াছেন। বেদান্তসূত্রে ১ম অঃ ১ পাঃ ২৬ সূত্রে কহেন "ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তে-শ্চৈবং"। গায়ত্রীবাক্যে ব্রহ্মই অভিপ্রেত হয়েন। যেহেতু ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়, এসমস্ত গায়ত্রীর পাদরূপে বেদে কথিত আছে। অক্ষরময় গায়ত্রীর এ সকল বস্তু পাদ হইতে পারে না। কিন্তু তৎসমস্ত ব্রহ্মের পাদ হয়। অতএব এখানে গায়ত্রী শব্দ ব্রহ্মরূপে অভি-প্রেত হইয়াছেন। গায়ত্রীতে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান লোকের চিত্ত অর্পণ জন্য কথিত হইয়াছে। অতএব গায়ত্রীরূপ ব্রহ্মাবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মলাভ করিবেক।

(রামমোহন রায়ের বেদান্ত দ্রষ্টব্য)।

৭। এই ত্রিপদাগায়ত্রী-অবলম্বিত ব্রহ্মো-পাসনা জ্ঞানলক্ষণা নির্গুণ-উপাসনা। ইহা

* এখানে প্রণব ব্রহ্মপ্রতীকরূপে গৃহীত হয় নাই।

আত্মপ্রকরণস্থ। "আত্মাযত্রপ্রতিষ্ঠিত" ইহা আত্মার প্রতিষ্ঠাস্থানস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা। উপরিভাগে যে যে ভাবে তাঁহার ধ্যান করার উপদেশ আছে তৎসমস্তই ব্রহ্মোপাসনার উপকরণস্বরূপ। এই আত্মোপাসনায় অধিকার অতি উচ্চ।

৮। পঞ্চদশীধ্যানদীপে ১৪৭ শ্লোকে কহেন "প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়োনির্গুণা এব বেদগাঃ"। প্রণবের উপাসনা প্রায় নির্গুণরূপেই সর্ব্বত্র উক্ত হইয়াছে। এস্থানে বাচকস্বরূপ প্রণবকে বাচ্য স্বরূপ ব্রহ্মরূপে অভেদে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রণবের যোগে নির্গুণব্রহ্মের উপাসনাই লক্ষিত।

তৃতীয়তঃ। অন্তর্যামাধিদৈবত।

১। পরব্রহ্মের অন্তর্যামিত্ব ও অধিদৈবত তত্ত্ব একত্রে উক্ত গায়ত্রীর তাৎপর্য্যমধ্যে প্রকাশিত আছে। যথা গুণবিষ্ণু "দীপ্তিমতঃ সূর্য্যাস্যতদনির্ব্বচনীয়মন্তর্যামি জ্যোতিরূপং বিশেষেণ প্রার্থনীয়ং ন কেবলং সূর্য্যান্তর্যামী কিন্তু যোঽসৌভগঃ অস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণামন্তঃস্থোঽন্তর্যামী সন বুদ্ধিরস্তীর্বিষয়েষু প্রেরয়তি "য আদিত্যমন্তরো যময়তি এষত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি শ্রুতি। দীপ্তিমন্ত সূর্য্যের সেই অনির্ব্বচনীয় অন্তর্যামি জ্যোতিঃস্বরূপ বিশেষ মতে প্রার্থনীয় তাঁহাকে আমরা চিন্তা করি। তিনি কেবল সূর্য্যের অন্তর্যামি হন এমত নহে। কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ যিনি আমাদের সর্ব্বদেহীর অন্তঃস্থিত অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন, "যিনি সূর্য্যের অন্তর্বর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিয়মে রাখিতেছেন, সেই অবিনাশি তোমার অন্তর্যামী আত্মা হন, অর্থাৎ তোমার অন্তঃস্থিত হইয়া তোমাকে নিয়মে রাখিতেছেন।" ইতিশ্রুতি।

গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনা বিধানং।
রাঃ মোঃ রাঃ ৩৯৫পৃঃ॥

এ স্থানে বুঝিতে হইবে যথা—সূর্য্য এক দেবতা, তাঁহার অন্তর্যামি ও অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ব্রহ্ম। সেই প্রকারে তিনি অগ্নি, জল, বায়ু, পৃথিবী প্রভৃতি সকল দেবতার অন্তর্যামি ও অধিদেবতা। শুদ্ধ তাহাই নহেন। সকল জীবের হৃদয়স্থ অন্তর্যামি ও অধিদেবতা। এই বচন নির্গুণ নিরঞ্জন উপাসনার বোধক। সূর্য্যাদি ও হৃদয়াদি অবলম্বনে অন্তর্যামি ও অমৃতস্বরূপ প্রার্থনীয় ব্রহ্মকে চিন্তা করা জ্ঞানলক্ষণা পরমাত্ম উপাসনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

২। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ। বেঃ সূ ১।১।২০ ব্রহ্মই সূর্য্যান্তর্বর্ত্তী পুরুষ। তিনিই সূর্য্যদেবের অধিদৈবতরূপে উপাস্য। ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে এই উপাসনা নিয়ন্ত্রোপাধি শ্রেষ্ঠোপাসনা অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনারূপে নির্ণীত হইয়াছে। ইহা ব্রহ্ম ভিন্ন সূর্য্যমণ্ডল বর্ত্তী কোন জীব বা দেবতার উপাসনা নহে।

৩। সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধোপদেশাৎ। ১।২।১।

মনোময়রূপে ব্রহ্মই উদ্দিষ্ট। মনের মনরূপে তিনিই উপাস্য। সর্ব্বত্রে বেদান্তে ব্রহ্মোপাসনারই উপদেশ। মনোময় শব্দ জীববোধক নহে। কিন্তু জীবধর্ম্মী মনোরূপ উপাধির অতীত অথচ মনের চেতয়িতাস্বরূপ ব্রহ্মবোধক।

৪। গুহাম্প্রবিষ্টাবাত্মানৌহিতদ্দর্শনাৎ। ১।২।১১।

জীবের হৃদয়গুহাতে জীবের সহিত ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়া আছেন। তিনি গম্য, জীব গন্তা। তিনি তথা উপাস্য, জীব উপাসক।

৫। অন্তর উপপত্তেঃ। ১।২।১৩।

ব্রহ্ম, জীবের অক্ষিগতা চক্ষুর চক্ষু।

ছান্দোগ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে উপকোশল বিদ্যাতে, তিনি পরমাত্মা, অমৃত, অভয়, সুখস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অধিকরণ মালাতে কহেন "তস্মাদীশোঽত্র উপাস্যঃ।" অতএব অক্ষি অবলম্বনে অক্ষিগতরূপে এখানে ব্রহ্মই উপাস্য। চক্ষুর চক্ষু হওয়া ব্রহ্মেরই ধর্ম। বিশেষতঃ অমৃতাদি বিশেষণ অন্যেতে লগ্ন হইতে পারে না।

৬। অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ। ১। ২। ১৮।

ব্রহ্মই পৃথিবী অন্তরীক্ষ দেবতা জীব প্রভৃতি সকলের অন্তর্যামি ও অধিদেবতা। বেদে যত অধিদৈবাদিবাক্য আছে তাহার তাৎপর্য্যই এই। বৃহদারণ্যকে পঞ্চম অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক সম্বাদে উক্ত আছে "যঃ পৃথিবীমন্তরোযময়তি এষত আত্মান্তর্যাম্যমৃত।" যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করেন তিনি তোমারও অন্তর্যামী এবং অমৃত আত্মা। এই তাদাত্ম্যভাবে তাঁহার উপাসনা করিবেক। এই অন্তর্যামিত্ব, অধিদৈবত ও অমৃতাদিধর্ম্ম কেবল ব্রহ্মের।

৭। অনুস্মৃতের্বাদরিঃ। ইত্যাদি।১।২।৩০-৩২।

পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র অর্থাৎ হৃদয়-পরিমিত কহা কেবল উপাসনার জন্য। ইহা বাদরি ও জৈমিনি উভয়েই কহিয়াছেন। এবং শ্রুতিতে আছে, যে তেজোময় পুরুষ অগ্নিতে আছেন তিনি পরমাত্মা। অতএব হৃদয় ও অগ্নির অন্তর্যামি ও অধিদেবতারূপে পরমাত্মাই উপাস্য। এখানে এই অগ্নি বৈশ্বানর শব্দে উক্ত হয়েন। অর্থাৎ জঠরাগ্নি। ফলতঃ সর্ব্বত্র পরমাত্মাই উপাস্য।

৮। দহরউত্তরেভ্যঃ। ১। ৩। ১৪।

'দহর' দহরাকাশ। জীবের হৃদয়াকাশ। ইহা ব্রহ্মরূপ পরমাকাশ। "গতিশব্দাভ্যাং"।১৫। ঐ আকাশই জীবের গতি। তাহা হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত অথবা হৃদয় তাহাতে প্রতিষ্ঠিত। "প্রসিদ্ধেশ্চ" অতএব হৃদয়ে ব্রহ্মোপাসনা প্রসিদ্ধ।

৯। হৃদ্যপেক্ষয়াতু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ। ১। ৩। ২৫।

মনুষ্যেরই শাস্ত্র ও উপাসনার অধিকার। এজন্য ব্রহ্ম মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ। হৃদয়ের পরিমাণে বেদে ব্রহ্মকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র কহিয়াছেন। "হৃদয়পুণ্ডরীকে ব্রহ্মণ উপলব্ধাৎ তস্মাদঙ্গুষ্ঠমাত্র পরমেশ্বরঃ"। এই বেদান্তসূত্রের লক্ষিত বেদবাণি নিম্নস্থ চারিটি শ্রুতি।

১০। অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষো-
মধ্য আত্মনিতিষ্ঠতি।
ঈশানোভূত ভব্যস্য
নততোবিজুগুপ্সতে॥

কাঠকে ৪ ব ১২ শ্রু।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণং হৃদয়পুণ্ডরীকং তচ্ছিদ্রবর্ত্ত্যন্তঃকরণোপাধিঅঙ্গুষ্ঠমাত্রবংশপর্ব্বমধ্যবর্ত্ত্যম্বরবৎ পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতিআত্মনি শরীরে মধ্যে তিষ্ঠতি" (শাঃ ভাঃ)।

এই শরীরে অন্তঃকরণ-উপাধিযুক্ত জীবাত্মা আছেন। তাঁহার হৃদয়ের পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র। তাহা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়-পুণ্ডরীকের মধ্যবর্ত্তী অন্তঃকরণোপাধি। তন্মধ্যে সর্ব্বতোপূর্ণভাবে পরমপুরুষ পরমাত্মা বিরাজিত আছেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ কহা যায়। যেরূপ বংশপর্ব্বমধ্যে অম্বর স্বল্প আকারে থাকে তদ্বৎ তিনি জীবের নিস্তার-

বীজরূপে তাঁহার হৃদিপদ্মে আসীন। তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। "মনসৈবেদমাপ্তব্যং" (কাঠকে ৪। ১১) জীব, তাঁহাকে আচার্য্য ও আগম-সংস্কৃত মনের দ্বারা লাভ করিয়া তাঁহা হইতে কিছুই গোপন করেন না। এখানে এই সংস্কৃত মনের অর্থ কর্তৃত্বঅভিনিবেশ-পরিত্যক্ত মানস। ইহাই শুদ্ধচিত্ত।

১১। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো-
জ্যোতিরিবাধূমকঃ।

ঐ ১৩ শ্রু।

এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের প্রকাশ ধূমশূন্য জ্যোতির ন্যায় নির্ম্মল। "এবংলক্ষিত হৃদয়ে যোগিভিঃ"। (শাঃ ভাঃ) তিনি যোগীর হৃদয়ে এইরূপ নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপে দৃষ্ট হন। হৃদয়-যোগে এই ব্রহ্মদর্শন বন্ধোপাসনার ব্যঞ্জক। এখানে যোগী শব্দে ব্রহ্মোপাসক। "তৎপ্রকৃতং ব্রহ্ম" শাঃ ভাঃ) তিনি প্রকৃত ব্রহ্ম, আত্মা, নির্গুণ। সুতরাং এ উপাসনা নির্গুণ ও জ্ঞানলক্ষণা। এই অধূমক ব্রহ্মজ্যোতিঃ, জাগ্রতাদি অবস্থা ত্রিতয়ের অতিক্রান্ত অপরি-লুপ্ত জাগ্রত চৈতন্যের ব্যঞ্জক।

১২। তস্মিতিব্রহ্মসর্ব্বেঽস্মৈ
দেবাবলিমাহরন্তি।
মধ্যেবামন মাসীনং
বিশ্বেদেবা উপাসতে॥

ব্রাঃ ধঃ ১০অঃ ১শ্রু।

ওঙ্কার উপাস্যলক্ষণ ব্রহ্মের নাম। সকল দেবতা ইঁহার "বলি" পূজা আহরণ করিতে-ছেন। ইনি হৃদয় মধ্যে "বামন" সম্ভজনীয় উপাসনীয়রূপে আসীন। ইন্দ্রিয়াধীপ বিশ্ব-দেবগণ (অর্থাৎ সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্রাদি) দেহমন্দিরে তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। ইনি মনুষ্যের হৃদয় মধ্যেই বিরাজিত। অতএব জীবই প্রধান উপাসক।

১৩। উৰ্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি। মধ্যেবামনমাসীনংবিশ্বেদেবা উপাসতে। কাঠকে ৫ ব। ৩ শ্রুতি। "আত্মনঃ স্বরূপাধিগমে লিঙ্গমুচ্যতে। ঊৰ্দ্ধং হৃদয়াৎ প্রাণং প্রাণবৃত্তিং বায়ুং উন্নয়তি গময়তি, অপানং প্রত্যক্অধঃ অস্যতি ক্ষিপতি। মধ্যে হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশে আসীনং বামনং সম্ভজনীয়ং সর্ব্বেবিশ্বেদেবাঃ চক্ষুরাদয়োরূপাদিবিজ্ঞান বলিমুপহারন্তোবিশ-ইবরাজানং উপাসতে। (শাঃ ভাঃ)।

পরমত্মার স্বরূপ বোধার্থ এই সকল ঐশ্বর্য্য উক্ত হইতেছে। তিনি জীবের হৃদয়স্থ হইয়া তথা হইতে জীবশরীরস্থ প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধে চালনা করেন, অপানবায়ুকে অধোতে নিক্ষেপ করেন। শরীরের মধ্যে জীবের হৃদয়াকাশে আসীন এই যে বামন (সম্ভজনীয় অর্থাৎ উপা-সনীয়) পুরুষ তাঁহাকে বিশ্বদেবগণ অর্থাৎ রূপরসাদিবিজ্ঞানস্বরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়বিষয় অর্পণদ্বারা পূজা উপহার দিতে-ছেন, উপাসনা করিতেছেন, প্রজারা যেমন রাজসেবা করে তদ্বৎ। এই সকল প্রাণবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্বতোসিদ্ধ নহে। কিন্তু সেই পরমাত্মার শাসনাধীন ও অজ্ঞাত উপাসক। জীবই তাঁহার সজ্ঞান উপাসক।

১৪। অন্তর্য্যাম্যধিদৈবতভাবে উপাসনার ব্যঞ্জক বিস্তর শ্রুতি আছে। সে সমস্ত দর্শান বাহুল্য। কেবল কতিপয় প্রচলিত শ্রুতির সংক্ষেপউক্তি মাত্র করিতেছি। যাঁহাদের শ্রুতিপাঠ আছে, তাঁহারা মদীয় উক্ত এই বর্ত্ত-মান প্রকরণে তাহার অর্থসঙ্গতি বুঝিতে পারিবেন। "ব্রহ্মপুরে হ্যেষব্যোম্যাত্মা প্রতি-

ষ্ঠিতঃ। ইত্যাদি। ২ মুঃ ২খঃ ৭।" ব্রহ্মণঃ পুরং হৃদয়পুণ্ডরীকং। তস্মিন্ ব্যোম্নি আকাশে হি এষঃআত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। মানবের হৃদয় আকাশই ব্রহ্মপুর। সেই আকাশে পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিত। শমদমধ্যানবৈরাগ্য হইতে উদ্ভূত শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশজনিত জ্ঞানযোগে ধীরেরা তাঁহাকে দর্শন করেন "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

১৫। হিরণ্ময়েপরেকোষেবিরজংব্রহ্মনিষ্কলং। ঐ ৯॥ হিরণ্ময়ে জ্যোতির্ম্ময়ে বিজ্ঞানপ্রকাশে পরেকোষে কোষইবাসেঃ বিরজং অবিদ্যাদিদোষরজমলবর্জ্জিতং ব্রহ্ম নিষ্কলং নিরবয়বং।" হৃদয়ের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় পরমকোষে নির্ম্মল নিষ্কল পরব্রহ্ম স্থিতি করিতেছেন। আত্মবিদেরা তাঁহাকে জানেন।

১৬। সমানেবৃক্ষে- * * -জুষ্টংযদাপশ্যতি ইত্যাদি। ৩ মুঃ ১খঃ ২শ্র। "যথোক্ত শরীরে পুরুষঃ ভোক্তাজীবঃ * * জুষ্টং সেবিতং যদা যস্মিন্ কালে পশ্যতি ধ্যায়মানঃ অন্য ঈশং বীতশোকঃ ভবতি। এই শরীরমধ্যে জীব যখন স্বীয় উপাস্য ঈশ্বরকে ধ্যানযোগে দর্শন করেন, তখন তিনি বীতশোক হন। এস্থানে "জুষ্টং সেবিত শব্দ এবং "ধ্যায়মানঃ" শব্দ উপাসনাবোধক। বিশেষ তাৎপর্য্য নিম্নে দ্রষ্টব্য।

১৭। যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। ঐ ৩ শ্র। যদা যস্মিন্‌কালে পশ্যঃ পশ্যতীতি যঃ সঃ বিদ্বান্ সাধক ইত্যর্থঃ পশ্যতে পশ্যতি (ধ্যায়মানঃ বৃক্ষোপাধিলক্ষণাদ্বিলক্ষণমীশমসংসারিণং) রুক্মবর্ণং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবং কর্ত্তারং সর্ব্বস্ত জগতঃ ঈশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা সঃ বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বন্ধনভূতে কর্ম্মণী বিধূয় নিরঞ্জনঃ নির্লেপো বিগতঃ ক্লেশঃ পরমং প্রকৃষ্টং সাম্যং অদ্বয়লক্ষণং উপৈতি প্রপদ্যতে। (শাঃ ভাঃ) যৎকালে বিদ্বান্‌সাধক দেহরূপ বৃক্ষ উপাধিলক্ষণ হইতে বিলক্ষণ সংসারধর্ম্মাতীত স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাব স্বপ্রকাশ সকল জগতের কর্ত্তা ব্রহ্মযোনি পুরুষকে ধ্যানযুক্ত হইয়া দর্শন করেন, তৎকালে সেই বিদ্বান্‌সাধক বন্ধনভূতকর্ম্মরূপী পুণ্যপাপ হইতে বিধূত হইয়া নিরঞ্জন নির্লেপ বিগতক্লেশ অদ্বয়লক্ষণ পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন। এই ধ্যানযুক্ত হইয়া স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বভাব ব্রহ্মদর্শন লাভ করা সাধকের অভিমানলক্ষণ মানসিক কর্ত্তৃত্বের কার্য্য নহে। কিন্তু কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য ধ্যান, জ্ঞান, বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন সাধকের লক্ষণ। তাদৃশ ধ্যানজ্ঞানপরায়ণ উপাসকের অন্তঃকরণে স্বপ্রকাশ বহ্মাত্মা প্রকাশিত হন। অন্যথা তিনি জীবের মানসকর্ত্তৃত্বের অগোচর। মনোবুদ্ধিইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব অভিমানশূন্য না হইলে অকর্ত্তাত্মক ধ্যানাবস্থা জন্মে না। কিন্তু সেরূপ ধ্যানাবস্থায় সিদ্ধিসম্পন্ন হইলেই সাধকের হৃদয়ে এই দেহমধ্যেই ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। ঠিক সেই প্রকার যেমন আততনেত্রে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু দর্শনরূপ যে অভিমানাত্মিকা ক্রিয়া তাহার সেটি গুণ নহে। সেগুণটি সূর্য্যেরই স্বয়ংপ্রকাশধর্ম্ম। অতএব এই যে সাধনা ইহাই নিরঞ্জন নিরবয়ব ব্রহ্মের হৃদয়াবলম্বিত প্রত্যক্ষ উপাসনা, আর তাহার ফল নিরঞ্জন সাম্য। এরূপ উপাসনায় সাধকের যজমানত্ব ও মানস-

ব্যাপাররূপ সে কর্তৃত্ব নাই, যাহার অগোচর বলিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বশাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হয়েন।

১৮। শান্তোদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি। ব্রাঃ ধঃ ১৬ অঃ ১। 'শান্তঃ' ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ উপশান্তঃ 'দান্তঃ' যুক্তমনা।'উপরতঃ' বিনির্ম্মুক্তঃ'তিতিক্ষুঃ' দ্বন্দসহিষ্ণুঃ একাগ্ররূপেণ 'সমাহিতঃভূত্বা' 'আত্মনি' জীবাত্মনি 'এব' 'আত্মানং' পরমাত্মানং স্বয়ম্ভুবং পশ্যতি ব্রহ্মবিৎ। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দৃষ্টি করেন। এই শ্রুতিটি আত্মার আত্মারূপ পরমাত্মার অন্তর্যামিত্ববোধক এবং ইহার শান্ত দান্ত প্রভৃতি পদসকল চিত্তশুদ্ধির এবং অভিমানলক্ষণবর্জ্জিত সাধনার ব্যঞ্জক।

চতুর্থতঃ। শ্রুতিবেদান্ত প্রতিপাদ্য নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলনরূপী উপাসনা।

ইহা পঞ্চদশীশাস্ত্রে নির্গুণব্রহ্মোপাসনা সংজ্ঞায় উক্ত হইয়াছে। ইহা পরোক্ষলক্ষণবিশিষ্ট, কিন্তু প্রত্যক্ষব্রহ্মাত্মজ্ঞানে আরোহণের নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের সম্প্রদায়ানুবর্ত্তিত সোপানরূপে উক্ত হইয়াছে। বন্ধেতে জীবের আত্মজ্ঞানই মোক্ষ। আর দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিতে যে আত্মা বলিয়া বোধ তাহা অবিদ্যাবন্ধন। বক্ষ্যমান ব্রহ্মতত্ত্বাবলম্বিত নির্গুণোপাসনাদ্বারা সাধক আত্মগ্রহণে বিচারক্ষম ও সুপটু হয়েন, এই নিমিত্ত এই পরমোপাসনার ব্যবস্থা। ইহা সম্পূর্ণরূপে শ্রুতিবেদান্তসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে পঞ্চদশীশাস্ত্রের ধ্যানদীপ হইতে কতিপয় বচন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১। দেহাদ্যাত্মত্ব বিভ্রান্তৌ
জাগ্রত্যাং ন হঠাৎ পুমান্।
ব্রহ্মাত্মত্বেন বিজ্ঞাতুং
ক্ষমতে মন্দধীস্ততঃ॥ ২১

সামান্য লোকের বুদ্ধিতে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আদিতে আত্মজ্ঞানরূপ ভ্রম জাগ্রত থাকাতে, মন্দবুদ্ধিপ্রযুক্ত পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ আত্মারূপে গ্রহণ করিতে তাহাদের সহসা ক্ষমতা হয় না।

২। অত্যন্ত বুদ্ধিমান্দ্যাদ্বা-
সামগ্র্যাবাপ্যসম্ভবাৎ।
যো বিচারং ন লভতে
ব্রহ্মোপাসীতসোনিশং॥ ৫৪

কিন্তু বুদ্ধিমান্দ্যপ্রযুক্তই হউক বা চিত্তশুদ্ধির অভাববশতই হউক যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ববিচারে অসমর্থ হয় তাহার নিরন্তর পরোক্ষরূপে পরব্রহ্মের উপাসনা করা অতি কর্ত্তব্য।

৩। নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য
নহ্যুপাস্তেরসম্ভবঃ।
সগুণী ব্রহ্মণীবাত্র-
প্রত্যয়াবৃত্তিসম্ভবাৎ॥ ৫৫

নির্গুণপরব্রহ্মতত্ত্বের পরোক্ষরূপে উপাসনা করা অসম্ভব নহে। যেমন সগুণোপাসনাতে অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহ হয় তদ্রূপ ইহাতেও প্রত্যয়ের আবৃত্তি সম্ভব হয়।

৪। অবাংমনসগম্যন্ত-
ন্নোপাস্যমিতি চেত্তদা।
অবাংমনসগম্যস্য
বেদনঞ্চ ন সম্ভবেৎ॥ ৫৬

যদি বল, যিনি বাক্যমনের অগোচর, পরোক্ষরূপে তাঁহার উপাসনা কি প্রকার করিব? ইহার উত্তর এই যে, তবে বাক্যমনের অগোচর সেই পরব্রহ্মের অপরোক্ষ

জ্ঞানও সম্ভব হয় না। অর্থাৎ উভয় পক্ষেই সে দোষ সমান।

৫। বাগাদ্যগোচরাকার-
মিত্যেবং যদিবেত্ত্যসৌ।
বাগাদ্যগোচরাকার-
মিত্যুপাসীত নো কুতঃ॥ ৫৭

যদি বাক্যমনের অগোচররূপে তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হইলে তবে তদ্রূপে তাঁহার পরোক্ষ উপাসনা কেন না কর?

৬। কা তে ভক্তিরুপাস্তৌ চেৎ
কস্তেদ্বেষস্তদীরয়।
মানাভাবো নবাচ্যাস্তাং
বহুশ্রুতিষু দর্শনাৎ॥ ৬২

যদি বল উপাসনাতে তোমার এত ভক্তি কেন? ঐ কথায় আমি বলি, তাহাতে তোমারই বা এত দ্বেষ কেন? তাহা বল। এই নির্গুণ পরব্রহ্মের পরোক্ষ-উপাসনার প্রমাণের অভাব আছে, তাহাও বলিতে পার না। কেননা বহু শ্রুতিতে তাহার নিদর্শন আছে।

৭। পামরাণাং ব্যবহৃতে-
র্বরং কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠিতিঃ।
ততোপি সগুণোপাস্তি-
র্নির্গুণোপাসনং ততঃ॥ ১২০

ইতর অজ্ঞানিদিগের ব্যবহার অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা বেদবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান শ্রেয়ঃ, এবং তাহা হইতেও সগুণোপাসনা শ্রেষ্ঠ, আর সর্ব্বাপেক্ষা নির্গুণ-উপাসনা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ।

৮। যাবদ্বিজ্ঞানসামীপ্যং
তাবৎ শ্রৈষ্ঠং বিবর্দ্ধতে।
ব্রহ্মজ্ঞানায়তে সাক্ষাৎ
নির্গুণোপাসনং শনৈঃ॥ ১২২

যাবৎ জ্ঞানের নিকটবর্ত্তী না হওয়া যায় তাবৎ পর্য্যন্ত নির্গুণোপাসকের শ্রেষ্ঠতার উন্নতি হইতে থাকে। কেননা নির্গুণোপাসনাই ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হয়।

৯। উপাসনস্যসামর্থ্যাৎ
বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ।
নান্যঃ পন্থা ইতিহ্যেত-
চ্ছাস্ত্রং নেব বিরুদ্ধতে॥ ১৪২

উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ মুক্তির কারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব "তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাবিদ্যতেঽয়নায়" কেবল তাঁহাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুস্রোত অতিক্রম করিতে পারেন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য পথ নাই। এই যে বেদবাক্য ইহার সহিত নির্গুণোপাসনার কোন বিরোধ রহিল না।

১০। অস্তিব্রহ্মেতিসামান্য-
জ্ঞানমত্রপরোক্ষধীঃ॥ ১৫
বেদ্যঞ্চেৎ লক্ষণাবৃত্ত্যা
লক্ষিতং সমুপাস্যতাং॥ ৫৮

এক্ষণে পরোক্ষজ্ঞানযোগে যে প্রকারে সেই পরব্রহ্মের নির্গুণোপাসনা করিতে হইবে, এই দুইটি শ্লোকার্দ্ধে তাহার আভাস দিতেছেন। প্রথমতঃ "শাস্ত্রাৎ সত্যজ্ঞানাদিবাক্যজাতাৎ ব্রহ্মাস্তীত্যেবং সামান্যাকারেণ জায়মানং জ্ঞানমত্রাস্যামুপাসনায়াং পরোক্ষধীঃ পরোক্ষজ্ঞানং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ।" (পঃ দঃ টীকা) শাস্ত্রাবলম্বনদ্বারা অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বেদবচন অবলম্বনপূর্ব্বক জগৎকারণ পরব্রহ্ম আছেন, এই প্রকার

সামান্য জ্ঞান ধারণ করিয়া নির্গুণোপাসনা করিবেক। এই সামান্য ব্রহ্মাস্তিত্বজ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞান বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ লক্ষণা দ্বারা লক্ষিত করিয়া তাঁহাকে পরোক্ষরূপে উপাসনা করিবেক। অর্থাৎ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে * * তদ্ব্রহ্ম * * আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি লক্ষণদ্বারা লক্ষিত করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেক। পরব্রহ্মতত্ত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক পরোক্ষ ব্রহ্মোপাসনার এবং পরোক্ষ-ব্রহ্মজ্ঞানের এই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট স্বরূপ। ইতিপূর্ব্বে তটস্থ-লক্ষণ প্রকরণে ইহার সামান্য উল্লেখ করা গিয়াছে। উপরি উক্ত শ্রুতিবাক্য ব্যতীত আরো বিস্তর শ্রুতি আছে, যাহার পাঠ আলোচনা অর্থচিন্তা দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভ এবং উপাসনার দৃঢ়তা হইতে পারে। অতএব সমগ্র উপনিষৎ ও বেদান্তপাঠই এই ব্রহ্মোপাসনার এবং ইহার পরিণামস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের মহোপকারী। মন্ত্রপাঠের ন্যায় উপনিষৎ পাঠে ব্রহ্মোপাসনা হয় না, কিন্তু হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক তদুত্থিত জ্ঞানধারণাপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তাহার আবৃত্তি প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মজিজ্ঞাসু চিত্তশুদ্ধিসম্পন্ন সাধুদিগের সঙ্গ আবশ্যক। (এই চতুর্থ প্রকরণটি পরোবর্ত্তী সপ্তম প্রকরণের সহ অন্বিত। অতএব সূত্র-প্রমাণ তথায় দ্রষ্টব্য)।

হিন্দুজাতির কামান বন্দুক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ততো নালীকনারাচৈ-
র্ভল্লৈঃ শক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ।
পত্যয়ন দানবেন্দ্রা মাং
ক্রুদ্ধাস্তীব্রপরাক্রমাঃ॥

২০ ১৭৩-অ বনপর্ব্ব।

অনন্তর তীব্রপরাক্রম দানব সকল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে নালীক, নারাচ, ভল্ল, শক্তি, ঋষ্টি ও তোমরপ্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল।

অবশ্য আমরা বেদাদি গ্রন্থে নালীকাস্ত্রের সমুল্লেখ দেখিতে পাই নাই মনু যে কর্ণী অস্ত্রের নাম লইয়াছেন, বেদে উহার নির্দ্দেশও দৃষ্ট হয় না, কেবল "কর্ণকাবতী" বিশেষণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহাতেও কিন্তু কোন ক্ষতি দেখা যায় না, কেননা ইহা প্রাদেশিকতা মাত্র। যে যে মন্ত্রে প্রদেশভেদে নালীক প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ ছিল, সেই সকল মন্ত্রের বিলোপ ঘটিয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। বেদে

না থাকিলে বশিষ্ঠের ধনুর্ব্বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত উহার নাম লইতে পারিতেন না। কিন্তু বেদে—বজ্র, কুলিশ, অশনি, শতঘ্নী, শর্ম্ম, সূর্ম্মী ও স্বধিতি প্রভৃতি শব্দের ভূরিশঃ সমুল্লেখ রহিয়াছে, উহার প্রত্যেকটিই কামান ও বন্দুকার্থবাচী। বজ্র শব্দ কি কুত্রাপি বিদ্যুৎপাত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই? রামায়ণ-মহাভারতে ও পুরাণের অনেক স্থলে যে না হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু বেদের কুত্রাপি হয় নাই। রামায়ণ বলিতেছেন যে—

দেবাসুরবিমর্দ্দেষু
বজ্রাশনিকৃতব্রণম্।
৭-৩১ সর্গ-অরণ্যকাণ্ড।

অর্থাৎ যখন দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে বজ্র ও অশনি লইয়া নিযুদ্ধ হয়, তখন ঐ সকল অস্ত্রাঘাতে যাহার দেহে ব্রণ বা ক্ষত হইয়াছিল, সুতরাং এ বজ্র বিদ্যুৎপাত নহে। রামায়ণ স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

বজ্রমস্ত্রং নরশ্রেষ্ঠ
শৈবং শূলবত্তং তথা। ৬
অশনী দ্বে প্রযচ্ছামি
শুষ্কার্দ্রে রঘুনন্দন॥ ৯-২৭-সর্গ
বালকাণ্ড।

বিশ্বামিত্র বলিতেছেন যে, হে রঘুনন্দন! আমি তোমাকে বজ্রাস্ত্র, শৈব শূল, শুষ্ক ও আর্দ্রসংজ্ঞক দুইটি অশনি প্রদান করিতেছি। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, যাহা দানের যোগ্য ও মনুষ্যের ব্যবহার্য্য অস্ত্র, তাহা মেঘজ্যোতিঃ বা বিদ্যুৎ হইতে পারে না। তাহা লৌহময় কামান। অর্জ্জুন বলিতেছেন—

বজ্রাদীনি তথাস্ত্রাণি শক্রাদহমবাপ্তবান্।

আমি ইন্দ্রের নিকট হইতে বজ্রপ্রভৃতি অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছি। তবে ডাক্তার রামদাস সেন কেন এরূপ বলিতেছেন? "যাহা অমুক্ত অর্থাৎ যাহা ফেলিয়া বা ছুড়িয়া মারিতে হয় না, সেই সকল অমুক্ত অস্ত্রের বর্ণনা এক্ষণে শ্রবণ করুন। অমুক্ত অস্ত্রের মধ্যে বজ্রই সর্ব্বপ্রধান। বজ্র কি? তাহা উত্তমরূপ বুঝা যায় না। সুতরাং বুঝানও যায় না।"

৫৭ পৃষ্ঠা ভারতরহস্য।

হাঁ, তিনি এইরূপ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা উহা সমূলক ও সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। যাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, বজ্র, লৌহময় কামান, এবং উহার গোলা সুদূরপাতী।

কেবল রামদাস বাবু কেন? শুক্রনীতি ও মনুর টীকাকারগণও "বৃহন্নালিক ও অগ্নি জ্বলিততেজন কর্ণীই যে বজ্র" তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই। বাজ পড়িয়া মানুষ মরে, ঘর পোড়ে ও গাছ ভাঙ্গে, কাজেই সে বাজকে তাঁহারা কেমন করিয়া মনুষ্যের হাতে দিবেন। কিন্তু বেদ তাহা দিয়াছেন। ঋগ্বেদ একত্র বলিতেছেন—

ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ। ২-৭সূ- ম।
ইন্দ্রস্য বজ্র আয়সঃ।
৩-৮৫ সূ-৮ম।
অভবং বজ্রমায়সম্।
৮-১০১ সূ-১০ম।
ইন্দ্রস্য বজ্রঃ শ্নথিতা হিরণ্যয়ঃ।
২-৫৭ সূ-১ম।

ইন্দ্রের বজ্র লৌহময় (নিঘণ্টুতে হিরণ্যশব্দ স্বর্ণ ও লৌহার্থবাচী), উহার প্রহারে লোক নিহত হইয়া থাকে। স্থানান্তরে বলিতেছেন—

অহন্ অহিং পর্ব্বতে শিশ্রিয়াণং
ত্বষ্টা অস্মৈ বজ্রং স্বর্য্যং ততক্ষ।

২-৩২ সূ-১ম।

তত্র সায়ণভাষ্য—পর্ব্বতে শিশ্রিয়াণং আশ্রিতং অহিং মেঘং অহন্ হতবান্ অস্মৈ ইন্দ্রায় স্বর্য্যং সুষ্ঠু প্রেরণীয়ং ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মা বজ্রং ততক্ষ তনূকৃতবান।

দত্তজানুবাদ—ইন্দ্র পর্ব্বতাশ্রিত অহিকে হনন করিয়াছিলেন। ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ভাষ্য ও অনুবাদে অহি অর্থ মেঘ করা হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা ঠিক হয় নাই। দেবতারা বৃত্রকে "অহি" বা সর্পবৎ ক্রূর বলিয়াই বর্ণনা করিতেন। বজ্রাহত হইয়া বৃত্র আপনার বাসস্থান বরুণালয় সমুদ্র বা অপোগস্থানে পলাইয়া যান।

যাহা হউক, যাহা স্বর্য্য বা সুদূরপাতী, তাহা যে অমুক্ত শস্ত্র নহে, পরন্তু অন্বর্থনামা অস্ত্রই তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। উহা আবার দুই প্রকার ছিল। এক প্রকার হস্তধারণীয়, উহাই বন্দুক, অন্য প্রকার শকটবাহ্য, উহাই কামানস্থানীয় বটে। যদাহ ঋগ্বেদঃ—

ইন্দ্র! বাহ্বোর্বজ্রমায়সং মধারয়ঃ।

৮–৫২সূ–১ম।

ইন্দ্র! বজ্রং ভরিতা বাহ্বোর্ধাঃ।

২—৬৩সূ—১ম।

দধে হস্তয়ো র্বজ্রমায়সং। ৪–৮১সূ–১ম।

বজ্রমেকো বিভর্ত্তি হস্তে। ৪-২৯সূ-৮ম।

যস্য তে হস্তা হিরণ্যয়ং বজ্রমীয়তুঃ।

৩—৫৭সূ—৮ম।

যে পবয়ো অরথাঃ। ৫—৩১সূ—৫ম।

হে ইন্দ্র! তুমি তোমার দুই হস্তে বজ্র ধারণ করিয়া থাক। ইন্দ্র! তুমি তোমার হস্তে অস্ত্রের বিদারণকারী বজ্র ধারণ করিয়াছিলে। তুমি দুই হস্তে লৌহময় বজ্র ধারণ করিয়া থাক। তুমি হাতে একটি বজ্র ধারণ কর। হে ইন্দ্র! যে তোমার দুই হস্ত লৌহময় বজ্র গ্রহণ করিয়াছিল। হে ইন্দ্র তোমার যে পবি বা বজ্র সকল অরথ অর্থাৎ অরথবাহ্য। স্থলান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে—

ত্রয়ঃ পবয়ো মধুবাহনে রথে।

১-৩৪সূ-১ম।

পব্যা রথানা মদ্রিং

ভিন্দন্তি ওজসা। ৯ ৫২সূ-৫ম।

খাদ্যদ্রব্যবাহী রথের উপরে তিনটি বজ্র রক্ষিত ছিল (লুণ্ঠন ভয়ে)। সেই মরুদ্গণ রথে আরোহিত পবি বা বজ্র প্রহারদ্বারা পর্ব্বতভেদ করিয়া থাকেন। তথাহি—

স্বধিতিবান্ পব্যা রথস্য

জঙ্ঘনন্ত ভূমা। ২—৮৮সূ—১ম।

মরুদ্গণ বজ্রধারী, তাঁহারা শকটবাহিত পবি বা বজ্রদ্বারা বহু অরাতিসৈন্য বধ করিয়াছিলেন।

অনেকে শুক্রনীতির শকটবাহ্য মহানালীক ও অগ্নিচূর্ণের কথা পাঠ করিয়া উহা একালের প্রক্ষিপ্ত রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন বেদও শকটবাহিত বজ্রের নিকাশ দিতেছেন, তখন তাঁহারা শুক্রাচার্য্যকে অবশ্যই ক্ষমা করিতে পারেন। স্থলান্তরে বলা হইতেছে যে—

প্রেষায়স্তে বাং পবয়ঃ হিরণ্যয়ে

রথে দস্রা হিরণ্যয়ে। ৩—১৩৯সূ—১ম

হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের লৌহময় শকটস্থিত লৌহময় পবি বা বজ্র সকল গোলা বর্ষণ করিতেছে।

অবশ্য সায়ণ ও দেবরাজ যজ্বা পবি অর্থ চক্রনেমিও করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে করি তাহা যেন ঠিক হয় নাই। যজ্বা ৯-৫২সূ-৫ম মন্ত্রটি নিগমস্বরূপ অধ্যাহৃত করিয়াছেন, কিন্তু এখানেও পবি অর্থ চক্রনেমি হওয়া অসম্ভব। তথাহি—

আ বাম্ রথো রোদসী বদ্ধধানঃ
হিরণ্যয়ো বৃষভির্যাত্ব অশ্বৈঃ।
ঘৃতবর্ত্তনিঃ পবিভিরুচাসঃ
ইষাং বোঢা নৃপতির্বাজিনীবান॥

১—৬৯সূ—৭ম।

হে অশ্বিদ্বয়। তোমাদিগের লৌহময় রথ সুদৃঢ় অশ্বদ্বারা বাহিত হইয়া থাকে। উহা স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে তুষারধবল পথ দিয়া যাতায়াত করে। উহার উপর কামান সকল সজ্জিত আছে। ঐ সকল রথে তণ্ডুলগোধূমাদি বোঝাই থাকে, রাজারা উহা নির্বিঘ্নে পাইয়া উহা দ্বারা অন্নবান্ হইয়া থাকেন।

তাৎপর্য্য এই যে, পথে দস্যুরা রসদ লুটিয়া নিত, তাই অশ্বিদ্বয় কামান সজ্জিত রথে রাজাদিগের রসদ সরবরাহ করিতেন। সায়ণ ও দত্তজ মহাশয়ের ব্যাখ্যা অসঙ্গত বোধে আমরা এই অভিনব ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বেদ স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

ত্বং মায়সং প্রতি বর্ত্তয়ো গো
র্দিবো অশ্মান মুপনীতমৃভ্বা।
কুৎসায় যত্র পুরুহূত বন্বন্
শুষ্ণ মনন্তৈঃ পরিয়াসি বধৈঃ॥

৯—১২১সূ—১ম।

হে ইন্দ্র। তুমি কুৎসরাজের রক্ষার জন্য (গো র্দিবঃ) গো আখ্যাধারী আদি স্বর্গ হইতে পার্ব্বত্য পথে ঋভুদিগের দ্বারা লৌহময় বজ্র পাঠাইয়া শুষ্ণ অসুরের বধের জন্য আগমন করিয়াছিলে। তোমার সহিত তখন বধসাধক বহুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র ছিল। স্থলান্তরে বিবৃত হইয়াছে যে—

যৎ বৃত্রং তব চাশনিং
বজ্রেণ সমযোধয়ঃ।
অহিং ইন্দ্র জিঘাংসতঃ
দিবি তে বদ্বধে শবঃ॥
অর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং।

১৩-৮০সূ-১ম।

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে ইন্দ্র। যৎ যদা বৃত্রং তব হননার্থং তেন স্বষ্টাম্ অশনিং বজ্রং বজ্রেণ সমযোধয়ঃ সম্যক্ প্রাহার্ষীঃ তদানী অহিং আগচ্ছন্তং হন্তারং বৃত্রং জিঘাংসতো হন্তুমিচ্ছতঃ তে তব শবোবলং দিবি বদ্বধে বদ্ধং অন্তরিক্ষং ব্যাপ্য মাসীৎ।

দত্তজানুবাদ—হে ইন্দ্র যখন তুমি বৃত্রকে প্রহার করিয়াছিলে ও তাহার বজ্রকে প্রহার করিয়াছিলে, তখন তুমি অহির বধে কৃতসঙ্কল্প হইলে তোমার বল আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তুমি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলে।

হে ইন্দ্র। যখন তুমি বৃত্রের বধেচ্ছু হইয়া তাহার সহিত সমভাবে বজ্রে বজ্রে যুদ্ধ করিয়াছিলে, তখন তোমার যশঃ সমুদয় স্বর্লোকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তুমি স্বর্গরাজ্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলে।

এখানে বেদমন্ত্র উভয়পক্ষে কামানে কামানে যুদ্ধের কথা বলিতেছেন, সুতরাং এ বজ্র বিদ্যুৎ বা ঠাঁটা হইতে পারে না। বেদ স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

বজ্রং কৃণুধ্বং বর্ম্ম সীবাধ্বং
পুরঃ কৃণুধ্ব মায়সীঃ॥ ৮-১০১-১০ম

তোমরা বজ্র নির্ম্মাণ কর, বর্ম্ম সেলাই কর ও লৌহময়ী পুরী নির্ম্মাণ কর। তথাহি—

মহ্যং ত্বষ্টা বজ্র মতক্ষৎ।৩

যে বজ্রং যুধায় অকৃণ্বত।৬- ৮সূ ১০ম

ত্বষ্টা আমার নিমিত্ত বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমার যুদ্ধের জন্য উহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

অস্মৈ ত্বষ্টা অতক্ষং বজ্রং স্বপস্তমং

স্বর্য্যং রণায় বৃত্রস্ত। ৬ ৬১সূ-১ম*

বজ্রং চ চক্রে সুহনায় দস্যবে।

৭-১০৫সূ-১০ম।

ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য বৃত্রসহ যুদ্ধার্থ সুদূরপাতী সুনির্ম্মিত বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। * ত্বষ্টা দস্যুগণকে হনন করিবার জন্যই ইন্দ্রোদেশে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পুরঃ অভেং বজ্রেণ।

১১-৩৩সূ-১ম।

হত্বী দস্যান্ পুর আয়সীর্নিতারিং।

৮-২০সূ ২ম।

ইন্দ্র বজ্র প্রহারদ্বারা অসুরগণের পুরী সকল ভগ্ন করিয়াছিলেন, তিনি দস্যুগণকে বজ্রপ্রহারে বধ করিয়া তাহাদিগের লৌহময়ী পুরী সকলও উড়াইয়া দিয়াছিলেন। বজ্রের আকার কিরূপ ছিল?

ত্বষ্টা যং বজ্রং সুকৃতং

হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টিং। ৯ ৮৫সূ-১ম।

বৃত্রস্য অভিনং শিরো

বজ্রেণ শতপর্ব্বণা। ২-৬৫সূ-৮ম।

অধি সানৌ নিজিঘ্নতে

বজ্রেণ শতপর্ব্বণা। ৬-৮০সূ-.ম।

ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য যে সহস্রভৃষ্টি অর্থাৎ বহু গোলোকপাতসমর্থ লৌহময় বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি তদ্দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন। উহা শতপর্ব্ববিশিষ্ট। তিনি সেই শতপর্ব্ব বজ্রদ্বারা পর্ব্বতের সানুদেশে আঘাত করিয়াছিলেন।

ত্বং পর্ব্বতং বজ্রেণ পর্ব্বশঃ

চকর্ত্তিথ। ৬-৫৭সূ-১ম।

স প্রাচীনান্ পর্ব্বতান্ দৃংহৎ

ওজসা অধরাচীনম্ অকরোৎ।

৫-১৭সূ-২ম।

ইন্দ্র! তুমি বজ্রপ্রহারদ্বারা পর্ব্বত সকলকে পর্ব্বে পর্ব্বে কাটিয়াছিলে। সেই ইন্দ্র সমুন্নত প্রাচীন পর্ব্বত সকল সবলে বজ্রপ্রহারে কাটিয়া খাট করিয়াছিলেন।

(স ইন্দ্রঃ প্রাচীনান্ ইতস্ততঃ প্রকর্ষেণ অঞ্চতো গচ্ছতঃ সপক্ষান্ পর্ব্বতান্ ওজসা বলেন দৃংহৎ পক্ষচ্ছেদং কৃত্বা ভূমৌ দৃঢ়ীচকার অচলান্ অকরোৎ—সায়ণঃ)।

গোত্রভিদং বজ্রবাহুং।

৬-১০৩সূ-১০ম।

তাই সকলে বলিত ইন্দ্র পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদ করিতেন। ফলতঃ তিনি কামান দাগিয়া পর্ব্বতের টিলা ভাঙ্গিয়া সমতল করতঃ উহাকে বাসোপযোগী করিতেন মাত্র।

বুঝা গেল যে বজ্র হস্তে ধারণীয়, অপিচ যে বজ্র রথবাহ্য, তাহা ঠাঁটা নহে। আর যাহা সুদূরপাতী তাহা অমুক্ত পরিভাষার বিষয়ীভূতও হইতে পারে না। বজ্র হইতে কি নিঃসৃত হইত? বেদ বলিতেছেন যে—

* ত্বষ্টা অস্মৈ ইন্দ্রায় বজ্রং বর্জক মাধুবং রণায় যুদ্ধার্থং তক্ষৎ। এই "বর্জক" কথাটী অপভ্রষ্ট।

ইন্দ্রস্য বজ্রং হিষন্তি সায়কং।

১১-৮৪-স্-১ম।

তত্র সায়ণঃ—সায়কং শত্রূণাং মস্তকারকং বজ্রং আয়ুধং হিষন্তি শত্রুষু প্রেরয়ন্তি।

ইন্দ্রের বজ্র শত্রুগণের উপর সায়ক বা নানা অস্ত্র পূর্ণ গোলক নিক্ষিপ্ত করিত। সায়ক ও বজ্র সমানাধিকরণ নহে। বজ্র হইতে সায়ক সকল যাইয়া শত্রুর উপরে পড়িত।

ইন্দ্রশ্চ সোম জাগ্রতং অস্যতম্

অশনিং যাতুমদ্ভ্যঃ। ২৫-১০৪-স্-৭ম।

হে ইন্দ্র, হে চন্দ্র, তোমরা জাগৃত হও, রাক্ষসদিগের উপরে অশনি নিক্ষেপ কর। তথাহি—

যজ্ঞৈরিষূঃ সংনমমানো অগ্নে

বাচা শল্যান্ অশনিভির্দিহানঃ।

অতিবিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্

প্রতীচো বাহূন্ প্রতি ভঙ্‌ধি এষাম্॥

৪-৮৭স্ ১০ম।

তত্র সায়ণভাষ্যং—হে অগ্নে! ত্বং যজ্ঞৈঃ অস্মদীয়ৈর্বলকরৈঃ যাগৈঃ বাচা অস্মদীয়য়া স্তুত্যা চ ইষূঃ বক্রান্ বাণান্ সংনমমানঃ সংনময়ন্ শল্যান্ তাসাং শল্যান্ অশনিভিঃ দীপ্তাভিঃ সংদিহানঃ তীক্ষ্ণীকুর্ব্বন্ তাভিরিষুভিঃ যাতুধানান্ রাক্ষসান্ হৃদয়ে বিধ্য ততএষাং সংবন্ধিনঃ প্রতীচঃ যুদ্ধায় প্রতিগতান্ বাহূন প্রতিভঙ্‌ধি প্রত্যামর্দ্দয়।

দত্তকানুবাদ—হে অগ্নি যজ্ঞদ্বারা বাণ গুলিকে নত করিয়া এবং বাণের অগ্রভাগ যন্ত্রদ্বারা সংযুক্ত করিয়া ঐ সকল অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসদিগের হৃদয়ে আঘাত কর, উহাদের পার্শ্বদ্বয়বর্ত্তী বাহু সকল ভঙ্গ করিয়া দেও।

ব্যাখ্যা ও অনুবাদ তৃপ্তিজনক নহে। মনে করি ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে। হে অগ্নে! তুমি বাণ সকল অগ্নি দ্বারা (যজ্ঞদ্বারা) নত ও শল্যগুলি মন্ত্রপূত করিয়া অশনিতে যোজনা করতঃ উহাদ্বারা রাক্ষসদিগের হৃদয় বিদ্ধ কর ও উহাদিগের অস্মৎপ্রতিকূল বাহু সকল ভাঙ্গিয়া ফেল। অথর্ব্ববেদ বলিতেছেন

ইন্দ্রস্য বজ্রো অপহন্তু রক্ষসঃ

আরাৎ বিসৃষ্টা ইষবঃ পতন্তু।

পথম খণ্ড ১০৯ পৃষ্ঠা।

ইন্দ্রের বজ্র রাক্ষসদিগকে বধ করুক। দূর হইতে নিক্ষিপ্ত ইষু সকল তাহাদিগের উপরে পতিত হউক।

ইষু কি? বজ্রের গোলকের মধ্যে প্রবেশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণপ্রভৃতি। একালের পাশ্চাত্য কামানের গোলার ভিতর যে প্রকার নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্র থাকে, তদ্রূপ হিন্দুগণের বজ্র-গোলকও অস্তঃশস্ত্র ছিল।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন প্রত্যেক বেদ-মন্ত্রেই ইহা বিবৃত রহিয়াছে যে, ইন্দ্রের বজ্র লৌহময়, যেমন "মহং ত্বষ্টা বজ্র মতক্ষং আয়সং (৩—৪৮স্—১০ম) তখন ইন্দ্র দধীচির অস্থি-নির্ম্মিত বজ্র ব্যবহার করিতেন, এ কিংবদন্তীর বহুল প্রচার হইল কেন? কেবল কিংবদন্তী নহে, বেদে ও মহাভারতে ঐরূপ ঐতিহ্যমূলক একটি মন্ত্র ও শ্লোকও রহিয়াছে—

ইন্দ্রো দধীচো অস্থভি-

র্বৃত্রাণি অপ্রতিষ্কুতঃ।

জঘান নবতীর্নব॥ ১৩-৮৪-১ম।

ইন্দ্র অথর্ব্বার পুত্র দধীচির অস্থিদ্বারা বৃত্রাসুরদিগকে নিরানব্বই বার আঘাত করিয়াছিলেন।

ঋষের্মানং করিষ্যামি
বজ্রং যস্যাস্থিসম্ভবং।
২০—৩৩অ, আদিপর্ব্ব।

যাঁহার অস্থিতে বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল, আমরা সেই দধীচি মুনির সম্মান করিব।

কিন্তু ইহা পৌরাণিক আখ্যায়িকামূলক। শাটায়নগণও এইরূপ বলিয়া থাকেন, উহার মূলেও কোন বিশেষ সত্য বিনিহিত নাই।

ফলতঃ অস্থি অগ্নিদাহ্য, উহাদ্বারা নিরানব্বই বার আওয়াজ হইতে পারে না। বজ্র সাধারণতঃ লৌহময়ই ছিল।

আচ্ছা, আমাদিগের প্রাচীনেরা*কোন্ কোন্ ধাতুর সাহায্যে গোলাগুলি নির্ম্মাণ করিয়া লইতেন? শাস্ত্রপাঠে প্রতীত হয়, তাঁহারা লৌহ ও সীসা উভয় ধাতুরই গোলক নির্ম্মাণ ও ব্যবহার করিতেন। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—

ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতি মস্য।
৩—৫২সূ—৬ম।

তত্র সায়ণঃ—ব্রহ্মদ্বিষে ব্রাহ্মণদ্বেষ্ট্রে তস্মৈ তপুষিং তাপকং হেতিং আয়ুধং অস্য ক্ষিপ প্রেরয়।

দত্তজানুবাদ—তুমি স্তোত্রবিদ্বেষীর প্রতি নিজ পীড়াদায়ক আয়ুধ ক্ষেপণ কর।

বলা বাহুল্য ভাষ্য ও অনুবাদের একটিও প্রকৃত তথ্যবাহী নহে। ব্রহ্ম অর্থ ব্রাহ্মণ ও বেদ দুই হইতে পারে। কিন্তু তপুষি অর্থ তাপজনক বা পীড়াদায়ক নহে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই—

তুমি বেদদ্বেষী বা ব্রাহ্মণদ্বেষ্টৃগণের প্রতি সীসকনির্ম্মিত অস্ত্র নিক্ষেপ কর। তপুষি শব্দের অর্থ সীসক,পরন্তু তাপক প্রভৃতি নহে। সংস্কৃত ত্রপু বা ত্রপুস্ শব্দের অর্থ সীসক—

নাগসীসকযোগেষ্ট-
বধ্রাণি ত্রপু পিচ্চটং। অমর

নাগ, সীসক, যোগেষ্ট, বধ্র, পিচ্চট ও ত্রপু এই ছয়টি শব্দ একার্থবাচী। ঐরূপ একটি ত্রপুস্ শব্দও আছে, উহারও অর্থ সীসক। তদ্দ্বারা নির্ম্মিত অস্ত্রের নাম (বা যে কোন বস্তুর নামই) ত্রাপুষ। উহার অপভ্রংশে তপুষি শব্দ বিরচিত। বেদমন্ত্র সকল অধিক স্থলেই অপভ্রংশবহুল। বেদ স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

তপুষা রক্ষসো দহ। ১৪-২৩সূ-৮ম।

তুমি সীসকদ্বারা রাক্ষসদিগকে দগ্ধ কর। স্থলান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে—

বিষেণ ভঙ্গুরাবতঃ
পতি স্ম রক্ষসো দহ।
অগ্নে তিগ্মেন শোচিষা
তপুরগ্রাভির্ঋষ্টিভিঃ॥
২৩—৮৭সূ—১০ম।

তত্র সায়ণভাষ্যং—হে অগ্নে ভঙ্গুরাবতো ভঞ্জনকর্ম্মযুক্তান রক্ষসো রাক্ষসান বিষেণ ব্যাপ্তেন তিগ্মেন শোচিষা তেজসা প্রতিদহ ভস্মীকুরু। তথা তপুরগ্রাভিঃ তপনশীলাগ্রাভিঃ ঋষ্টিভিঃ ঋষ্টয় আয়ুধবিশেষা স্তাভিঃ প্রতিদহ।

দত্তজানুবাদ—হে অগ্নি। বিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে বিষের দ্বারা, তীক্ষ্ণ শিখার দ্বারা এবং ঋষ্টিনামক উত্তপ্ত অস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ কর।

অস্মৎকৃত ব্যাখ্যা—হে অগ্নে! তুমি বিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে বিষদিগ্ধ উত্তপ্ত দীপ্যমান সীসকময় ঋষ্টিদ্বারা দগ্ধ কর। অথর্ব্ববেদে বিবৃত রহিয়াছে যে—

অতীব যো মরুতো মন্যতে নো,
ব্রহ্ম বা যো নিন্দিষৎ ক্রিয়মাণং।
তপূংষি তস্মৈ বৃজিনানি সন্তু,
ব্রহ্মদ্বিষং দ্যৌ রভি সন্তপাতি॥

১ম খণ্ড—২৫২পৃঃ।

তত্র সায়ণভাষ্যং—হে মরুত একোনপঞ্চাশং সংখ্যাকা গা দেবাঃ যঃ শত্রুঃ নঃ অস্মান অতীব অতিক্রান্ত ইব মন্যতে আত্মানং জানাতি যশ্চ শত্রুঃ ক্রিয়মাণম্ অস্মাভিরনুষ্ঠীয়মানং ব্রহ্ম মন্ত্রসাধ্যং কর্ম্ম নিন্দিষৎ নিন্দেৎ তস্মৈ উভয় বিষয়ে শত্রবে তপূংষি তাপকানি তেজাংসি আয়ুধানি বা বৃজিনানি বর্জকানি বাধকানি সন্তু। দ্যৌঃ আদিত্যঃ দ্যুস্থানত্বাৎ ব্রহ্মদ্বিষং মদীয়ং কর্ম্মদ্বিষন্তং শত্রুং অভিসন্তপাতি অভিতঃ সন্তপতু।

হে মরুদ্গণ! যাহারা আমাদিগকে অতীব শত্রু মনে করে, যাহারা আমাদিগের প্রণীত বেদের নিন্দা করে, আমাদিগের সীসকময় অস্ত্রকলাপ তাহার অমঙ্গলকর হউক, স্বর্গবাসীরা সেই বেদবিদ্বেষ্টাকে সর্ব্বতোভাবে সন্তাপ দান করুন। স্থলান্তরে বলা হইয়াছে—

যদি নো গাং হংসি
যদ্যশ্বং যদি পুরুষং।
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো
যথা নোসো অবীরহা॥ ঐ ৯৭ পৃঃ।

হে শত্রো! ত্বং নঃ অস্মাকং গাং যদি হংসি মারয়সি, তথা অশ্বং যদি হংসি, পুরুষং অস্মদীয়ং ভৃত্যাদিরূপং যদি হংসি তং অপকর্ত্তারং ত্বা ত্বাং সীসেন উক্ত মহিমোপেতেন বিধ্যামঃ তাড়য়ামঃ মারয়ামঃ।

হে শত্রো! যদি তুমি আমাদিগের গো, অশ্ব ও মনুষ্যের হিংসা কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে সীসের দ্বারা বিদ্ধ করিব। যাহাতে তুমি আর আমাদের পুত্রপৌত্রাদি কাহার হিংসা করিতে না পার।

এখন প্রবীণগণ ভাবিয়া দেখুন, এই সীসকময় দহনকারী নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র কি? ইহা সীসার গুলি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা বজ্র বা নালীকাস্ত্রযোগে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন দহনক্ষম হয়, তেমনই বেধনক্ষমও হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সীসারদ্বারা ছুরী, কাঁচি, কাস্তে, কোদাল, বল্লম, শুলফী ও খড়্গ প্রভৃতি কিছুই নির্ম্মিত হয় নাই ও হইতে পারে না। সুতরাং ইহা ও একালের সীসার গুলি একই বস্তু। একালের বুলেট নামক সীসকের গুলিসকল বিষাক্ত, তদ্রূপ সেকালেও ঐরূপ বিষাক্ত সীস নির্ম্মিত বন্দুকের গুলি ব্যবহৃত হইত। শুক্রনীতি বলিতেছেন যে—

গোলো লৌহময়ো গর্ভ-
গুটিকঃ কেবলোঽপি বা।
সীসস্য লঘুনালার্থে
হ্যন্যধাতুভবোঽপি বা॥ ২০৪

৪৩১—৭ম প্রকরণ।

লঘুনালীক বা বন্দুকের জন্য যে গুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহা সীসনির্ম্মিত, আর বৃহন্নালীক বা কামানের জন্য যে গোলা ব্যবহৃত হয়, তাহা লৌহনির্ম্মিত এবং উহার মধ্যে কতকগুলি আবার শূন্যগর্ভ ও ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলিপূর্ণ। ক্ষুদ্র নালীক বা বন্দুকের গুলি সীসক ভিন্ন অন্য ধাতুজও হইয়া থাকে।

সুতরাং যাঁহারা বলেন যে হিন্দুরা কামান বন্দুকের ব্যবহার জানিতেন না, চীনগণই সর্ব্বাগ্রে উহার উদ্ভাবন ও ব্যবহার করেন, তাঁহারা কত দূর ঐতিহ্যতত্ত্বজ্ঞ, তাহা প্রবী-

নেরাই ভাবিয়া দেখিবেন। ফলতঃ চীনগণ ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান, তাঁহারা যাহা ভারতে পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়াই চীনদেশে গমন করেন। তবে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা মহালোক-ক্ষয়কর উক্ত কামানবন্দুকের ব্যবহার পরিত্যাগ করেন, বিদেশগত চীনেরা তাহা বাহাল রাখেন। মুসলমান আমলের প্রথমাবস্থাতেও অর্থাৎ এদেশে ইউরোপীয়গণ আসিবার বহু পূর্ব্বে রাজপুতনাবাসিগণ পিস্তল ও বন্দুকের নির্ম্মাণ ও ব্যবহার করিতেন। এ দেশের তলোয়ার এত উৎকৃষ্ট ছিল যে মুড়িয়া একত্র করা যাইত। জগদ্বিশ্রুত রণজিতের খালশা সৈন্যেরা ঐ সকল তলোয়ার এরূপ দ্রুত চালাইতে পারিতেন যে, দুইদিকের শ্রেণী-বদ্ধভাবে দণ্ডায়মান কলাগাছ সকল দ্বিধা কর্ত্তিত হইয়াও ঠিক খাড়াই থাকিত। অপিচ প্রাচীন হিন্দুরা যে কেবল কামানবন্দুক নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন, তাহা নহে, তাঁহারা ঠিক একালের পাশ্চাত্যগণের ন্যায় স্ব স্ব দুর্গাদির প্রাকার সকল শতঘ্নী বা কামানশ্রেণীদ্বারা সজ্জিত রাখিতেন। আমরা সাধারণের অব-গতির নিমিত্ত এখানে রামায়ণাদি গ্রন্থ সকল হইতে কতিপয় ঐতিহ্য প্রমাণের অবতারণা করিব।

কোশলো নাম মুদিতঃ
স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে
প্রভূতধনধান্যবান্॥ ৫
অযোধ্যানাম নগরী
তত্রাসীৎ লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ
যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥ ৬
আয়তা দশ চ দ্বেচ
যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা
সুবিভক্তমহাপথা॥ ৭
রাজমার্গেণ মহতা
সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন
জলসিক্তেন নিত্যশঃ॥ ৮
তাং তু রাজা দশরথো
মহারাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ।
পুরী মাবাসয়ামাস
দিবি দেবপতির্যথা॥ ৯
কপাটতোরণবতীং
সুবিভক্তান্তরাপণাং।
সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতীম
উষিতাং সর্ব্বশিল্পিভিঃ॥ ১০
উচ্চাট্টালধ্বজবতীং
শতঘ্নীশতসঙ্কুলাং। ১১
দুর্গগম্ভীরপরিখাং
দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাং॥ ১৩
কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণাং
ইন্দ্রস্যেবামরাবতীং॥ ১৫-৫স।

বালকাণ্ড।

বেশ বুঝা গেল তৎকালে অযোধ্যায় দুর্গ-পরিখার উপরিদেশে দুর্গপ্রাকার সকল শত শত শতঘ্নীদ্বারা সজ্জিত থাকিত। মহর্ষি বাল্মীকি লঙ্কার অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়াও বলিতেছেন যে—

দদর্শ হনুমান্ লঙ্কাং
দেবো দেবপুরীমিব। ১৮
পালিতাং রাক্ষসেন্দ্রেণ
নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা॥ ২০

বপ্রপ্রাকারজঘনাং
বিপুলাম্বুবনাম্বরাং।
শতঘ্নীশূলকেশান্তা
মট্টালকাবতংসকাম্॥ ২১-২ সর্গ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

হনুমান্ রাবণরক্ষিত লঙ্কা দর্শন করিলেন উহা যেন বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত দেবপুরীবিশেষ। লঙ্কার চারিদিকে মহানীলাম্বুরাশি পরিখার কার্য্য করিতেছে। তৎপর দুর্গের বপ্র বা মৃন্ময় স্তূপ ও বপ্রোপরি পাচীর উহাকে মেখলার ন্যায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। চারিদিকে শত শত অট্টালিকা ও দুর্গপ্রাকারোপরি শত শত শতঘ্নী ও শূল সকল সজ্জীভূত। মহাভারতেও বিবৃত রহিয়াছে যে,—

বাসুদেব উবাচ।
হতং শ্রুত্বা মহাবাহো
ময়া শ্রৌতশ্রবং নৃপ।
উপায়াং ভরতশ্রেষ্ঠ।
শাল্বো দ্বারবতীং পুরীম্॥ ২
অরুন্ধত্তাং স দুষ্টাত্মা
সর্ব্বতঃ পাণ্ডুনন্দন।
শাল্বো বৈহায়সং চাপি
তৎপুর ব্যূহ্যধিষ্ঠিতঃ॥ ৩
তত্রস্থোহথ মহীপালো
যোধয়ামাস তাং পুরী॥ ৪

কৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো যুধিষ্ঠির, আমি শিশুপালকে বধ করিয়াছি শুনিয়া শাল্বরাজা আমার দ্বারকাপুরে আগমন করিল. এবং সে তাহার শূন্যবিহারী ব্যোমযানে থাকিয়া দ্বারকাবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

সতোমরাঙ্কুশা রাজন্
সশতঘ্নীকলাঙ্গলা। ৭—১৫অ বনপর্ব্ব।

কিন্তু আমার দ্বারকাপুরী তখন তোমর অঙ্কুশ লাঙ্গল ও শতঘ্নী প্রভৃতি দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। স্থলান্তরে ইন্দ্রপ্রস্থের বর্ণনাচ্ছলে বিবৃত রহিয়াছে যে—

তীক্ষ্ণাঙ্কুশ শতঘ্নীভি-
র্যন্ত্রজালৈশ্চ শোভিতং॥৩৪
তত্রিবিষ্টপসঙ্কাশ-
মিন্দ্রপ্রস্থং ব্যরোচত॥৩৬-২০৭অ
আদিপর্ব্ব।

সেই ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ, যন্ত্রসমূহ ও শতঘ্নী দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া দেবনগরী অমরাপুরীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

সুতরাং এই সকল বিবৃতিদ্বারা বেশ জানা গেল যে, পাশ্চাত্য জাতির রেখাপাত হইবারও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের রাজন্যবৃন্দ আপনাদিগের দুর্গপ্রাকারোপরি অনলোদ্গারী কামান সকল সজ্জীভূত করিয়া রাখিতেন, তাঁহাদিগের সামরিক উন্নতি সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহারা শূন্যচর বিমানে আরোহণ করিয়াও যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিলেন। ধনুর্ব্বেদও বলিতেছেন যে—

নালীকা লঘবো বাণা
নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চ দূরপাতেষু
দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥৭৪
সিংহাসনস্থ রক্ষার্থং
শতঘ্নীং স্থাপয়েৎ গড়ে।
রঞ্জকং বহুলং তত্র
স্থাপ্যঞ্চ বহুধীমতা॥৭৫
২৭ পৃষ্ঠা।

নালীকাস্ত্রের বাণ সকল নলযন্ত্রদ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া অতি দ্রুত গমন করে। অতি উচ্চে ও

অতি দূরেস্থিত শত্রুকে উহার দ্বারা আঘাত করিবে। নালীকাস্ত্র দুর্গযুদ্ধেও অত্যুপকারী। রাজা আপন সিংহাসন রক্ষার জন্য দুর্গে শতঘ্নী বা কামান, বহুপরিমাণ বারুদ ও গোলা রাখিবেন।

তবে কেন তাঁহারা কামানবন্দুকের ব্যবহার পরিত্যাগ করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ধর্ম্মপ্রাণতাই উহার নিদান। তবে হিন্দুরা প্রয়োজন হইলে স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্র প্রভৃতির নিকট আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসিতেন। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

আগ্নেয়মস্ত্রং লব্ধা তু
ভার্গবাৎ সগরোনৃপঃ।
জঘান পৃথিবীং গত্বা
তালজঙ্ঘান্ সহৈহয়ান্॥

১২৩-২৬অ উত্তরখণ্ড বায়ু।

মহারাজ সগর স্বর্গে যাইয়া ভার্গবের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হৈহয় ও তালজঙ্ঘনামক ক্ষত্রিয়গণকে বধ করেন। অর্জ্জুনও স্বর্গে থাকিয়া ইন্দ্রের নিকট আগ্নেয় প্রভৃতি নানা প্রকার অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিবের পাশুপাত অস্ত্র ও ইন্দ্র হইতে কর্ণ যে একঘাতী অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, উহাও কামান বন্দুক ভিন্ন আর কিছুই নহে। বন্দুকে একবার আওয়াজের উপযুক্ত কোন বিশেষ প্রকার বারুদ গুলি বোঝাই করিয়া দিয়াছিলেন, একবার ভিন্ন দুইবার আওয়াজ করা যাইবে না। এজন্যই উক্ত অস্ত্রের নাম একঘাতী হইয়া থাকিবে। সর্ব্বাদৌ উত্তরকুরুপতি ব্রহ্মা বজ্র বা কামানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি উহা রাজা ইন্দ্রকে প্রদান করেন। কালক্রমে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার ভ্রাতা ত্বষ্টা বজ্রনির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তৎপর জনসাধারণও বজ্র নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন।

ততক্ষিরে যুজং বজ্রং
নৃসদনেষু কারবঃ॥

৭—৯২সূ-১০ম।

শিল্পিগণ লোকদিগের গৃহে উপযুক্ত বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। অথর্ব্ববেদও বলিতেছেন যে—দেবতারা অশনি বা বজ্রের নির্ম্মাতা ছিলেন।

যাং ত্বা দেবা অসৃজন্ত বিশ্বে।

১ম খণ্ড-৮৪-পৃ।

তত্র সায়ণঃ—হে অশনে! যাং ত্বা ত্বাং বিশ্বে সর্ব্বদেবা ইন্দ্রাদয়ঃ অসৃজন্ত সৃষ্টবন্তঃ।

অতএব এহেন বজ্রাদি মেঘনিঃসৃত বিদ্যুৎ নহে, পরন্তু লৌহময় কামান, এবং হিন্দুগণ পূর্ব্বে ইহার নির্ম্মাণকৌশল ও ব্যবহারাদি অবগত ছিলেন।

মনীষিবর ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয়ের স্বর্গারোহণে।

কাঁসর শঙ্খ বাজেনিক আজ বাণীমন্দির তলে।
ধূপ গুগ্‌গুল ঘৃতের প্রদীপ বৃথা যায় আজি জ্বলে।
পূজার অর্ঘ্য কুসুম শুকায় রিক্ত জননী-পদ,
শুকায়ে পড়িছে কুঙ্কুম-রস চন্দন মৃগমদ।
ভৃঙ্গার আজি পরশেনি কেউ ভরা রহিয়াছে জলে
সকলি সাজান পুরোহিত ওগো কোথা গেছে আজি চলে।
সংসার ফেলি চলে গেছে কোন্ সন্ন্যাস আচরণে
মোদের গৃহের পুরোহিত আজ কোন্ দূর তপোবনে।
যাও যাও ওগো হে তাপসবর! উদযাপি ব্রত তবে,
চাহিনা তোমারে ধরিয়া রাখিতে পাপতাপময় ভবে।
বিধাতার কাছে যে ভাব নিয়েছ সেধেছ তাহার কাজ,
তব পবিত্র কর্ম্মজীবন বিরাম লভুক আজ।
তোমার মন্ত্র জলদ মন্দ্রে জাগাল বঙ্গহিয়া।
বঙ্গভাষারে দিয়াছ পষ্টি হৃদয় শোণিত দিয়া।
মানবসমাজে জাগিছে তোমার নবীন উদ্দীপনা—
সেবার ধর্ম্মে দেশের কর্ম্মে পবিত্র আরাধনা।
সুকঠোর তপে ভগীরথ সম আনিয়াছ মহামতি,
উষর বঙ্গ— হৃদয় ভাসায়ে চিন্তার ভাগীরথী।
'নিশীথে' তাহার চিন্তা লহরী জাগায় বিশ্বপ্রীতি
'নিভৃতে' নিয়ত ধ্বনিয়া তুলিছে ভগবৎপ্রেম-গীতি।
'প্রভাতে' তাহার চিন্তা লহরে দেয় সাধনার বল,
সকল কলুষ ধুয়ে দিয়ে দিয়ে গেয়ে যায় কল কল।
হৃদয়ের কূলে আঘাতি আঘাতি ভাসায়ে ভাসায়ে ধায়,
শ্যাম সুন্দর লতিকাশষ্পে মরমক্ষেত্র ভায়।
তোমার মহিমা জাগে বঙ্গের সাহিত্য-উপবনে
তোমার রোপিত লতিকাকুঞ্জে মঞ্জরী-শিহরণে।

শ্যামল শষ্পে চরণ চিহ্ন ডাকিছে ভক্ত শত
তোমার রচিত মালঞ্চ আজি ফলভারে অবনত।
আঁখি হ'তে তুমি গেছ দূরে বটে হারা হওনিক প্রাণে।
বঙ্গমাতার অঙ্গে অঙ্গে মাখা গুঞ্জনে গানে।
এখনো তোমার গভীর মন্ত্র কাঁপায় মর্ম্মতল
এখনো তোমার সঙ্গীত ধ্বনি দিতেছে কর্ম্মে বল।
তুমিই রহিলে রাখিবার তরে তবস্মৃতি সুধিবর
হৃদয়ের সনে রহিলে জাগিয়া প্রকৃতির সহচর।
তুমি যা দিয়েছ অক্ষয় দান পরিশোধ নাহি তার,
শুধু বিস্ময় ভক্তি পুলক আমাদের উপহার।
হে কোবিদবর! যাও তবে যাও সে পূত অমৃত দেশে
কর্ম্মক্লান্ত সন্তানে যথা পিতা চুমে লবে হেসে।
দূরে দিগন্তে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকবর্ত্ম বেয়ে,
কোন্ সে অসীমে গেলে চলে তুমি বিস্ময়ে আছি চেয়ে,
আজিকে মিলিয়া ভক্তি আনত অযুত ভক্তচয়,
গাহিছে তোমার পুণ্যচরিত স্মরগে মরতে জয়।
অশ্রুসিক্ত বেদনারক্ত মরম কুসুমগুলি
তোমারি লাগিয়া আনিয়াছে দেব লহ লহ আজি তুলি।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আইন।

(৫)

সাল	নম্বর	বিষয়
১৮২২	৭	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে।

১০ ধারা। কোনও মহালের বিভিন্ন জমি বিভিন্ন ভূস্বামী বা ভূস্বামীসমূহ পৃথকভাবে দখল করিলে, বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা বোর্ডের ক্ষমতা পাপ্ত অন্য কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক ভূস্বামী বা ভূস্বামীসমূহের সহিত দখলীয় জমির পৃথক্ বন্দোবস্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং পৃথক্ বন্দোবস্তীয় জমি পৃথক্ জমার জন্য

দায়ী হইবে। এজমালি সম্পত্তি বা একই দায়িত্বে আবদ্ধ পৃথক্ সম্পত্তির অধিকারীগণ বা তাহাদের মধ্যে যে কেহ এজমালি সম্পত্তিতে পৃথক্ অংশে পৃথক্ দখল পাইবার অথবা পৃথক্ বন্দোবস্ত পাইবার জন্য কালেক্টর বা বন্দোবস্তের অন্য কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিলে, বোর্ড বা উপরিস্থ অন্য কর্ত্তৃপক্ষের মঞ্জুর লইয়া কালেক্টর বা বন্দোবস্তের অন্য কর্ম্মচারী অংশানুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিতে পারিবেন এবং প্রত্যেকের বা যাহারা প্রার্থনা করে, তাহাদের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। যে সকল স্থলে কোনও ভূস্বামী বন্দোবস্ত পাইবেন না, কালেক্টর জানাইবেন যে, মহালে সম্পত্তিবিশিষ্ট সকল ব্যক্তি প্রত্যেকের দেয় খাজনার পরিমাণ ও নিরিখসহ সেটেল্‌মেণ্টের রোবকারিতে আপন নাম লেখাইতে পারিবেন।

১১ ধারা। পূর্ব্বধারার লিখিত রেজেষ্ট্রী করিতে কালেক্টর বর্ত্তমান দখল অনুযায়ী চলিবেন এবং প্রত্যেক স্থলে যে দলিলের বলে তাঁহার খাতায় নাম লিখিলেন তাহার সঠীক বিবরণ লিখিয়া রাখিবেন। বন্দোবস্ত কার্য্যে বা মহালের অবস্থা এবং মধ্যস্বত্বের প্রকার অনুসন্ধানে নিযুক্ত কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী ভূমিতে প্রকৃত দখলকার বা মালিকিস্বত্বে খাজানা আদায়কারী ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দিয়া ও তাহার নাম রেকর্ডে লিখিয়া সাবেক বন্দোবস্তের ভুল সংশোধন করিতে পারিবেন। এই সকল স্থলে কালেক্টর বিস্তারিতভাবে নিজ কার্য্যের হেতু বুঝাইয়া প্রকাশ্য বিচার করিবেন।

১২ ধারা। পট্টিদারি বা ভাইয়াচারা স্বত্বে দখল কোনও মহালের পট্টি, বেড়ি বা অন্য বিভাগের দরুণ ভূস্বামীর দেয় সদর খাজানা ও গ্রাম খরচ দখলীয় আবাদী জমির মাপের উপর নির্দ্ধারিত থাকিলে এবং মধ্যে মধ্যে ঐরূপ মাপ হইয়া পরিবর্ত্তিত হইবার প্রথা থাকিলে, যদি কালেক্টর বা বন্দোবস্তের অন্য কর্ম্মচারী পাটওয়ারির হিসাব দেখিয়া বা অন্য কারণে দেখিতে পান যে, কোনও ভূস্বামী ন্যায্য টাকার অনেক বেশী টাকা দিতেছে তবে বোর্ডের মঞ্জুর পূর্ব্বে লইয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে, সদর খাজানা বাদে নিট মুনফা বিভাগ করণ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হুকুম অনুসারে, প্রত্যেক ভূস্বামীর দেয় টাকা নূতন করিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন। এই কার্য্যে তিনি কানুনগো ও আবশ্যক মত অন্য লোক নিযুক্ত করিবেন ও প্রত্যেক ভূস্বামীর দেয় টাকা ঐ লোকের বিচার অনুসারে বা অন্য ন্যায্য প্রকারে স্থির করিবেন। যে সকল স্থলে ভূস্বামিগণ মধ্যে মধ্যে জমা সংশোধনের দাবি ছাড়া আপন আপন অংশ অনুসারে জমির বাটোয়ারা দাবি করিতে পারেন, সে স্থলে কালেক্টর জমির নূতন বাটোয়ারা করিয়া জমা ধার্য্য করিবেন ও কোন্ সময় হইতে নূতন বন্দোবস্ত আমলে আসিবে তাহা স্থির করিয়া জানাইবেন, এবং সরকারী রাজস্ব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেওয়া সম্বন্ধে পক্ষগণের পরস্পরের দাবি ন্যায্যমত নিষ্পত্তি করিবেন। ঐ বাটোয়ারা বা জমা নির্দ্ধারণ বোর্ড বা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক মঞ্জুর না হইলে চূড়ান্ত হইবে না। যদি বাটোয়ারার প্রথা নাই বলিয়া কোনও পক্ষ যে জমি কালেক্টর অপরকে দিয়াছেন তাহা

ফেরৎ চায়, অথবা কালেক্টর বাটোয়ারা করিতে অস্বীকার করিলে পক্ষ বাটোয়ারার দাবি করে,তবে কালেক্টরের হুকুমের বিরুদ্ধে ঐ পক্ষ যে ব্যক্তিকে কালেক্টর জমি দিয়াছেন বা যে ব্যক্তি বাটোয়ারার আপত্তি করে, তাহার নামে জিলা আদালতে রীতিমত মোকর্দ্দমা রুজু করিতে পারিবে। যদি প্রথার অস্তিত্ব স্বীকৃত বা প্রমাণ হয়, তবে কালেক্টরকৃত বাটোয়ারার সত্যতা বা জমা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন না। যদি কালেক্টরকৃত বাটোয়ারা রদ হয়, তবে আদালত পক্ষগণের স্বার্থ সম্বন্ধে যে চূড়ান্ত হুকুম দিবেন, তদনুযায়ী ও মধ্যস্বত্বের অনুষঙ্গ এবং সরকারী রাজস্ব বাদে নিট্ মুনফা বিভাগের গবর্ণমেণ্ট সাধারণ বা বিশেষ হুকুম অনুসারে রাজস্ব কর্ম্মচারীরা জমা পুনরায় নির্দ্ধারণ করিবেন।

১৩ ধারা। বিশেষ প্রকারে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কালেক্টর দখলে হস্তক্ষেপ করিবেন না। বর্ত্তমান বা অন্য আইনের নিরূপিত প্রকারে বিশেষ প্রকারে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী দখলে হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে কোনও কাজ করিবেন না এবং দখলহীন ব্যক্তি দখলের দাবি করিলে আদালতে রীতিমত মোকর্দ্দমা দ্বারা সে বিষয় নিষ্পত্তি হইবে।

১৪ ধারা। বন্দোবস্ত কার্য্যের সময় কালেক্টর, ভূমির দখলকার কোনও ব্যক্তির স্বত্বের প্রকার সম্বন্ধে বিরোধ থাকিলে, সরকারি রায় লিখিয়া ঐ ব্যক্তির দখলীয় স্বত্বের প্রকার ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করিবেন। নিষ্পত্তির হেতু মায় সাক্ষীর জবানবন্দি বিস্তারিতভাবে লিখিয়া ঐ রায় বন্দোবস্ত রোবকারির সামিল করিবেন। পট্টিদারি, ভাইয়াচারা বা তদ্রূপ স্বত্বে দখলীয় গ্রামের কোনও অংশীদারের স্বত্বের পরিমাণ সম্বন্ধে বিরোধ থাকিলে, ঐ অংশীদার গ্রামের কোনও অংশের বা ভূস্বামীস্বরূপ এজমালি মুনফার কোনও অংশের দখলকার থাকিলে, কালেক্টর প্রথমতঃ সেটেলমেণ্টের রোবকারিতে ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহার নিষ্পত্তি অনুযায়ী দখল করিবেন। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কালেক্টর হুকুম দিবেন তিনি আদালতে স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য রীতিমত মোকর্দ্দমা করিতে পারিবেন। কোনও ভূমিখণ্ডে ধার্য্য জমা অথবা এজমালি সম্পত্তির অংশীদার বাটোয়ারা সূত্রে যে পরিমাণ ও প্রকার জমি পাইবেন সেই সম্বন্ধে কালেক্টরের হুকুমের প্রতি আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন না। কোনও ব্যক্তি এজমালি মুনফার যে অংশ এতদিন পাইয়াছেন তাহার বেশী অংশ দাবি করিলে, অথবা গ্রামের যে পরিমাণ জমি এতদিন দখল করিয়াছেন তাহার বেশী জমি দাবি করিলে, কালেক্টর বিশেষরূপে ক্ষমতাপন্ন না হইলে, ঐ দাবি গ্রহণ করিবেন না। পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতার বলে কালেক্টর যে নিষ্পত্তি করিবেন, বোর্ড বা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাহা পরিবর্ত্তিত বা রদ না হইলে, আদালত তাহা বাহাল রাখিবেন— যদি রীতিমত মোকর্দ্দমায় ইহা স্থির না হয় যে দখল ঠিক নহে। মহালের জমা অথবা বাটোয়ারা সূত্রে নির্দ্দিষ্ট জমির পরিমাণ ও বিবরণ সম্বন্ধে রাজস্ব কর্ম্মচারীর হুকুমের প্রতি আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন না। বন্দোবস্ত করণ বা সংশোধন কার্য্যে নিযুক্ত কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারীর নিকট যদি কোনও ব্যক্তি নালিশ করে যে, সে অন্যায় পূর্ব্বক মহালের

ভিতর কোনও জমি, বাটী, শস্য, বাগান, গোচারণ ভূমি, জলকর, কূয়া, খাল, পুষ্করিণী, জল সঞ্চয়ের স্থান ইত্যাদি বা তাহাদের খাজানা, উৎপন্ন বা মুনফা হইতে বেদখল হইয়াছে অথবা তাহার দখলে অন্যায়পূর্ব্বক ব্যাঘাত ঘটান হইয়াছে, তবে কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী ঐ বিষয়ে তদারক করিবেন এবং নালিশের পূর্ব্ব বৎসরে যদি ঐ ব্যক্তি দখলকার ছিল বলিয়া প্রকাশ পায় ও অন্য কারণ পাওয়া যায় যে, সে জোরপূর্ব্বক বা অন্যায় পূর্ব্বক বেদখল হইয়াছে বা তাহার দখলে ব্যাঘাত ঘটান হইয়াছে, তবে কালেক্টর একখণ্ড রোবকারিতে নিজ হুকুমের হেতু লিখিয়া ঐ ব্যক্তিকে দখল দিতে বা তাহার দখল ব্যাঘাতশূন্য করিতে পারিবেন এবং বিপক্ষ পক্ষ স্বত্ব মীমাংসা করার জন্য আদালতে রীতিমত মোকদ্দমা রুজু করিতে পারিবেন। ঐরূপ প্রকারে, বন্দোবস্ত করণ বা সংশোধন কার্য্যে নিযুক্ত কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী জমি, বাটী ইত্যাদির দখল সম্বন্ধে কোনও বিবাদ দেখিতে পাইয়া যদি তাহা নিষ্পত্তি করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন, তবে তিনি দখল সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করিয়া হুকুম দিবেন—ঐ হুকুমে পক্ষ অসন্তুষ্ট হইলে আদালতে স্বত্ব বিষয়ে রীতিমত মোকদ্দমা করিতে পারিবে। বিশেষ দলিল বা চলিত প্রথা অনুযায়ী দখলের স্বত্ববিশিষ্ট জমিদার বা নীচস্থ প্রজা, ইজারাদার হউক বা রায়ত হউক, পূর্ব্ব বৎসরে তাঁহার দ্বারা দখলীয় ও আবাদী জমি হইতে অন্যায়পূর্ব্বক বেদখল হইলে, অথবা পূর্ব্ব বৎসরে তিনি জমির যে খাজানা ও মুনফা পাইতেন তাহা আদালতের হুকুম ভিন্ন অথবা তাঁহার দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে হস্তান্তর, পরিত্যাগ বা ইস্তফা ছাড়া যদি তাঁহাকে দেওয়া না হয় তবে পূর্ব্বোক্ত কালেক্টরের তদারকের বিধান বর্ত্তিবে। যদি দখল ইস্তফা করিয়া নালিশী ব্যক্তি কোনও দলিল সম্পাদন করিয়া থাকেন, তবে ঐ দলিল জোরপূর্ব্বক বা ভয়প্রদর্শন দ্বারা সম্পাদন হইয়াছে বলিয়া মোকদ্দমায় সাবাস্ত না হইলে, অথবা যদি নালিশী ব্যক্তি নালিশ রুজু হইবার পূর্ব্ব বৎসরের আগে দখল হারাইয়া বা ইস্তফা করিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বোক্ত কালেক্টরের তদারকের বিধান বর্ত্তিবে না।

১৫ ধারা। সরকার বা গবর্ণমেণ্টের আমিন বা অন্য কর্ম্মচারীর দত্ত সনদ দ্বারা প্রাপ্ত বা প্রাপ্ত বলিয়া দাবি এবং এতাবৎকাল, নিষ্কর হউক আর নাই হউক, একপ বাজেয়াপ্ত মহালের বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী, বর্ত্তমান আইনে যেরূপ বিধান থাকুক না কেন, মহালের জমির স্বত্ব ও দখল সম্বন্ধে যাবতীয় দাবি শুনিয়া বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন এবং বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা বোর্ডের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কর্তৃপক্ষের হুকুম ও উপদেশ লইয়া যাহার স্বত্ব উৎকৃষ্ট তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে দখল দিবেন। অন্যান্য পক্ষগণ স্বীয় দাবি সাবাস্ত করার জন্য জিলা কোর্টে রীতিমত মোকদ্দমা রুজু করিতে পারিবেন এবং ঐ মোকদ্দমা সম্পূর্ণরূপে শুনিয়া জিলা কোর্ট রাজস্বকর্ম্মচারীগণের নিষ্পত্তি সংশোধন, রদ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ভূস্বামী বা তাহার প্রতিনিধি কোনও নিষ্কর দান করিলে বা তাহাদের প্রার্থনামতে কোনও নিষ্কর দান সম্পাদন হইলে, যদি ঐ জমির দখলকার উপযুক্ত সর্ত্তে বন্দোবস্ত লইতে

ইচ্ছুক হয়, তবে সাধারণতঃ তাহার সহিত ঐ জমির বন্দোবস্ত হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়ম ঐ জমির পতি বহিবে না।

১৮ ধারা। বাজেয়াপ্তি লাখেরাজ মহাল বা পুনর্বন্দোবস্তের জন্য দায়ের মালগুজারি মহালের বন্দোবস্ত সম্পাদন বা সংশোধন কার্য্যে নিযুক্ত কালেক্টরকে বোর্ডের হুকুম ও উপদেশ লইয়া মহালের জমি বা তাহার খাজনা বা উৎপন্নে স্বত্ব ও দখল সম্বন্ধে যাবতীয় দাবি শুনিয়া বিচার ও নিষ্পত্তি করার এবং উৎকৃষ্ট স্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে দখল দেওয়ার বিশেষ ক্ষমতা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল দিতে পারিবেন। কালেক্টরের নিষ্পত্তি রীতিমত মোকর্দ্দমায় জিলাকোর্ট কর্ত্তৃক সংশোধিত হইতে পারিবে। ঐরূপ বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইলে গবর্ণমেণ্টের হুকুম ইস্তাহার দ্বারা মহালে জারি করা হইবে এবং কালেক্টর ও বোর্ড দেখিবেন যেন রীতিমত জারি করা হয়। বর্ত্তমান ধারা বা অন্য ধারায় ইস্তাহার জারির কথা লেখা থাকিলে, মাত্র ইস্তাহার জারি না হওয়ার অজুহতে এবং রীতিমত বিচার না করিয়া আদালত কালেক্টরের কোনও হুকুমে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

১৭ ধারা। কোনও পরগণা, মৌজা বা অন্য স্থানীয় বিভাগের বন্দোবস্ত করণ বা সংশোধন কার্য্যে নিযুক্ত কালেক্টরের এবং অন্য কর্ম্মচারী, ঐ স্থানের অন্তর্গত বা তাহার সংলগ্ন, সরকার হইতে বা গবর্ণমেণ্টের আমিল বা অন্য কর্ম্মচারী হইতে নিঃসন্দেহ দানপত্র দ্বারা সৃষ্ট নিষ্কর বা একই অবিচলিত খাজনায় ভোগ দখলীয় জমিতে স্বত্বের দাবি শুনিয়া বিচার করিতে পারিবেন এবং জমিতে বা তাহার উৎপন্নে বা খাজানায় দাবিকারক ব্যক্তির উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে ভোগী ও হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব আছে বা থাকা উচিত বলিয়া সন্তুষ্ট হইলে, অগ্রে গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুর লইয়া কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরল যেরূপ আদেশ করেন সেইরূপ মিয়াদে লাখেরাজদার বা মোকররিদারের পক্ষে ঐ দাবিকারক ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, এবং কি সর্ত্তে ঐ ব্যক্তি লাখেরাজদার বা মোকররিদারের অধীনে জমি ভোগ করিবে, তাহা লিখিয়া তাহাকে পাট্টা দিবেন। জমির দখল হইতে অপসারিত হইলে ঐ ব্যক্তিকে লাখেরাজদার বা মোকররিদার কত টাকা মালিকানা দিবেন, তাহা বোর্ডের হুকুম লইয়া কালেক্টর স্থির করিয়া দিবেন। স্বত্ব সম্বন্ধে কালেক্টরের নিষ্পত্তিতে কোনও পক্ষ অসন্তুষ্ট হইলে আদালতে রীতিমত মোকর্দ্দমা করিতে পারিবেন; কিন্তু কালেক্টরের ধার্য্য জমা বা মালিকানায় আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন না।

১৮ ধারা। এলাকার বিষয়ে সন্দেহ হইলে বোর্ড ও গবর্ণমেণ্টের হুকুম লইয়া কালেক্টর মীমাংসা করিবেন এবং রীতিমত মোকর্দ্দমায় স্বত্বের নিষ্পত্তি ব্যতীত আদালত কালেক্টরের দত্ত দখলে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

১৯ ধারা। পূর্ব্বোক্ত তদারক-কার্য্যে বা মোকর্দ্দমা শুনিয়া বিচার করিতে বা অন্য স্থলে উপরস্থ বোর্ড কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে কালেক্টরগণ, তদারকের মহালের ভিতরে বা নিকটে কোনও জমির অধিকারী, দখলকার, কার্য্যাধ্যক্ষ বা কৃষক অথবা ঐ জমির উৎপন্ন যিনি আদায় করেন বা ব্যয় করেন অথবা ঐ জমির খাজানা বা গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব যিনি

আদায় করেন, ভোগ করেন বা গ্রহণ করেন এরূপ সদর মাল্‌গুজার্‌ বা অন্য ব্যক্তিকে ও জমির খাজানা, উৎপন্ন, বা গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব আদায় কার্য্যে বা জমির রক্ষণ বা চাষ কার্য্যে নিযুক্ত ঐ ব্যক্তির গোমস্তা বা অন্য কর্ম্মচারীকে জমি, উৎপন্ন, খাজানা বা গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব বা অন্য কাগজাদিসহ উপস্থিত হইতে আদেশ দিতে পারিবেন এবং তাহাকে ঐ হিসাবের সত্যতা বা হিসাবসংক্রান্ত অন্য কোনও বিষয় বা মহালের জমি, উৎপন্ন, খাজানা বা গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব বা জমি, উৎপন্ন, খাজনা, গবর্ণমেণ্ট রাজস্বে স্বত্ব বা স্বার্থসম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা বা হলপ্‌নামা পড়াইয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন। কোনও বিষয়ে সত্য গোপন করায় বা মিথ্যা বলায় যদি কোনও ব্যক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বার্থ থাকে—ঐ স্বার্থ, ভয়, অনুগ্রহ, বা পুরস্কার বা অন্য পক্ষের সহিত প্রবঞ্চনামূলক বন্দোবস্ত বা চুক্তি হইতে উত্থিত না হয়—তবে ঐ বিষয়ে কোনও প্রশ্নের জবাব ঐ ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞা বা হলপ্‌নামা পড়াইয়া, দিতে বাধ্য করা হইবে না। কোনও ব্যক্তির উপস্থিতি এবং হিসাব দাখিল করার নোটিশ জারির ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধান বর্ত্তমান আইন অনুযায়ী কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী যে নোটিশ জারি করিবেন তাহার প্রতি বর্ত্তিবে। তদ্রূপ তদারকের জমির হিসাব রাখেন এরূপ পাটোয়ারী, গোমস্তা বা অন্য ব্যক্তি সমন পাইয়া হিসাব দাখিল করিতে বা তৎসম্বন্ধে জবানবন্দি দিতে যদি ক্রটি বা ভুল করেন অথবা সমন্‌ পাইয়া হাজির হইয়া প্রতিজ্ঞা বা হলপ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলেন অথবা হিসাব বদ্‌লান্‌, বা কৃত্রিম হিসাব প্রস্তুত করেন, তবে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১২ ধারার বিধান বর্ত্তিবে। ১৮১৯ সালের ২ আইন অনুযায়ী কোনও কার্য্য করিতে কালেক্টর যে ক্ষমতা পরিচালনা করেন, রাজস্ব বন্দোবস্ত কার্য্যে বা বর্ত্তমান আইন অনুযারী কোনও তদারকে নিযুক্ত কালেক্টর এবং অন্য কর্ম্মচারীকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হইবে। যাহার প্রতি কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী সমন দিবেন, বা যে ব্যক্তি বর্ত্তমান আইনের বিধান অনুযায়ী কালেক্টর যে নোটিশ জারি করিবেন, তাহার ব্যাঘাত ঘটাইবে, বা আদেশ পাইয়া যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পাঠ করিতে বা সত্যপাঠ দস্তখত করিতে অস্বীকার করিবে, বা যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা বা হলপ্‌ পাঠ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে বা অন্যকে দেওয়াইবে বা দিতে বলিবে তাহার প্রতি ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১৩ ধারার ৩ প্রকরণ, ও ১৪, ১৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

২৭ ধারা। রাজস্ব নির্দ্ধারণ বা সংশোধন কার্য্যে নিযুক্ত কালেক্টর যে পরগণায় কার্য্য করিবেন, তাহার সমুদায় জমিতে বর্ত্তমান আইনের ১১, ১২, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ধারার লিখিত ক্ষমতা সচরাচর পরিচালনা করিবেন। কাউন্সিলে হুকুম পাশ করিয়া এবং জেলায় প্রকাশ্যভাবে ঐ হুকুম জারি করিয়া গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উচিত মনে করেন কালেক্টর এবং অন্য কর্ম্মচারীর ক্ষমতা কমাইতে পারিবেন। রাজস্ব নির্দ্ধারণ বা সংশোধন কার্য্যে নিযুক্ত নয় এরূপ কালেক্টরকে উপযুক্ত মনে করিলে পূর্ব্বোক্ত ধারার লিখিত বিষয়ের মোকর্দ্দমা গ্রহণ, বিচার,

নিষ্পত্তি করিবার বিশেষ ক্ষমতা গবর্ণমেণ্ট দিতে পারিবেন—ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আদালতে পূর্ব্বে যেরূপ কথিত হইয়াছে সেইরূপ রীতিমত মোকর্দ্দমা চলিবে। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে কালেক্টরের নিয়োগ এবং তাঁহার এলাকা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল যেরূপ আদেশ করেন সেইরূপে জেলায় ইস্তাহার দ্বারা প্রচার করা হইবে। নোটিশ জারির পর কালেক্টরের এলাকাধীন পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মোকর্দ্দমা যাহা জিলা আদালতে দায়ের আছে বা হইবে তাহা প্রাপ্তিমাত্র বিচারের জন্য কালেক্টরের নিকট পাঠান হইবে এবং পক্ষগণ ঐরূপ মোকর্দ্দমা প্রথমেই কালেক্টরের নিকট রুজু করিতে পারিবেন। কালেক্টরের উপরিলিখিত বিশেষ ক্ষমতা এবং বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ সাধারণতঃ যে ক্ষমতা পরিচালনা করেন তাহা কোন্ সময়ে শেষ হইবে সে বিষয় কাউন্সিলে হুকুম দিয়া গবর্ণর জেনারেল স্থির করিবেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মোকদ্দমার হেতু যে তারিখে জন্মিয়াছে তাহা হইতে ১ বৎসরের মধ্যে আর্জি বা দরখাস্ত দাখিল না হইলে, কালেক্টর ঐ মোকর্দ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

২১ ধারা। পক্ষকে উপস্থিত করিবার সাধারণ নিয়ম—মোকর্দ্দমার বিষয় লিখিয়া নির্দ্ধারিত স্থান ও সময়ে স্বয়ং বা কর্ম্মচারী দ্বারা হাজির হইবার জন্য তাহার নামে নোটিশ দেওয়া। যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের নোটিশ পাইয়া কোনও পক্ষ উপস্থিত না হয় অথবা নাজির বা নোটিশজারি কার্য্যে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তি রিটার্ণ দেয় যে, বিশেষ অনুসন্ধানে পক্ষকে পাওয়া গেল না, তবে পক্ষের সাধারণ বাসস্থানে বা তাহার নিকটে লিখিত ইস্তাহার জারি করা যাইবে যে, ইস্তাহার জারির ১৫ দিনের পর মোকর্দ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে। ঐ বিচারের দিন পূর্ব্বোক্ত নোটিশ পাইয়া যদি কোনও পক্ষ উপস্থিত না হয় বা গরহাজির থাকে তবে মোকর্দ্দমা তাহার সাক্ষাতে নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

২৩ ধারা। বর্ত্তমান আইন বা অন্য আইন যাহা দ্বারা কালেক্টরকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তদনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে রাজস্বের কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী যে মোকর্দ্দমা বিচার করিবেন ঐ মোকর্দ্দমা-সংক্রান্ত সাক্ষীর তলব ও পরীক্ষা কার্য্যের সময়, মিথ্যা সাক্ষ্য, সমনে ব্যাঘাত, অবজ্ঞা প্রভৃতির শাস্তি দেওয়ার সময় তাঁহার কাছারি বা অফিস সেই সময়ে দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে। ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ধারার ক্ষমতানুযায়ী কালেক্টরের প্রদত্ত হুকুমের বিরুদ্ধে যে মোকর্দ্দমা রুজু হইবে, তাহা সরাসরি হুকুমের বিরুদ্ধে রীতিমত আপীল বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই মোকর্দ্দমায় কালেক্টর বা গবর্ণমেণ্টের অন্য কর্ম্মচারী পক্ষ হইবেন না। রাজস্বের কালেক্টরগণ বর্ত্তমান আইন অনুযায়ী কোনও প্রাপ্য টাকা বা খরচ বা ক্ষতিপূরণের ডিক্রি দিলে ঐ ডিক্রি জারি করিতে পারিবেন এবং বকেয়া রাজস্ব যে প্রকারে আদায় হয় সেই প্রকারে ঐ টাকা আদায় করিবেন। সরাসরি তদন্তের উপর নির্ভর করিয়া যে ডিক্রি দেওয়া যাইবে সেই ডিক্রির জারিতে বাটী বা অন্য প্রকৃত সম্পত্তি, ভূমি বাদে, বিক্রয় করা যাইবে না। জমি, বাটী, খাল ইত্যাদির দখলের

ডিক্রি দিলে, অবজ্ঞা, ব্যাঘাত ইত্যাদি বিষয়ে যে প্রকার ক্ষমতাযুক্ত হইয়া আদালত নীলাম খরিদদারকে দখল দেন, কালেক্টর সেই ক্ষমতাযুক্ত হইয়া দখল দিবেন এবং ঐ ক্ষমতা পরিচালনা করিতে জিলা আদালত কালেক্টরকে সাহায্য করিবেন ও ঐ ক্ষমতার বলে কালেক্টর যে হুকুম দিবেন তাহা নিজের হুকুম বলিয়া গণ্য করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন। আবশ্যক বা যুক্তিযুক্ত মনে করিলে, যাহাকে দখল দেওয়া হইল তাহার দখল বজায় রাখার সাহায্যের জন্য এক বা একাধিক পিয়ন, মির্দহ, সয়ার ইত্যাদি কালেক্টর দিতে পারিবেন।

২৪ ধারা। কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতাপাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী বন্দোবস্ত করণ বা সংশোধনের পূর্ব্বে, বর্ত্তমান আইনের বিধান অনুযায়ী বন্দোবস্ত করিতে যে সমুদায় বিষয় তাঁহার তদারক করা দরকার বা করার ক্ষমতা আছে সেই বিষয় তদারকের জন্য কোনও তহশীলদার, কানুনগো, আমিন বা অন্য স্থায়ী বা অস্থায়ী কর্ম্মচারীকে গ্রামে বা মহালে, ঐ গ্রাম বা মহাল জমিদার বা ইজারদারের তত্ত্বাবধানে থাকুক বা খাসে থাকুক, নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এইরূপে নিযুক্ত দেশীয় কর্ম্মচারী গ্রাম বা মহালের হিসাব রক্ষক পাটোয়ারী, গোমস্তা বা অন্য ব্যক্তিকে তলব ও পরীক্ষা করা সম্বন্ধে ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণের ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী আদেশ করিলে, ঐ তহশীলদার বা অন্য ব্যক্তি গ্রাম বা মহাল মাপ করিতে পারিবেন, মোকাদ্দম, পধান, রায়ত বা অন্য বাসিন্দা ব্যক্তিকে তলব করিতে এবং গ্রাম বা মহালের সীমানা দেখাইতে তাহাকে আদেশ দিতে ও জমি এবং তাহার স্বত্ব ও স্বার্থসম্বন্ধে যাবতীয় খবর দিতে তাহাকে বলিতে পারিবেন। যদি কালেক্টরের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ হয় যে, কোনও ব্যক্তি অবজ্ঞাপূর্ব্বক ঐ কর্ম্মচারীকে খবর দিতেছে না তবে হাজির হইতে বা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলে পাটোয়ারির যেরূপ দণ্ড হয় ঐ ব্যক্তির সেইরূপ দণ্ড হইবে। কালেক্টর বা অন্য রাজস্ব কর্ম্মচারীর কোনও আইনসঙ্গত পরওয়ানা, তলব, বা হুকুম যদি কোনও ব্যক্তি জোরপূর্ব্বক বা ভয় দেখাইয়া জারি করিতে না দেয় বা বাধা দেয় তবে বর্ত্তমান আইন সমূহের বিহিত দণ্ড বাদে ঐ ব্যক্তির ঐ কার্য্যের জন্য দুই শত টাকার অনতিরিক্ত জরিমানা অথবা দেওয়ানী জেলে দুই মাসের অনধিক কালের জন্য কারাবাস হইতে পারিবে; রীতিমত বিচার করিয়া এবং বিবরণী লিখিয়া ঐ জরিমানা বা অন্য শাস্তির হুকুম কালেক্টর দিবেন এবং উপরস্থ বোর্ডে তৎক্ষণাৎ হুকুমের এত্তেলা দিবেন। কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী যে কোনও পরওয়ানা বা হুকুম দিবেন তাহার জারির কার্য্যে পুলিসের কর্ম্মচারীগণ সাহায্য করিবে; যে কর্ম্মচারী হুকুম দিবেন বা জারি করিবেন তিনি দায়ী থাকিবেন। কালেক্টর বা অন্য রাজস্ব কর্ম্মচারীর আইন সঙ্গত পরওয়ানা বা হুকুমে ব্যাঘাত দেওয়া বা দিতে চেষ্টা করার দরুণ কোনও হাঙ্গামা বা শান্তিভঙ্গ ঘটিলে, যে ব্যক্তি বাধা দিবেন তাঁহার ঐ হাঙ্গামা বা শান্তিভঙ্গের জন্য শাস্তি হইতে পারিবে, এবং রাজস্ব কর্ম্মচারীগণ ফৌজদারি সোপর্দ্দ হইবেন না।

২৫ ধারা। আর্জ্জি এবং জবাব ছাড়া

অন্য কোনও কাগজ পক্ষগণের নিকট কালেক্টরের আদালতের মোকর্দ্দমায় লওয়া হবে না। যদি পক্ষগণ পরে কোনও সময়ে সংশোধিত আর্জ্জি বা সংশোধিত জবাব অথবা কোনও ব্যাখ্যাসূচক কাগজ দাখিল করে তবে ঐ কাগজ লওয়া হইবে।

২৮ ধারা। জেলার যে কোনও স্থানে কালেক্টর কোনও সময়ে উপস্থিত থাকিবেন, সেইখানে তিনি মোকদ্দমা শুনিয়া বিচার করিতে পারিবেন; কিন্তু ঐ শুনানি ও বিচার প্রকাশ্য কাছারি অথবা সাধারণে যাতায়াত করিতে পারে এরূপ কোনও স্থানে এবং পক্ষগণের বা তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বা উকিল উপস্থিত থাকিলে তাহাদের মোকাবেলায় হওয়া চাই।

২৯ ধারা। কালেক্টরের হুকুমের বিরুদ্ধে বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল হইবে। পক্ষের ইচ্ছামত কালেক্টরের নিকট বা বোর্ডের নিকট আপিলের দরখাস্ত দাখিল করা যাইবে। বোর্ডের নিকট সন্তোষজনক কারণ না দেখাইলে হুকুমের তারিখের ৩ মাসের পর কোনও আপিলের দরখাস্ত লওয়া হইবে না। কালেক্টরের শেষ রোবকারি হইতে যদি তাঁহার হুকুম অন্যায়, ভ্রমাত্মক, বা সন্দেহজনক কিম্বা তাঁহার কার্য্য বিশৃঙ্খল বা অসম্পূর্ণ বলিয়া বোর্ড বিবেচনা না করেন, তবে সাধারণ মোকদ্দমায় বিচার্য্য বিষয়ের রীতিমত তদন্ত না করিয়া আপিল ডিস্‌মিস্ করিতে পারিবেন। মোকদ্দমার বিচার্য্য বিষয় তদন্ত না করিয়া, গরহাজির বা অন্য কোনও ত্রুটির দরুণ যদি কালেক্টর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া থাকেন, তবে বোর্ড পুনর্বিচারের হুকুম দিতে পারিবেন, এবং যদি কালেক্টর যথেষ্ট কারণ ব্যতীত মোকর্দ্দমার তদন্ত বা বিচার করিতে ত্রুটি বা বিলম্ব করেন তবে বোর্ড হস্তক্ষেপ করিতে ও কালেক্টরকে তদন্ত ও বিচার শেষ করার হুকুম দিতে পারিবেন। আপিলের দরখাস্ত ছাড়া অন্য কাগজ আবশ্যক হইবে না; প্রথমে যে দলিল দাখিল হইয়াছে বা পরে বোর্ড যে দলিল আবশ্যকমত তলব করেন তাহার জন্য বোর্ড কোনও ফি লইবেন না। প্রথম মোকদ্দমায় যে এজেণ্ট বা উকিল নিযুক্ত ছিল আপিলে যদি সেই এজেণ্ট বা উকিল নিযুক্ত হয়, তবে নূতন মোক্তারনামা বা ওকালতনামা আবশ্যক হইবে না। বিরুদ্ধ পক্ষকে আপিলের নোটিশ দেওয়া হইবে, কিন্তু তাহাকে স্বয়ং বা উকিল দ্বারা উপস্থিত হইতে বাধ্য করা হইবে না, এবং সে উপস্থিত থাকিলে যেরূপ হইত তাহার অনুপস্থিতিতেও সেইরূপ বিচার্য্য বিষয় তদন্ত করিয়া আপিল নিষ্পত্তি করা হইবে। কালেক্টরের সরাসরি তদন্ত সম্বন্ধে বোর্ডের হুকুম চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। কালেক্টর বা বোর্ডের সরাসরি নিষ্পত্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া কোনও ব্যক্তি জিলা বা তত্তুল্য বা তাহার উপরস্থ আদালতে বিচার্য্য বিষয়ের বিশদ বিচার প্রার্থনা করিয়া রীতিমত মোকর্দ্দমা রুজু করিতে পারিবে, কিন্তু কালেক্টরের সরাসরি নিষ্পত্তি বোর্ড কর্তৃক পরিবর্তিত বা স্থগিত না হইলে, ঐ মোকর্দ্দমা রুজু হওয়া সত্ত্বেও জারি করা হইবে।

৩০ ধারা। কোনও ব্যক্তি কালেক্টরের নিকট সরাসরি নিষ্পত্তি না চাহিয়া যে মোকর্দ্দমা কালেক্টর বিচার করিতে পারেন, এরূপ

মোকর্দ্দমা প্রথমেই স্থানীয় মুন্সিফ্ বা জিলার আদালতে রীতিমত রুজু করিতে পারিবে।

৩১ ধারা। কালেক্টরের সরাসরি নিষ্পত্তি রদ বা পরিবর্ত্তন করার জন্য দেওয়ানী আদালতে রীতিমত মোকর্দ্দমা রুজু হইলে, আদালতের হুকুম অনুসারে সরাসরি তদন্তের নথি তলব করিয়া মোকর্দ্দমার রেকর্ডভুক্ত করা হইবে। ঐরূপ মোকর্দ্দমা কোনও মুন্সিফ্ বিচার করিতে পারিবেন না, এবং বর্ত্তমান আইন অনুযায়ী কালেক্টর বা অন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যে নিষ্পত্তি করিবেন বা রেকর্ড তৈয়ার করিবেন, তাহা বোর্ড কর্ত্তৃক বা জিলা বা তত্তুল্য বা তাহার উপরস্থ আদালত কর্ত্তৃক রীতিমত মোকর্দ্দমায় রদ বা পরিবর্ত্তিত না হইলে, মুন্সিফ্ কোনও মোকর্দ্দমা বিচার করিতে তাহা দ্বারা বাধ্য হইবেন।

৩২ ধারা। বোর্ডের হুকুম মত কালেক্টর মধ্যে মধ্যে নিষ্পত্তি করা বা দায়ের মোকর্দ্দমার রিপোর্ট বোর্ডে পাঠাইবেন, এবং সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল যেরূপ আদেশ করেন তদনুযায়ী বোর্ড ঐ রিপোর্টের চুম্বক ও আপিলে বোর্ড যে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করেন তাহার রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন।

৩৩ ধারা। বর্ত্তমান আইনের বিধান অনুযায়ী যে বিবাদ তিনি বিচার করিতে পারেন, এবং ভূমি বা মধ্যস্বত্ব বা অপরস্বত্ব আছে সেই সম্বন্ধে যে প্রশ্ন বা বিবাদ তাহাতে যে তাহার নিকট আসে, তাহা পক্ষগণের সম্মতি লইয়া কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী সালিসের নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন, এবং সালিসের ডিক্রি জারি করিতে পারিবেন। সাক্ষীর তলব ও পরীক্ষা এবং হলপ্দান সম্বন্ধে আদালতের ন্যায় কালেক্টর সালিসকে ক্ষমতা দিতে পারিবেন, এবং সালিসের হুকুম আদালতের ন্যায় কালেক্টর জারি করাইতে পারিবেন। সালিসের ডিক্রি কালেক্টর কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইলে, আদালতের রীতিমত ডিক্রির ন্যায় বলবৎ হইবে, এবং জিলা, সিটি বা অন্য উর্দ্ধ আদালতে রীতিমত মোকর্দ্দমা দ্বারা শঠতা, অত্যন্ত পক্ষপাত বা পক্ষগণের দত্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত ক্ষমতা পরিচালনা করা হইয়াছে বলিয়া ঐ ডিক্রি দুষ্ট না হইলে উহা উল্টান বা বদলান যাইবে না। পক্ষগণ যে সালিসের দলিল সম্পাদন করিবে তাহাতে ও কালেক্টরের হুকুমে কোন্ বিষয় সালিসের জন্য দেওয়া গেল তাহা সুস্পষ্ট লিখিতে হইবে, এবং সালিসগণের ডিক্রীতে যদি সমুদায় বিষয় না থাকে অথবা অন্য কারণে যদি উহা অসম্পূর্ণ হয়, তবে ডিক্রি সম্পূর্ণ করিবার জন্য কালেক্টর উহা ফেরত দিতে পারিবেন। বর্ত্তমান আইনে যাই থাকুক, পরগণা কানুনগো এবং তহশীলদারগণ সালিস হইতে পারিবেন।

৩৪ ধারা। জমি বা বাড়ীর বেদখল বা দখলের ব্যাঘাত সংক্রান্ত নালিশের বিষয়ে বর্ত্তমান আইনে যে ক্ষমতা কালেক্টরকে দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট, অন্য সরকারি কর্ম্মচারীর রিপোর্টে বা অন্য প্রকারে যদি অবগত হন যে, তাঁহার এলাকার ভিতর কোনও জমি, বাটী, শস্য, বাগান, গোচারণ ভূমি, জলকর, কূয়া, খাল, পুষ্করিণী, জল সঞ্চয়ের স্থান ইত্যাদি লইয়া শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা এরূপ বিবাদ আছে, তবে বিরোধীয়

পক্ষগণকে স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা নির্দ্ধারিত স্থানে ও সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী আদেশ করিতে পারিবেন, এবং পক্ষগণের বা তাহাদের প্রতিনিধির ভিতর যে কেহ উপস্থিত হয়, তাহার মোকাবেলায় তদন্ত করিয়া বা বিরোধ সালিশের উপর ভর দিয়া কোনও এক পক্ষের রুজু মোকর্দ্দমার ন্যায় উহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। পূর্ব্বের আইনসঙ্গত দখল যদি নির্দ্ধারণ করিতে না পারা যায়, তবে বোর্ডের হুকুম ও উপদেশ লইয়া কালেক্টর স্বত্ব সম্বন্ধে বিচার করিবেন, এবং একপক্ষকে দখল দিবেন, অপর পক্ষ ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে আদালতে রীতিমত মোকর্দ্দমা করিতে পারিবে। দখল সম্বন্ধে যত্নের সহিত তদারক না করিয়া কালেক্টর ঐরূপ হুকুম দিবেন না, এবং বোর্ড দেখিবেন, যেন কালেক্টর তদ্রূপ কার্য্য করেন। এইরূপ স্থলে বিরোধীয় পক্ষগণের মধ্যে এক-জন দখল না পাওয়া পর্য্যন্ত বিরোধীয় জমি, বাটী ইত্যাদি কালেক্টর আবদ্ধ করিতে এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন; সরকারী রাজস্ব ও তত্ত্বাবধানের খরচ বাদে উদ্বৃত্ত খাজানা ও উৎপন্ন কালেক্টর মজুদ রাখিবেন। জমি, বাটী, শস্য, খাল ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনও বিবাদের মোকর্দ্দমা, নালিশ বা সংবাদ কোনও ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ পাইলে, যদি ঐ বিবাদে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হয় বা অন্য কারণে ঐ বিবাদ অবিলম্বে নিষ্পত্তি করার দরকার হয়, তবে ঐ মোকর্দ্দমা বিচার করার ক্ষমতা কালেক্টরের থাকিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট বা জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট উহা তাঁহার নিকট পাঠাইবেন, এবং তিনি মোকর্দ্দমা অবিলম্বে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তদারক ও বিচার করিবেন। জোরপূর্ব্বক বেদখল বা দখলের ব্যাঘাতের মোকর্দ্দমা হইলে, কালেক্টর প্রত্যেক স্থলে প্রথম তদন্তের ও শেষ হুকুমযুক্ত রোবকারির নকল ম্যাজিষ্ট্রেট বা জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইবেন। এই সকল স্থলে বিবাদ সালি-শের নিকট দেওয়ার জন্য পক্ষকে লওয়াইতে কালেক্টর, দেওয়ানী আদালতের ন্যায়, সর্ব্ব প্রকার ন্যায্য উপায়ে চেষ্টা করিবেন।

১৫ ধারা। এই আইন বা অন্য আইনে "বোর্ড অব্ রেভিনিউ" বা "বোর্ড অব্ কমিসনার" কথা থাকিলে, অন্য বিশেষ বিধান অভাবে উহা সকৌন্সিল্ গবর্ণর জেনারল্ হইতে বোর্ড অব্ রেভিনিউএর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও বোর্ড, কমিটি বা কমিসনের এবং ঐ বোর্ড, কমিটি বা কমিসনের কোনও মেম্বরের প্রতি বর্ত্তিবে। এই আইন বা অন্য আইনে কালেক্টরের কর্ত্তব্য বা ক্ষমতা বিষয়ক যে সকল বিধান আছে, তাহা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের হুকুমমত বা মঞ্জুরিমত কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও কর্ম্মচারীর প্রতি তুল্যরূপ বর্ত্তিবে।

হিন্দু জ্যোতিষ।

(২)

——:o:

সূর্য্যাদভ্যধিকাঃ পশ্চাদ
স্তং জীব কুজার্কজাঃ।
ঊনাঃ প্রাগুদয়ং যান্তি
শুক্রজ্ঞৌ বক্রিণৌ তথা॥
ঊনাঃ বিবস্বতঃ পাচ্যাং
মস্তং চন্দ্রজ্ঞভার্গবাঃ।
ব্রজস্ত্যভ্যধিকাঃ পশ্চাদ্
দয়ং শীঘ্রযায়িনঃ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডের আকার কত বড় এবং গ্রহগণ পৃথিবী হইতে কত দূরে অবস্থিত?

কল্পোক্ত-চন্দ্রভগন
গুণিতা শশিকক্ষয়া।
আকাশকক্ষা সা জ্ঞেয়া
করব্যাপ্তিস্তথা রবেঃ॥

শশি-কক্ষাকে কল্পোক্তচন্দ্রভগণ দ্বারা গুণ করিলে আকাশ কক্ষা পাওয়া যাইবে। সূর্য্যের কিরণ এই পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এই শ্লোকের অর্থ বুঝিতে হইলে কল্প কাহাকে বলে তাহা জানা আবশ্যক সেই কল্পে চন্দ্র কতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে তাহাও প্রয়োজনীয় এবং চন্দ্র-কক্ষার পরিধি কত তাহাও জানা দরকার। সুতরাং তিনটি বিষয় [illegible] আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

পাশ্চাত্য মতে সময় বিভাগ সেকেণ্ড হইতে আরম্ভ হয়, শতাব্দী (শত বৎসর) [illegible] বিভাগ।

কিন্তু হিন্দু মতে সময় বিভাগে বড় বড় সংখ্যা আছে উহা দেখিলে অনেকের মনে হয় সময় বিভাগের এত বড় সংখ্যার প্রয়োজন কি, এবং হিন্দুগণ এইরূপ সময় বিভাগ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কি সময় নষ্ট করিতে পারিতেন না?

কাল সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মূর্ত্ত কালের সময়-বিভাগ প্রণালী নিম্নলিখিত নয় প্রকার।

ব্রাহ্ম দিব্যং তথা পিত্র্যং
প্রাজাপত্যং গুরোস্তথা
সৌরং চ সাবনং চান্দ্র
মার্ক্ষং মানানি বৈ নব।*

সময় বিভাগ প্রণালী নয় প্রকার, যথা—ব্রাহ্ম, দিব্য পিত্র্য, প্রাজাপত্য, বার্হস্পত্য, সৌর, সাবন, চান্দ্র নক্ষত্র।

সময় বিভাগ প্রণালী দেওয়া হইল। নক্ষত্র-মান —ইহার আদি বা সর্ব্বনিম্ন ভাগের নাম প্রাণ।

৬ প্রাণ=১ পল (বিনাড়ী)
৬০ পল=১ দণ্ড (ঘটিকা)
৬০ দণ্ড= অহোরাত্র (নক্ষত্র দিবস)
৩০ অহোরাত্র=১ নক্ষত্রমাস।

সাবনমান—এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কে সাবন অহোরাত্র বলে (Civil day)

৩০ সাবন অহোরাত্র = ১ সাবন মাস।

চান্দ্রমান, সৌর দিব্যমান—

> ঐন্দবস্তিথিভিস্তদ্বৎ
> সংক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে।
> মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং
> দিব্যং তদহ উচ্যতে॥

৩০ তিথিতে এক চান্দ্রমাস হয়। সংক্রান্তি হইতে সৌর মাসের গণনারম্ভ হয়।

১২ সৌর মাস = ১ সৌর বর্ষ।

১ সৌর বর্ষ—১ দিব্য অহোরাত্র।

তিথি কাহাকে বলে?

> অর্কাদ্বিনিসৃতং প্রাচীং
> যদ্যাত্যহরহঃ শশী।
> তচ্চান্দ্রমানমংশৈস্তু
> জ্ঞেয়া দ্বাদশভিস্তিথিঃ॥

সূর্য্য সমাগম হইতে পৃথক হইয়া (রাশি চক্রে) সূর্য্য হইতে ১২° অংশ অন্তর হইতে যে সময় লাগে তাহাকে ১ তিথি বলে।

চান্দ্রমাস দুই প্রকার মুখ্য ও গৌণ। শুক্লা প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে মাস গণনা হয় তাহাকে মুখ্য ও কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে মাস গণনা হয় তাহাকে গৌণচান্দ্রমাস বলে। চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী এক সমসূত্রে থাকিয়া চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হইলে অমাবস্যা এবং পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী হইলে পূর্ণিমা বলে।

অমাবস্যার পর প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমার পর অমাবস্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ।

দিব্যমান—

৩৬০ দিব্য দিন = ১ দিব্য বর্ষ।

১২০০০ দিব্য বর্ষ বা ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষে = ১ মহাযুগ।

৭১ মহাযুগ + ১ কৃত যুগ = ১ মন্বন্তর।

১৪ মন্বন্তর + ১ কৃত যুগ = ১ কল্প (এক-হাজার মহাযুগ)।

ব্রাহ্মমান—ইত্থং যুগ সহস্রেণ

> ভূত সংহারকারকঃ।
> কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং
> শর্বরীতস্য তাবতী।

এক হাজার মহাযুগবিশিষ্ট কল্প = ১ ব্রাহ্ম অহঃ। ব্রহ্মার রাত্রি পরিমাণ ও তদ্রূপ ১ কল্প। সুতরাং ২ কল্প = ১ ব্রাহ্ম অহোরাত্র।

কৃত যুগ কি? ইহার পরিমাণই বা কত?

> যুগস্য দশমোভাগ
> শ্চতুস্ত্রিদ্ব্যেক সংগুণঃ।
> ক্রমাৎ কৃতযুগাদীনাং
> ষষ্ঠাংশঃ সন্ধ্যয়োঃ স্বকঃ॥

মহাযুগের দশমাংশকে ক্রমশঃ ৪, ৩, ২, ১ দিয়া গুণ করিলে কৃত, ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের মান পাওয়া যাইবে।

এই বিভাগানুসারে—

৪৮০০ দিব্যবৎসর বা ১৭২৮০০০ সৌরবৎসর = কৃতযুগ।

৩৬০০ „ বা ১২৯৬০০০ সৌরবৎসর = ত্রেতাযুগ।

২৪০০ „ বা ৮৬৪০০০ সৌরবৎসর = দ্বাপরযুগ।

১২০০ „ বা ৪৩২০০০ সৌরবৎসর = কলিযুগ।

এখানে কৃতাদি যুগের যে মান দেওয়া গেল মনু-প্রণীত গ্রন্থে তাহার বৈষম্য দেখা

যায়। তাহার কারণ এই যে মনু-প্রণীত গ্রন্থে সন্ধ্যাংশ বাদ দিয়া মান ধরা হইয়াছে।

অতএব ১ কল্প =৪,৩২,০০,০০,০০০ সৌরবৎসর।

কেমন, সময় বিভাগে এতবড় সংখ্যা দেখিলে কি হাসি পায় না? কিন্তু এইরূপ বড় সংখ্যা দ্বারা সময় বিভাগের কি কোন কারণ ছিল না? পণ্ডিতবর (M. Bailly) বেইলি বলেন ৩১০২ খৃঃ পূঃ অব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারী মধ্যরাত্রে চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহগণ সমসূত্রে ছিল। তাঁহার মতে এই তারিখে কলিযুগোৎপত্তি হয়। যখন পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্র সমসূত্রে থাকে তখন আমরা সময় বিভাগের চান্দ্রমান গণনা করিতে থাকি, সুতরাং আরও দুই একটি গ্রহ যদি ঐ সময় সমসূত্রে থাকে তবে যে সময়বিভাগের কোন বিশেষ যুগ আরম্ভ হইবে তাহাতে হাসিবার বিষয় কি? এই জন্যই হিন্দুগণ সেই সময় হইতে কলিযুগের গণনা করেন।

এক মহাযুগে ও এক কল্পে কোন্ গ্রহ কতবার প্রদক্ষিণ করে তাহা নিম্নে দিতেছি।

এক মহাযুগে গ্রহগণের ভ্রমণ সংখ্যা—

সূর্য্য	৪৩,২০,০০০
চন্দ্র	৫,৭৭,৫৩,৩৩৬
বুধ	১,৭৯,৩৭,০৬০
শুক্র	৭০,২২,৩৭৬
মঙ্গল	২২,৯৬.৮৩২
বৃহস্পতি	৩,৬৪,২২০
শনি	·,৪৬,৫৬৮
চন্দ্রশীঘ্রোচ্চ	৪,৮৮,২০৩
চন্দ্রপাত	২,৩২,২৩৮

ইহা হইতে দেখা যায় কোন মহাযুগের প্রারম্ভে যদি এই সমুদয় গ্রহগণ, চন্দ্রমন্দোচ্চ ও চন্দ্রপাত সমসূত্রে থাকে, ৪৩,২০,০০০ বৎসর পর পুনরায় উহারা সমসূত্রে থাকিবে।

এক কল্পে গ্রহগণের ভগণ সংখ্যা—

১০০০ মহাযুগে ১ কল্প হয়, সুতরাং সমুদয় গ্রহগণ, চন্দ্রমন্দোচ্চ ও চন্দ্রপাত এক মহাযুগে যতবার প্রদক্ষিণ করে, তাহাকে ১ ০০ দিয়া গুণ করিলেই এককল্পে তাহাদের ভগণ সংখ্যা নিদ্ধারিত হইবে।

ইহা ব্যতীত—

সূর্য্যশীঘ্রোচ্চ		৩৮৭	বুধপাত		৪৮৮
বুধ	,,	৩৬৮	শুক্র	,,	৯০৩
শুক্র	.	৫৩৫	মঙ্গল	,,	২৯৪
মঙ্গল	,,	২০৪	বৃহস্পতি	,,	১৭৪
বৃহস্পতি	,,	৯০০	শনি	,,	৬৬২
শনি	,	৩৯			

ইহা হইতে দেখা যায় যে সমুদয় গ্রহগণ, তাহাদের মন্দোচ্চ ও পাত যখন সমসূত্রে থাকে তখন কল্প গণনারম্ভ হয়।

উপরে যে সংখ্যা দেওয়া হইল, তাহা সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে উদ্ধৃত। এই সংখ্যা পুলিশ কি ব্রহ্মগুপ্ত প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যার সহিত ঐক্য হইতে দেখা যায় না। ইহার কারণ এই যে গ্রহগণের গতি সকল সময় সমান থাকে না। হিন্দুগণ অয়নাংশ (Precession of the equinoxes), লম্বন (Parallax) ইত্যাদি বিষয় অবগত ছিলেন এবং এই সব বীজ সাধন-দ্বারা তাঁহারা গণিতের সংস্কার করিতে বলেন।

এই কয় প্রকার মানের কোন্ কোন্‌টি আমাদের সাধারণতঃ ব্যবহারোপযোগী?

চতুর্ভিব্যবহারোঽত্র
সৌরচান্দ্রার্ক্ষসাবনৈঃ।

বার্হস্পত্যেন ষষ্ট্যব্দং
জ্ঞেয়ং নাস্ত্যৈস্তু নিত্যশঃ ॥

এই কয় প্রকার মানের মধ্যে সৌর, চান্দ্র, নক্ষত্র, সাবন এই কয়টি ব্যবহারোপযোগী। প্রভবাদি নামক ৬০ বৎসরে বার্হস্পত্য মান গণনা করা হয়। অন্যান্য মান সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। হিন্দুগণ তাহাদের ধর্মকার্য্য সৌর এবং চান্দ্র এই উভয় মান দ্বারা বিধান করেন, মুশলমান ও চীনদেশীয়গণ শুধু চান্দ্র-মান ব্যবহার করেন। জগতে অন্য কোন জাতি এই দুই প্রকার মানের এরূপ সামঞ্জস্য করেন নাই, ইহাই প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ভবন্তি শশিনোমাসাঃ
সূর্য্যেন্দুভগণান্তরম্।
রবিমাসোনিতাস্তেতু
শেষাঃ স্যুরধিমাসকাঃ ॥

সূর্য্য ও চন্দ্রভগণের অন্তর ফল চান্দ্রমাসের সংখ্যার সমান। সৌর ও চান্দ্রমাসের অন্তরকে অধিমাস বলে।

পূর্ব্বে এক মহাযুগে সূর্য্য চন্দ্রভগণের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং তাহা হইতে চান্দ্রমাস সংখ্যা ৫,৩৪,৩৩,৩৩৬ বাহির করা যায়।

এক মহাযুগে চান্দ্রমাস সংখ্যা		৫,৩৪,৩৩,৩৩৬০
	সৌরমাস	৫,১৮ ৪০,০০০
সুতরাং	অধিমাস	১৫,৯৩,৩৩৬

ইহা হইতে গণিতদ্বারা সহজেই বাহির করা যায় যে প্রায় ৩৩·৫৩৫৫ চান্দ্রমাসে ৩২·৫৩৬০৩ সৌরমাস হয়। এই জন্য পঞ্জিকাকারগণ প্রায় ২ বৎসর ৮ মাস পরে ১ মাস মলমাস গণনা করেন এবং সেই মাসে কোনরূপ দৈবকার্য্য নিষিদ্ধ।

এইরূপে চান্দ্র ও সৌরমাসের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, কিন্তু সাবন (Civil) ও চান্দ্র মাসের মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়?

সাবনাহানিচান্দ্রেভ্যোহ্যুভ্যঃ
প্রোজ্ঝ্যতিথিক্ষয়াঃ।
উদয়াদুদয়ং ভানোর্ভূ
মিসাবন বাসরাঃ ॥

চান্দ্র ও সাবন দিনের অন্তরফল তিথিক্ষয় সংখ্যা (Subtractive days)

এক মহাযুগের ১,৫৭,৭৯,১৭,৮২৮ সাবন দিন ও ১,৬০,৩০,০০,০৮০ চান্দ্র দিন। সুতরাং ২,৫০,৮২,২৫২ তিথিক্ষয়। সামান্য গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করা যাইতে পারে ৬৩ ৯০৯৭ চান্দ্র দিনে ৬২.৯০৯৭ সাবন দিন হয়।

ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করের মতানুসারে ৬৪$\frac{1}{55}$ তিথিতে এক অবম বা তিথি ক্ষয় হয়। ব্রহ্মগুপ্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থলিখিত মহাযুগের দিন সংখ্যা না লইয়া অন্য সংখ্যা নিয়াছেন, ইহাই এই সামান্য পার্থক্যের কারণ।

এখন হিসাব করিলে আকাশকক্ষার পরিমাণ পাওয়া যাইবে।

চন্দ্রকক্ষার পরিধি	৩,২৪,০০০	যোজন
বুধশীঘ্রোচ্চ	১০,৪৩,২০৯	,,
শুক্রশীঘ্রোচ্চ	২৬,৬৪,৬৩৭	,,
সূর্য্য, বুধ ও শুক্র ,,	৪৩,৩১,৫০০	,,
মঙ্গল	৮১,৪৬,৯০৯	,,
বৃহস্পতি	৫,১৩,৭৫,৭৬৪	যোজন
শনি	১২,৭৬,৬৮,২৫৫	,,
নক্ষত্র	২৫,৯৮,৯০,০১২	,,
ব্রহ্মাণ্ড	১৮,৭১,২০,৮০,৮৬,৪০,০০,০০০	,,
চন্দ্রশীঘ্রোচ্চ	৩,৮২,২৮,৪৮৪	,,
চন্দ্রপাত	৮,০৫,৭২,৮৬৪	,,

আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতানুসারে সূর্য্যসিদ্ধান্তের শুধু চন্দ্রকক্ষা ভিন্ন অন্য কোন কক্ষার পরিমাণের ঐক্য দেখা যায় না।

পৃথিবীর ব্যাস জানা থাকিলে পৃথিবীব পরিধি বাহির করিবার নিয়ম হইতেই বৃত্তাকার গ্রহকক্ষার পরিমাণ জানা থাকিলে গ্রহগণের দূরত্ব, ও গ্রহগণের দূরত্ব জানা থাকিলে বৃত্তাকার গ্রহকক্ষার পরিমাণ জানা যায়।

যোজনানি শতান্যষ্টৌ
ভূকর্ণোদ্বিগুণানি তু।
তদ্বর্গতো দশগুণাৎ
পদং ভূপরিধির্ভবেৎ॥

পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন, ইহাকে ১০এর বর্গমূল দ্বাবা গুণ করিলে পবিধি জানা যাইবে।

উপরে মহাযুগে গ্রহগণের ভগণ সংখ্যা হইতে গ্রহগণ একবার আবর্ত্তনে যত সময় লাগে তাহা পাওয়া যায়। তুলনার্থ ইংরেজী গ্রন্থ হইতেও সময় উদ্ধৃত হইল।

Sidereal period

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে

	দিন
সূর্য্য	৩৬৫·২৫৮৭৫
চন্দ্র	২৭·৩ ১৬৭
চন্দ্রপাত	৬৭৯৪·৪৪৩
চন্দ্রশীঘ্রোচ্চ	৩২৩১·২
বুধ	৮৭·৯৬৯৭
শুক্র	২২৪·৬৯৭৯২
মঙ্গল	৬৮৬·৯৯৭৫
বৃহস্পতি	৪৩৩২·৩২০৬
শনি	১০৭৬৫·৭৭৩

ইংরেজী গ্রন্থমতে

	দিন
সূর্য্য	৩৬৫·২৫৬৩৬
চন্দ্র	২৭·৩২১৬৬১৪১৮
চন্দ্রপাত	৬৭৯৩·৩৯১০৮
চন্দ্রশীঘ্রোচ্চ	৩২৩২·৫৭৫৩৪৩
বুধ	৮৭·৯৬৯২৫
শুক্র	২২৪·৭০০৭৮৬৯
মঙ্গল	৬৮৬·৯৭৯৬৪৫৮
বৃহস্পতি	৪৩৩২·৫৮৮৪২১১
শনি	১০৭৫৯·২২৯৮১৭৪

সূর্য্য ও পৃথিবীর সহিত সমসূত্র হইবার সময়

(Synodic period)

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে

	দিন
চন্দ্র	২৯·৫৩০৫৮৬
বুধ	১১৫·৮৮
শুক্র	৫৮৩·৯
মঙ্গল	৭৭৯·৯২৪
বৃহস্পতি	৩৯৮·৮৯
শনি	৩৭৮·০৮

ইংরেজী গ্রন্থমতে

	দিন
চন্দ্র	২৯·৫৩০৫৮৮
বুধ	১১৫·৮৭৭
শুক্র	৫৮৩·৯২
মঙ্গল	৭৭৯·৯৩৬
বৃহস্পতি	৩৯৮·৮৬৭
শনি	৩৭৮·০৯

উপরোক্ত তালিকাদ্বয় হইতে দেখা যায় প্রাচীন হিন্দুমতে ও আধুনিক মতে পার্থক্য

প্রায়ই নাই, দুই এক স্থলে সামান্য একটু-মাত্র।

হিন্দুগণের মাসের নামও বৈজ্ঞানিক উপায়ে উদ্ভাবিত অন্য কোন জাতি এরূপ নামকরণ করেন নাই। ইহাও প্রাচীন হিন্দু-জ্যোতিষের আর একটি কীর্ত্তিসৌধ।

ভচক্রভ্রমণং নিত্যং
নাক্ষত্রং দিনমুচ্যতে।
নক্ষত্রনাম্না মাসাস্তু
জ্ঞেয়াঃ পর্বান্তযোগতঃ

রাশিচক্র পরিভ্রমণ দ্বারা পূর্ণিমাধিষ্ঠিত নক্ষত্র হইতে মাসগুলির নাম উৎপন্ন হয়

নক্ষত্র কি ?

রাশিচক্রকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলে এক রাশি হয়।

রাশিচক্রকে সপ্তবিংশ ভাগে বিভক্ত করিলে এক নক্ষত্র হয়। সওয়া দুই নক্ষত্রে এক রাশি হয়।

অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ইত্যাদি ২৭টি নক্ষত্রের নাম। সত্যই যে রাশিচক্রে সাতাশটি মাত্র নক্ষত্র আছে তাহা নহে, কিন্তু যতগুলি নক্ষত্র আছে তাহাকে ২৭ স্তূপে (Group) ভাগ করিলে যে এক একটি পুঞ্জ পাওয়া যায়, এই ২৭টি নক্ষত্র তাহাদের মধ্যে প্রধান তারা।

এই রাশিচক্রের সপ্তবিংশ ভাগে বিভাগ প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের আর একটি অতুলনীয় কীর্ত্তি।

নক্ষত্রের নাম	মাসের নাম।
বিশাখা	বৈশাখ।
জ্যেষ্ঠা	জ্যৈষ্ঠ।
পূর্ব্বাষাঢ়া	আষাঢ়।
শ্রবণা	শ্রাবণ।
পূর্ব্বভাদ্রপদ	ভাদ্র।
অশ্বিনী	আশ্বিন।
কৃত্তিকা	কার্ত্তিক।
মৃগশিরা	মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ)
পুষ্যা	পৌষ।
মঘা	মাঘ।
উত্তরফল্গুনী	ফাল্গুন।
চিত্রা	চৈত্র।

বিশাখা নক্ষত্রে পূর্ণিমার দিবসে বৈশাখ মাসের আরম্ভ হয় তদ্রূপ অন্যান্য মাস।

গ্রহণ কিরূপে সংঘটিত হয় ?

ছাদকো ভাস্করস্যেন্দু
রধঃস্থো ঘনবদ্ভবেৎ।
ভূচ্ছায়াং প্রাঙ্মুখশ্চন্দ্রো
বিশত্যস্য ভবেদসৌ॥

চন্দ্র অধঃ কক্ষাতে ভ্রমণ করিয়া মেঘের ন্যায় সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, তাহাকে সূর্য্য গ্রহণ বলে পূর্ব্বাভিমুখগামী চন্দ্র যখন পৃথিবীর ছায়াতে প্রবেশ করে, তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়।

ইহা হইতে প্রমাণীকৃত হয় অমাবস্যাতে সূর্য্যগ্রহণ এবং পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং বাস্তবিক চন্দ্রের স্বকীয় কোন আলোক নাই; নচেৎ গ্রহণ সময়ে আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাইতাম। চন্দ্রের স্বীয় কোন আলো নাই, তৎসম্বন্ধে অন্য এক স্থানে আছে—

তরণিকিরণসঙ্গাদেষ পীযূষপিণ্ডো
দিনকরদিশি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।
তদিতরদিশি বালাকুন্তলশ্যামলশ্রী
র্ঘটইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ॥

সব পূর্ণিমাতে কি অমাবস্যাতে কেন গ্রহণ হয় না ?

চন্দ্রকক্ষার বিক্ষেপ (Inclination) ইহার এক কারণ ; চন্দ্র কোন পাত সন্নিকটস্থ না হইলে গ্রহণ হইতে পারে না ইহাই অন্যতম কারণ।

ভানোর্ভার্দ্ধে মহীচ্ছায়া
তত্তুল্যেঽর্কসমেঽপিবা।
শশাঙ্কপাতে গ্রহণং
কিয়দ্ভাগাধিকোনকে॥

পৃথিবীর ছায়া সূর্য্য হইতে ৬ রাশি অর্থাৎ ১৮০ অংশ দূরে অবস্থিত, যখন চন্দ্রপাত স্থল সূর্য্য হইতে ১৮০ অংশ দূরে থাকে তখন গ্রহণ হয়, কিন্তু যদি চন্দ্রপাত ছায়াস্থানের কতক অংশ ব্যবধানে (সম্মুখে বা পশ্চাতে) থাকে তবুও গ্রহণ হইবে।

সাধারণ বিশ্বাস যে রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করাতে গ্রহণ হয়, বাস্তবিক তাহা জ্যোতির্ব্বিদের মত নহে। তবে দুই প্রকার মতের এই ভাবে সামঞ্জস্য করা যায় যে, রাহু নামক কোন জীব চন্দ্র কি সূর্য্যকে গ্রাস করে না, কিন্তু রাহু নামক পদার্থের নিকটে চন্দ্র সূর্য্য থাকিলে গ্রহণ হয়।

রাহু জিনিষটি কি ?

দক্ষিণোত্তরতোঽপ্যেব
পাতো রাহুঃ স্বরংহসা।
বিক্ষিপ্যতোষ বিক্ষেপং
চন্দ্রাদীনামপক্রমাৎ॥

আত্মবেগহেতু গ্রহগণকে স্বীয় কক্ষাতে দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে ও উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

চন্দ্রকক্ষা সূর্য্যকক্ষার সমতলকে যে বিন্দুদ্বয়ে ছেদ করে, তাহার একটিকে (Ascending node) রাহু বলে। চন্দ্র, পাতের নিকটবর্ত্তী হইলে গ্রহণ হয় এই জন্যই বলা হয় যে চন্দ্র রাহুর নিকটবর্ত্তী বা রাহু কর্ত্তৃক গ্রস্ত না হইলে গ্রহণ হয় না।

প্রাচীন হিন্দুজ্যোতিষ গ্রন্থে নিম্নলিখিত যন্ত্রসমূহের নাম পাওয়া যায়।

কপালযন্ত্র — Clepsydra
নাড়ীবলয় — Equatorial
শঙ্কু — Gnomon
চক্রযন্ত্র — Instrument for taking the sun's altitude and zenith distance.
যষ্টিযন্ত্র — Staff (Instrument for ascertaining the time of the day).

গ্রহণ গণনা ও পঞ্জিকাগণনার আবশ্যকীয় অন্যান্য বিষয় প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষগ্রন্থে দেওয়া আছে। গণিতের সাহায্য ব্যতীত তাহা বোধগম্য হয় না। ঋতু পরিবর্ত্তন, শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ, এই সব বিষয় লিখিতে হইলে চিত্রের প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এই সব বিষয় বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

কোবিদবর ৺চন্দ্রনাথ বসুর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে।

আবার নিবিল এক রতন প্রদীপ
বঙ্গের সাহিত্যাকাশ হ'তে পুনরায়.
ভাসায়ে শোকের নীরে বঙ্গবাসীগণে
সুধীবর চন্দ্রনাথ গেছে স্বর্গধামে।

যাও সুধী, যাও সেই শান্তি নিকেতনে.
কিন্তু শূন্য বঙ্গদেশ তোমার বিহনে
আজি। যেইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম
মোরা, তোমার বিহনে হবে না পূরণ

আর তার কোনকালে। যেই উপকার
করিয়াছ দীনহীন বাঙ্গালীর তুমি
সংস্কারের বীরব্রত করিয়া গ্রহণ,
ভুলিবে না বঙ্গবাসী কোন কালে তাহ।

প্রতীচীর জ্ঞানেগুণে মুগ্ধ হয়ে তুমি,
শ্রদ্ধাহীন হয়েছিলে নবীন বয়সে
স্বদেশীর পুণ্যতত্ত্বে, কিন্তু পরিণামে
বহুদর্শনের ফলে লভি অভিজ্ঞতা

হয়েছিল অপনীত সেই মোহ তব।
তার ফলে পক্ষপাতী হয়েছিলে তুমি
প্রাচীনের—হয়েছিলে অনুরক্ত
আর্য্যের সভ্যতা আর জ্ঞান বিজ্ঞানের।

সূচনা করিলা যার মনস্বী ভূদেব
গুরু তব, আজীবন তুমি তার
করেছ পালন, কিন্তু ছিলে তুমি
কঠোর রক্ষণশীল ভূদেবেরও চেয়ে।

যৌবন বয়সে তুমি ছিলে অনুরাগী
ইংরেজী সাহিত্য প্রতি, কিন্তু পরিণামে
বঙ্গের অমর কবি বঙ্কিম সংসর্গে
বঙ্কিমের উপদেশে, উজ্জ্বল আদর্শে

মাতৃভাষা সেবাব্রতে হয়েছিলে ব্রতী।
পরতিষ্ঠা যেত তুমি লভেছিলে তাহে,
তাহার অমৃত ফল ভুঞ্জিবে বাঙ্গালী
রহিবেক চিরঋণী তারা তব পাশে।

নবভাব প্রতিকূলে জীবন সংগ্রামে
সাধিলে যে উপকার বাঙ্গালার তুমি,
নারিবে ভুলিতে তাহা কভু বঙ্গবাসী,
পূজিবে মানসপটে চিরকাল তোমা।

যাও সুধী, যাও সেই শান্তিনিকেতনে।
দেহ এই আশীর্ব্বাদ স্বদেশবাসীরে,
তোমাদের আদর্শেতে উপকৃত হয়ে,
লভে যেন মনুষ্যত্ব জগতে তাহারা।

উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যাঁহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে জীবের উপাধি নিত্য। কোন কালেই জীবের উপাধিত্ব ঘুচে না, সুতরাং মুক্তিও হয় না। জন্ম জন্মান্তরে ভগবানের দাসত্ব ভিন্ন, তাঁহাদের আর প্রার্থনীয় কিছু নাই। দ্বৈতবাদীরা বলে ""আমরা চিনি হইতে চাহি না, চিনি খাইতে ভালবাসি।" অর্থাৎ ঈশ্বরে মিশিয়া যাওয়া অপেক্ষা ঈশ্বরোপাসনার আনন্দোপভোগ করাই পরম পুরুষার্থ। অদ্বৈতবাদীগণ বলে, জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে, তাহা ভ্রমমূলক। ব্রহ্ম শব্দে যাহাকে বুঝায়, আমিও তাহাই। কেবল আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অভাবেই আমি আমাকে চিনি না। "ব্রহ্মচিন্তারূপ অগ্নিতে নিজের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, অভিমান সমস্ত আহুতি প্রদান করাই প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মোপাসনা।" আমি ভগবানের দাস এরূপ অভিমান অপেক্ষা, আমি কিছুই নহি, তিনিই সকল, ইহা অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের জ্ঞান আর কিছু হইতে পারে না। ইহা প্রধানভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই উপনিষদে অদ্বৈতজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে। তবে যে, কোন কোন উপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দ্বিবিধ আত্মা বলা হইয়াছে, কোন্ কোন উপনিষদে বা বাহ্যাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা এই তিন প্রকার আত্মা স্বীকার করা হইয়াছে, উহা কেবল অজ্ঞানাবস্থার ব্যবহারিক সংজ্ঞামাত্র। যোগসাধন দ্বারা ঐরূপ ভেদবুদ্ধির অপগম হওয়াই প্রকৃত আত্মতত্ত্বোপদেশ।

ওম্ অথাঙ্গিরাস্ত্রিবিধপুরুষস্তন্তথা বাহ্যাত্মা অন্তরাত্মা পরমাত্মেতি। জায়তে ম্রিয়তে ইতি বাহ্যাত্মা। শ্রোতা ঘ্রাতা, রসায়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মাপুরুষঃ পুরাণং ন্যায় মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রানীতি শ্রবণ ঘ্রাণাকর্ষণ কর্ম্ম বিশেষণং করোতি এষোঽন্তরাত্মানাম। সর্ব্বব্যাপী সোঽচিন্ত্যোঽবর্ণ্যশ্চ নাত্যশুদ্ধাত্মপুতানি নিক্রিয়ঃ সংস্কারো নাস্তি ইত্যেষ পরমাত্মাপুরুষোনাম এষপরমাত্মা পুরুষোনাম। অথ পরমাত্মানাম যথাক্ষরমুপাসনীয়ঃ। স চ প্রাণায়াম প্রত্যাহার সমাধি যোগানুমনোধ্যাত্মচিন্তনম্। (আত্মোপনিষৎ।)

অনুবাদ। অঙ্গিরা নামক ঋষি প্রজাপতির নিকটে কহিয়াছিলেন,আত্মা ত্রিবিধ। বাহ্যাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা। যাহার চক্ষু শ্রোত্রাদি আছে,এবং যাহা ষড়্বিধ বিকারযুক্ত অর্থাৎ যাহা জন্মিতেছে, বিদ্যমান আছে, বৃদ্ধি পাইতেছে, অবস্থান্তর ঘটিতেছে, ক্ষয় পাইতেছে ও বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে তাহা বাহ্যাত্মা। যিনি শ্রবণ করিতেছেন, আঘ্রাণ করিতেছেন, আস্বাদ করিতেছেন, মনন করিতেছেন, যিনি বোদ্ধা, যিনি কর্ত্তা, যিনি বিজ্ঞানময় পুরুষ, যিনি পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র, যিনি শ্রবণ, আঘ্রাণ

ও আকর্ষণাদি বিশিষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি অন্তরাত্মা। এই বাহ্যাত্মা ও অন্তরাত্মা উভয়টিই উপনিষদ্বিশেষে জীবাত্মা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পরমাত্মার সংক্ষিপ্ত লক্ষণ বলা যাইতেছে। তিনি সর্ব্বব্যাপী। বাস্তবিক পরমাত্মার অণু বা মহত্ত্বাদি কোন পরিমাণ নাই। ভগবান্ স্বমহিমা দ্বারা সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন, অতএব সেই ঈশ্বর কাহারও চিন্তার বিষয় ও বর্ণনার বিষয় নহে। তিনি নিষ্ক্রিয়, তথাপি অপবিত্র চণ্ডালাদি জাতিকে পবিত্র করেন, অর্থাৎ অপবিত্র চণ্ডালাদি জাতি যদি তাঁহাকে ধ্যান করেন, তবে তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করেন। যদিও আগমশাস্ত্রে চতুর্থ জ্ঞানাত্মা বলিয়া কথিত আছে অর্থাৎ শরীরাত্মা অন্তরাত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই চতুর্ব্বিধ আত্মভেদ লিখিত আছে, তথাপি জীব ও পরমাত্মার অভেদহেতু এই উপনিষদে ত্রিবিধ আত্মা কথিত হইয়াছে। গীতাতেও লিখিত আছে, ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর এই দ্বিবিধ পুরুষ বলিয়া কথিত আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বভূত ক্ষর এবং যিনি কূটস্থ তাঁহাকে অক্ষর বলে। আর যিনি এতদ্ভিন্ন পুরুষ তিনিই পরমাত্মা, সেই পরমাত্মাই উপাসনীয়। প্রাণায়াম প্রত্যাহার সমাধি প্রভৃতি যোগদ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। অতঃপর যোগাঙ্গ সকল সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

চিত্ত স্থির করাই যোগের উদ্দেশ্য। যেমন মৃত্তিকার নীচে সর্ব্বত্রই জল আছে, সেইরূপ এই দেহমধ্যে সমস্ত নাড়ীতেই যে বায়ু চলিত হইতেছে, উহার সাধারণ নাম প্রাণ। ঐ প্রাণের পরিস্পন্দন বশতঃ সংসারভাবোন্মুখী যে চিতিশক্তি উৎপন্ন হইতেছে, তাহাকেই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ চিত্ত বলিয়া থাকেন। প্রাণের স্পন্দনে চিদ্বৃত্তির বিকাশ হয়, চিদ্বৃত্তির বিকাশেই সংসার ভাবের বিকাশ হয়, সংসারভাবের বিকাশ হওয়াতে মিথ্যা জগৎ সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। যেমন জলের পরিস্পন্দনে ভ্রমবশতঃই জলাতিরিক্ত গোলাকৃতি আবর্ত্ত দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চিত্তের স্পন্দনেই অসত্য জগৎ সত্য বলিয়া ভ্রম হইতেছে। যেমন পুষ্প ও তাহার সৌরভ অভিন্ন, যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি নিত্যসংশ্লিষ্ট, সেইরূপ চিত্ত ও তাহার স্পন্দন এই দুইটি ভেদশূন্য। তবে যে তাহাদের ভেদ ধরা যায়, উহা আভিধানিকমাত্র, স্বরূপতঃ নহে। ঐ চিত্ত ও তাহার স্পন্দন অর্থাৎ চাঞ্চল্য এই দুইটির মধ্যে একটির ধ্বংস হইলে, অপরটি আপনিই নষ্ট হইয়া যায়। কারণ গুণী ও গুণ এই দুইটির মধ্যে একের নাশে অপরের পরিচয়ের সম্ভাবনা থাকে না। যোগ ও জ্ঞান এই দুইটিতেই ক্রমিক চিত্তনাশ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চিত্তের ব্যাপার নিরোধকে যোগ ও বস্তুর যথাবৎ দর্শনকে জ্ঞান কহে।

যদাপঞ্চাবতিষ্ঠন্তে
জ্ঞানানিমনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চন বিচেষ্টতি-
তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে
স্থিরামিন্দ্রিয় ধারণাম্।
অপ্রমত্ত স্তদা ভবতি
যোগোহি প্রভবাপায়ৌ॥

(কঠোপনিষৎ।)

'অনুবাদ। যে সময়ে শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্ব স্ব বিষয় হইতে

নিবর্ত্তিত হইয়া আত্মাতে প্রত্যাহৃত হয়, এবং অধ্যবসায়লক্ষণা বুদ্ধি স্বব্যাপারে চেষ্টা শূন্য হয়, সেই অবস্থাকে পরমা গতি বলে। সেই অবস্থায় বাহ্যান্তঃকরণের ধারণ সকল স্থির হয়। এই অবস্থাকেই যোগ কহে। যে সময়ে যোগমার্গে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, সেই সময়ে অত্যন্ত সাবধান হইবে। কারণ যোগ দ্বারা যেমন আত্মোন্নতির সম্ভাবনা আছে তেমনি অপায়েরও সম্ভাবনা আছে।

হিন্দুধর্ম্মরূপ সুরম্য প্রাসাদটি যোগরূপ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সেই ভিত্তিটি এত দৃঢ় যে, তৎপভাবে ঐ সৌধটি এতাবৎকাল অব্যাহতভাবে আছে। বিরুদ্ধ ধর্ম্মবলম্বীগণও হিন্দুদিগের অলৌকিক যোগ-শক্তির মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। যোগবলেই ইন্দ্র স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। যোগবলেই কুবের ধনাধিপ হইয়াছেন। অল্প কথায় বলিতে গেলে দেবত্ব, যোগফল ভিন্ন কিছুই নহে। দেবগণের মধ্যে আবার বিষ্ণুই মহাযোগী হইয়া যোগ শিক্ষা বিষয়ে সকলের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন।

বিষ্ণুর্নাম মহাযোগী
মহাকায়ো মহাতপঃ।
তত্ত্বমার্গে যথা দীপো
দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ॥
(যোগতত্ত্বোপনিষৎ।)

অনুবাদ। বিষ্ণুই একমাত্র মহাযোগী, অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় যোগপরায়ণ আর দ্বিতীয় নাই। ইনি মহাকায় অর্থাৎ ইঁহার দেহে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড আছে। ইনি মহা তপস্বী। তপঃ প্রভাবেই ইনি পুরুষোত্তম হইয়াছেন। এই বিষ্ণু প্রদীপের ন্যায় তত্ত্ব-মার্গের প্রকাশক।

ওঙ্কারং রথমারুহ্য
বিষ্ণুং কৃত্বাতু সারথিম্।
ব্রহ্মলোক পদান্বেষী
রুদ্রারাধন তৎপরঃ॥
তাবদ্রথেন গন্তব্যং
যাবদ্রথ পতিস্থিতঃ।
ছিত্বারথ পথস্থানং
রথমুৎসৃজ্য গচ্ছতি॥
(অমৃতবিন্দূপনিষৎ।)

অনুবাদ। ওঙ্কাররূপ রথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুকে সারথ প্রদানপূর্ব্বক রুদ্রদেবের আরাধনায় তৎপর থাকিবে। "ওঁ" বলিতে অ, উ ম, এই তিনটি অক্ষর আছে। অকারের দেবতা যে ব্রহ্মা উহা ব্রহ্মলোকে গমন করে। উকারের দেবতা বিষ্ণু তিনি লোক সকলকে উর্দ্ধলোকে গমন করান, এই জন্য তাঁহাকে সারথি বলা হইয়াছে। মকারের দেবত রুদ্র বা পরমাত্মাই উপাস্য।

সেই পর্য্যন্তই রথে যাইতে হয় যে পর্য্যন্ত রথ পথিমধ্যে থাকে। পরে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলে যেমন রথকে পরিত্যাগ করিতে হয় সেইরূপ যাবৎ ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব না হয়,তাবৎ ওঙ্কারের উপাসনা করিবে। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হইলে আর ওঙ্কারের উপাসনার আবশ্যক নাই।

বিষ্ণু যেমন যোগমার্গের প্রধান আদর্শ, তেমনই "ওঙ্কার" একমাত্র প্রধান মন্ত্র। সমস্ত বেদকে একমাত্র প্রণবের টীকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যিনি ওঙ্কারের অর্থ বুঝিয়াছেন, যিনি জগৎকে ওঙ্কারময় ভাবিতে

অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে যোগ ফল লাভ করিবার একমাত্র অধিকারী। সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে এই ওঙ্কাররূপ মহামন্ত্রটি উচ্চারিত হইয়া বেদসাররূপে এবং প্রকৃত অধিকারী মানবদিগের পরিত্রাতৃরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রজাপতিঃ লোকানামভ্যতপং। তেভো-ইভ্যতপ্তেভ্যস্ত্রয়ীবিদ্যা সম্প্রাস্রবত্তামভিতপদ্বস্যা অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্ত ভূ র্ভুব স্বরিতি।

(ছান্দোগোপনিষৎ।)

অনুবাদ। বিরাট পুরুষ প্রজাপতি লোকদিগকে উদ্দেশ করিয়া তাহাদের সার গ্রহণ মানসে তপস্যা করিলেন। সেই সকল অভিতপ্ত লোক হইতে প্রজাপতির মনে সমস্ত লোকের সারভূতা ত্রয়ী বিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর প্রজাপতি সেই ত্রয়ী বিদ্যাকে অভিতপ্ত করিলেন। তাহা হইতে ভূ প্রভৃতি তিনটি ব্যাহৃতি হইল। সেই তিনটি অভিতপ্ত করাতে তাহা হইতে ওঙ্কার উৎপন্ন হইল। সুতরাং ওঙ্কার সকলের সার। উহাতে না আছে এমন বিষয়ই নাই।

ততদেবাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা
লোকাবেদাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
ত্রিস্রোমাত্রর্দ্ধমাত্রাচ
ত্র্যক্ষরশ্চ শিবস্তুচ॥

(ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ।)

অনুবাদ। ওঙ্কারে তিন দেব, (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব), তিন লোক (পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ), তিন বেদ (ঋক্, যজুঃ ও সাম), তিন অগ্নি (গার্হপত্যাগ্নি, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় অগ্নি) বিদ্যমান আছে। সেই প্রণবে ত্র্যক্ষরাত্মক শিবের ত্রিমাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রা বিদ্যমান আছে, ইহাই প্রণবের স্বরূপ। অ, উ, ম এই তিন অক্ষরে প্রণব হইয়াছে। এক একটি দেব, লোক, বেদ ও অগ্নি এক এক অক্ষরের স্বরূপ। যথা ব্রহ্মা পৃথিবী, ঋগ্বেদ ও গার্হপত্যাগ্নি হইয়া অকারের স্বরূপ। বিষ্ণু, অন্তরিক্ষ, যজুর্ব্বেদ ও দক্ষিণাগ্নি ইহারা উকারের স্বরূপ। পরমেশ্বর (শিব), স্বর্গ, সামবেদ ও আহবনীয় অগ্নি ইহারা মকারের স্বরূপ।

অগ্নীষোমৌপক্ষাবোঙ্কারঃ শিরোবিন্দুস্ত নেত্রং মুখং রুদ্রো রুদ্রাণীচরণৌ বাহুকালশ্চাগ্নি শ্চোভে পার্শ্বে ভবতঃ।

(হংসোপনিষৎ।)

অনুবাদ। হংস পক্ষিরূপ, অতএব পক্ষিরূপে তাহার ধ্যান কর্ত্তব্য। অগ্নি ও সোম এই দুইটি তাহার দুইটি পাখা। যেহেতু ঐ পক্ষদ্বয় হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ওঙ্কার ইহার শির অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ। জগতের প্রকাশত্ব হেতু বিন্দু ইহার নেত্র। সর্ব্ববচন-কর্ত্তৃত্ব হেতু রুদ্র ইহার মুখ, সর্ব্বাধারহেতু রুদ্রাণী ইহার কারণ। সর্ব্বকর্ত্তৃত্বহেতু কাল ও অগ্নি ইহারাই হংসের বাহুদ্বয়। পরমাত্মাকে রূপকরূপে বর্ণন করিবার সময় ওঙ্কারকে মস্তক বলিয়া বর্ণনা করাতে ওঙ্কারের মাহাত্ম্য উত্তমরূপেই প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রণবের বিষয় উপনিষদে এতই বাহুল্য-ভাবে বর্ণিত আছে যে, তাহা লিখিতে গেলে বহুবিস্তৃত পুস্তক হইয়া উঠে। অথবা বহু প্রকারে লিখিয়াও উহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে কাহারও সাধ্য নাই। এরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, কোন পণ্ডিত স্বকীয়

বিদ্যাবত্তায় নিরতিশয় অহঙ্কৃত হইয়া তাঁহার সমকালবর্ত্তী পণ্ডিতমণ্ডলীকে আপন অপেক্ষা মহামূর্খ মনে করিয়া হতাদর করিতেন। ইতি মধ্যে একশত খানি গাড়ী বোঝাই পুস্তকসহ পুস্তকরক্ষককে আসিতে দেখিয়া সেই পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পুস্তকগুলি কাহার এবং ইহাতে কি কি পুস্তক আছে? তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় বলিলেন যে, এই সকল গাড়ী বোঝাই পুস্তকে প্রণবের টীকা আছে। যেমন ১০০ খানি গাড়ী বোঝাই পুস্তক দেখিলেন, ঐরূপ আরও ৯০০খানি গাড়ী পশ্চাতে আছে। এই এক সহস্র গাড়ী বোঝাই পুস্তক অদাকার মত লইয়া যাওয়া হইতেছে। প্রণবেব অবশিষ্ট টীকাগুলি প্রতিদিন এক সহস্র গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া গেলে কত বৎসরে সমস্ত পুস্তক নির্দ্দিষ্ট স্থানে লওয়া শেষ হইবে, এখনও বলা যাইতেছে না। সেহ অহঙ্কাবী পণ্ডিত তাহা শুনিয়া ভাবিলেন "যথন একমাত্র প্রণবের অসংখ্য টীকা আছে, তখন আমার কিছুই শিক্ষা হয় নাই।"

শাস্ত্রপ্রমাণ সকল পাঠ করিয়া ও দেশপ্রচলিত ঐ গল্পটির উপর নির্ভর করিয়া আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি প্রণব এক স্বর্গীয় পদার্থ। অথবা স্বর্গীয় হইতে যদি কোন উচ্চ বিশেষণ ভাষায় থাকিত তবে তাহা দ্বারা ইহার উৎকর্ষতার পরিচায়ক হইলেও হইতে পারিত। একমাত্র সাঙ্কেতিক অক্ষর, সংসার উত্তীর্ণ হইবার সাধন কি প্রকারে হইতে পারে, এ বিষয়ে কোন প্রকারে সন্দিগ্ধ হইবার কারণ নাই। যে পরমেশ্বর সূক্ষ্ম শুক্রকীট মধ্যে পিতার সমস্ত গুণসহ অপত্যোৎপাদিকাশক্তি দিয়াছেন, যে পরমেশ্বর সূক্ষ্মবীজ মধ্যে বৃক্ষের কাণ্ডশাখা পুষ্পপল্লবাদির গূঢ়াবস্থিতত্ব রাখিয়াছেন, সেই পবমেশ্বব যে একটি মিলিত অক্ষরের মধ্যে জগতের সমস্ত পদার্থের সার রাখিতে পারেন, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

—*—

বন-ফুল। শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৷৷৹ আট আনা।

আজকালকার দিনে গীতি-কবিতা পড়িয়া এমন প্রীতি সচরাচর পাওয়া যায় না। ব্যর্থ অনুকরণের উপদ্রবে আমাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবুর কবিতা পড়িবার পর বাঙ্গালা ভাষায় আধুনিক অন্য গীতিকবিতা পড়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ও সময়ের অপব্যবহার। আজকাল্ দুই একজনের কবিতা পড়িয়া আমাদের সে ধারণা কতকটা দূর

হইয়াছে। সেই দুই একজনের মধ্যে শ্রীমান্ মোহিনীমোহন এক জন।

মোহিনীমোহনের ব্যক্তিত্ব, সুতরাং মৌলিকত্ব, আছে। ইনি অন্ধভাবে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া কাহারও অনুবর্ত্তন করেন না। তবে পূর্ব্ববর্ত্তী পতিভাশালী লেখকদিগের কিয়ৎপরিমাণ অনুকরণ পশ্চাদ্বর্ত্তী লেখকদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য। তেমন অনুকরণ এই পুস্তকেও আছে। কিন্তু তাহা অতি সামান্য। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ কিছু আছে, কিন্তু তাহা প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ করিলাম না, কেননা তেমন দোষ আপনা হইতেই ক্রমে সারিয়া যায়। মোহিনী বাবু 'উপাসনাতেও' মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিয়া থাকেন এবং এই পুস্তকের অন্তর্গত দুই চারিটি কবিতা 'উপাসনায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। আত্মোৎকর্ষসাধনে যত্নবান থাকিলে মোহিনী বাবু যে কালে যশস্বী হইতে পারিবেন এমন আশা করা যায়।

অমৃত। শ্রীরজনীকান্ত সেন প্রণীত। মূল্য।০ চারি আনা।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বাবু এক্ষণে সঙ্কটাপন্ন পীড়িত অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শয্যাগত হইয়া রহিয়াছেন। সাধারণতঃ মানুষ বিশেষতঃ বাঙ্গালী, সামান্য একটু রোগের যন্ত্রণায় ইহকাল পরকাল ভুলিয়া যায়। আর রজনীকান্ত বাবু? তাঁহার নিজের মর্ম্মন্তুদ কথাতেই—

"নয়নের আগে মোর মৃত্যু বিভীষিকা,
রুগ্ন, ক্ষীণ, অবসন্ন এ প্রাণ কণিকা।"

এই অবস্থাতেও তিনি বালকবালিকাগণের নীতিশিক্ষাবিধানের জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। দেশের প্রতি, ভাষার প্রতি, সাহিত্যের প্রতি তাঁহার কত যে অনুরাগ, কত যে মমতা, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। এমন আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত সংসারে বড়ই বিরল। এমন মানুষকে কি ভগবান রোগমুক্ত করিবেন না।

পুস্তকের 'অমৃত' নাম সার্থক হইয়াছে। ইহা বাস্তবিকই অমৃতের কণা—এমন সুস্বাদু, এমন সুখসেব্য এমন জনহিতকর। পুস্তকের নামের জন্য রজনীকান্ত বাবু একটা কৈফিয়ৎ দিতে গিয়াছেন, কিন্তু কৈফিয়তের ত কোনই পয়োজন ছিল না।

'অমৃতের কবিতাগুলি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবুর 'কণিকার' প্রণালীতে লিখিত বটে, কিন্তু এই দুই পুস্তকে প্রভেদও বিস্তর। 'কণিকাতে' সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সঙ্গে সুরসিক সূক্ষ্মদর্শীর উপহাসপ্রিয়তার একটা তীব্র বিষাক্ত দাহকর জ্বালা আছে, 'অমৃতে' তাহা নাই। ইহাতে কেবল মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও সহৃদয়তাই দেখিলাম। কথাপ্রসঙ্গে যেখানে একটু তীব্রতা স্বভাবতই আইসে, সেখানেও তাহা এই পুস্তকে অতি কোমল, অতি করুণ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

পুস্তকখানি বালকবালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে সর্ব্বাংশেই ভাল হয়। নমুনাস্বরূপ একটা কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সাধুপ্রকৃতি।

যত জল শু'যে লয় প্রখর তপন,
প্রতিবিন্দু বৃষ্টিরূপে করে প্রত্যর্পণ,
বায়ু, তেজঃ, ক্ষিতি, হ'তে বৃক্ষ যাহা পায়
ফল-পত্র-কাণ্ডরূপে ফি'রি দিয়ে যায়,

গাভী যে তৃণটী খায়, করে জল পান,
তার সার, দুগ্ধরূপে করে প্রতিদান ,
পরদ্রব্য সাধু যদি করেন গ্রহণ,
জীবের মঙ্গল হেতু করেন অর্পণ।

ভক্তের জয়। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক বিরচিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থের 'পূর্ব্ব-ভাষ' হইতেই জানা যায় যে, লাভাজীর হিন্দী 'ভক্তমাল' গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লালদাস বা কৃষ্ণদাস নামক একজন বাঙ্গালী বাঙ্গালা পদ্যে একখানি ভক্তমাল প্রকাশ করেন। এইখানি ছাড়া রীতিমত ভক্তমাল আমাদের ভাষায় আর নাই। তবে উৎকলী ভাষায় 'দাঢ্য-ভক্তি রসামৃত' নামে একখানি ভক্তমাল প্রচারিত আছে। কিন্তু তাহা আমাদের বঙ্গদেশে অপ্রকাশিত, অপরিজ্ঞাত। আমাদের সাহিত্যের এই দৈন্য অপাকৃত করিবার জন্য শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ঐ উৎকল-দেশীয় গ্রন্থে নিবদ্ধ চরিত্রগুলির সম্বন্ধীয় অলোকিক ঘটনাবলীর বিবরণ আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। আমরা সাগ্রহে, সাহ্লাদে, তাহার উপহার গ্রহণ করিতেছি। তিনি যে উড়িয়া গ্রন্থের অক্ষরানুবাদ করেন নাই, আমাদের দেশের ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছেন, ইহা সুবিবেচনার কার্য্যই হইয়াছে। বিদেশের অধিকাংশ জিনিষই নিজের দেশের উপযোগী করিয়া না লইলে, সুখসেব্য বা সুখপাচ্য হয় না।

শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সুপণ্ডিত, সুলেখক, সুবক্তা ও সূক্ষ্মদর্শী। তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় তাঁহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত বৈষ্ণব-গ্রন্থাদিতে যথেষ্ট জাজ্জ্বল্যমান। তাঁহার বাগ্মিতা রাজধানীতে বিশেষরূপেই পরিজ্ঞাত। তাঁহার লিপিনৈপুণ্য সাময়িক পত্রাদিতে সততই পরিব্যক্ত। তাঁহার লিখিত পুস্তকে যে লিপিনৈপুণ্য থাকিবে ইহা ত স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে।

এই গ্রন্থের ভাষা মার্জ্জিত, বিশুদ্ধ ও সুসংবদ্ধ। রচনাপ্রণালী প্রাঞ্জল, সরস, ওজোগুণবিশিষ্ট—স্থানে স্থানে বিলক্ষণ উদ্দীপনা আছে। তবে যে কোন কোন স্থলে সঙ্গতি ও সংযমের সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে, ইহা স্বাভাবিক। উচ্ছ্বাস মাত্রই অসংযত।

এই সকল আখ্যানে যে সকল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহা অদ্ভুত, অলৌকিক, অস্বাভাবিক। শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণ একজন অকপট ভক্ত, নতুবা তিনি এমন সকল অতিপ্রাকৃত কথার অবতারণা করিতে কখনই অগ্রসর হইতেন না। যাঁহারা অকপট ভক্ত, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে ভক্তির মাহাত্ম্যে অঘটনও ঘটিতে পারে, অসম্ভবও সম্ভব হয়, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া আহ্লাদে নৃত্য না করুন, গদগদ যে হইবেন ইহা একরূপ নিশ্চয়। কিন্তু এটা ত বিশ্বাসের যুগ নহে, সংশয়ের যুগ। এখন একটা সামান্য কথাও কেহ বিনা প্রমাণে মানিয়া লইতে রাজি নহে। এরূপ যুগে শিক্ষিত ও বিচারশীল সম্প্রদায় নৈসর্গিক নিয়মবিরুদ্ধ এই সকল কথায় বিশ্বাস করিবেন কি? যদি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষণীয় হয়, তাহা হইলে বিশ্বাস করিতে কাহাকেও বলাও যায় না। বিশেষতঃ গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়াছেন যে "এই চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়", অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নহে। যে চরিত্রের ঐতিহাসিক মূল্য অল্প, তাহার

সম্বন্ধে অসম্ভব কথায় কোন্ বুদ্ধিমান লোকে বিশ্বাস করিতে পারে?

কিন্তু বিশ্বাস করি বা না করি, আখ্যান যদি সুলিখিত হয় তবে পড়িবার পক্ষে ত আপত্তি হইতে পারে না। আমরা ত আরব্যোপন্যাস পড়ি, পারস্যোপন্যাস পড়ি, চাহার দরবেশ পড়ি, Pasha of many Tales পড়ি, তবে এমন সুলিখিত গল্পই বা পড়িব না কেন? এই পুস্তক আমরা সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। যিনিই পড়িবেন তিনিই কোন না কোন প্রকারে উপকৃত হইবেন।

সরলচণ্ডী। শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, এম, এ, ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রণীত। মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

চণ্ডী, হিন্দুজাতির একখানি প্রধান ধর্ম্ম-গ্রন্থ। আমাদের অনেক ক্রিয়াকাণ্ডেই চণ্ডী-পাঠ হইয়া থাকে। এই পূজনীয় আখ্যানের বাঙ্গালা ভাষায় সরল বিবৃতি যে আমাদের জনসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে, ইহা একরূপ নিশ্চয়। এই পুস্তকের ভাষা অতি সরল, সর্ব্বজনবোধ্য, অথচ গ্রাম্যতাদোষবিবর্জ্জিত—এত অধিক সরল, যে কোন কোন স্থলে আমাদের মনে হইয়াছে যে, ভাষা অধিকতর গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন হইলে ভাল হইত। ইহার ছাপা, বাঁধাই ও ছবিগুলি মনোরম। গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংস্কৃত স্তবমালা সন্নিবেশিত করায় ইহার উপাদেয়তা শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। এই পুস্তক যে লোকে আগ্রহ করিয়া কিনিবে, এমন প্রত্যাশা আমরা অনায়াসেই করিতে পারি।

উপাসনা।
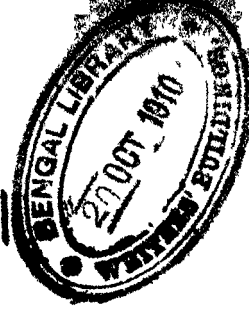
ব্রহ্মোপাসনাতত্ত্ব।

(৬ষ্ঠ অংশ।)

পঞ্চমতঃ।" প্রত্যগাত্মরূপ* গুণাভিধানে ব্রহ্মচিন্তা। কেনোপনিষদে প্রথমতঃ "যদ্বাচানভ্যুদিতং" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মেতে ক্রিয়া লক্ষণা উপাসনার প্রতিষেধ করিয়াছেন। তাহাতে অনেকের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ব্রহ্মের উপাসনা নাই। কিন্তু ঐ উপনিষদের বাক্যশেষে তাঁহার উপাসনার বিধি দিয়াছেন। সেই শ্রুতি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে উক্ত সংস্কার তিরোহিত হইবে। তাহা এই।

১। তদ্ধতদ্বনং নামতদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং। স য এতদেবং বেদাহভিহৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি। ৩১ শ্রুতি। কিঞ্চ তৎ ব্রহ্মহকিলতদ্বনং তস্য বনং তস্য তস্য প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাত্মভূতত্বাৎ বরণীয়ং সম্ভজনীয়ং অতঃ তদ্বনং নাম প্রখ্যাতং। ইতি অনেনৈব গুণাভিধানেন তদ্বনং উপাসিতব্যং চিন্তনীয়ং। স য কশ্চিৎ এতৎ যথোক্তং ব্রহ্ম (নির্গুণং অপরিচ্ছিন্নং নিরঞ্জনং) এবং যথোক্ত গুণং (প্রত্যগাত্মভূতং) বেদ উপাস্তে এবং উপাসকং সর্ব্বাণি ভূতানি অভিসংবাঞ্ছন্তি, প্রতিপ্রার্থবন্তি। শাঃ ভাঃ।

সেই ব্রহ্ম প্রত্যেক প্রাণীর 'প্রত্যগাত্মা' অন্তরাত্মা। সেই হেতু তিনি 'বরণীয়ং' সম্ভজনীয়। অতএব তাঁহার নাম 'তদ্বনং' প্রতি প্রাণীর অন্তরাত্মা। এইটি তাঁহার গুণস্বরূপ। অর্থাৎ সর্ব্বাত্মত্ব। এই গুণাভিধানেতে ঐ 'তদ্বনং' সম্ভজনীয় ব্রহ্মাত্মা উপাসনীয়, অর্থাৎ চিন্তনীয়। যিনি এই যথোক্ত নির্গুণ অপরিচ্ছিন্ন নিরঞ্জন ব্রহ্মকে এবং তাঁহার প্রত্যগাত্মা-

* কঠোপনিষদের চতুর্থ বল্লির ১ম ও দ্বিতীয় শ্রুতি দ্রষ্টব্য। তাহাতে "পরাক" ও "প্রত্যক্" এই দুইটি শব্দ আছে। "পরাক" শব্দের অর্থ বাহিরের বিষয়। ইন্দ্রিয়গণ তাহাতেই রত। এই জন্য তাহাদিগকে এবং তাহাদের সহগামী মনোবুদ্ধিকে পরাগদর্শী কহে। অজিতেন্দ্রিয় জীবাত্মাও সুতরাং পরাগদর্শী। অতঃপর "প্রত্যক্" শব্দের অর্থ কহা যাইতেছে। উহার অর্থ অন্তরাত্মা। তিনি অন্তরতম। জীবাত্মার পশ্চাদ্ভাগবাসী প্রতিষ্ঠা, অন্তরবাসী পরমাত্মা, বিষয় প্রতিস্রোতের ঊর্দ্ধপদস্থ ব্রহ্ম। জীতেন্দ্রিয় ধীরেরা, বহির্বিষয় ও সম্মুখবর্ত্তী সংসার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আত্মার মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করেন। সম্মুখবর্ত্তী বহির্বিষয়ের বিপরীত যিনি তিনিই "প্রত্যগাত্মা"। তিনি সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা।

রূপ যথোক্ত গুণকে জানিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, সর্ব্বপ্রাণী তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। এই বচনে এই যে গুণাভিধানের উল্লেখ তাহা প্রাকৃতিক গুণ নহে। তাহা সর্ব্বপ্রাণীর অন্তান্তর-আত্মারূপ ব্রহ্মধর্ম। উপাসনার অবলম্বন পদে উহাকে গুণাখ্যায় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। নতুবা এস্থানে ব্রহ্মকে ও তাঁহার উপাসনাকে সম্পূর্ণ নির্গুণপদে প্রতিষ্ঠিত রাখাই উদ্দেশ্য। উক্ত উপনিষদের নিম্নস্থ বচনদ্বয়ে এই তাৎপর্য্য আরও বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবেক।

২। প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হিবিন্দতে। আত্মনাবিন্দতেবীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেমৃতং। ১২ ইহচেদবেদীদথসত্যমস্তিনচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টি। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্যধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি।

১৩। যিনি মনের অগোচর তাঁহাকে কিরূপে জানা বা চিন্তাকরণরূপ উপাসনা করা যাইতে পারে? এই সংসারে জানা বা অজানা যত জ্ঞান আছে, ব্রহ্মজ্ঞান সে সকলের অতীত। অতএব যেরূপ প্রকারে সেই ব্রহ্মপরাৎপরকে জানা ও চিন্তা করা যাইতে পারে এই দুইটি বচনে তাহার উপদেশ দিতেছেন। যিনি প্রত্যেক বোধের প্রত্যগাত্মজ্ঞাতা, প্রত্যেক প্রত্যয়ে জাগ্রত বিধাতা, তাঁহাকে যখন তদ্রূপে জানা যায়, তখন জীব অমৃতত্ব লাভ করেন। তখন তিনি আত্মাদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যারূপবীর্য্য ও সেই বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভ করেন। ইহকালে যদি মনুষ্য সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারেন, তবে তাঁহার মোক্ষ হয়। আর যদি তাঁহাকে ইহ জীবনে না জানেন, তবে তাঁহার জন্ম মরণ আদি সংসারগতিরূপ দীর্ঘাবিনষ্টি হয়। অতএব মনুষ্য এই গুণ আর দোষ জানিয়া চরাচরে সর্ব্বভূতে সেই এক ব্রহ্মকে চিন্তা করত তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিবেন। যে ধীরেরা তাহা করেন, তাঁহারা ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া অমৃত হয়েন। জন্ম মরণ স্রোত হইতে উর্দ্ধে পান।

৩। উপরিউক্ত তিনটি শ্রুতিতে উপস্থিত ক্ষেত্রে পরব্রহ্মের উপাস্যত্ব ও বিজ্ঞেয়ত্ব এবং সাধকের কৃত উপাসনাও জানা এই কয়েকটি বিচারযোগ্য বাক্য আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই উপাস্যত্ব সগুণ নহে। কিন্তু প্রত্যগাত্মরূপ অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীর আত্মারূপ লক্ষ্যমাত্র। অতঃপর তাঁহার বিজ্ঞেয়ত্ব, কেবল প্রত্যেক বোধের জ্ঞাতৃত্ব ও তাঁহার সর্ব্বভূতস্থ সত্তার পরিচায়ক মাত্র। সেই ভাবে সাধক তাঁহাকে উপাসনা ও চিন্তা করিবেন এবং তাঁহাকে জানিবেন। এই যে ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা কোন সাংসারিক জ্ঞাত বা অজ্ঞাত জ্ঞানের তুল্য নহে। কিন্তু তদতীত, অপ্রাকৃতিক। কেননা সর্ব্বভূতের আত্মারূপে এবং সকল বোধের জ্ঞাতারূপে তাঁহাকে জানা মনের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক, বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মক এবং চিত্তের অভিমানাত্মক অবস্থার ক্রিয়া নহে। কিন্তু এই সকল অন্তঃকরণ বৃত্তি স্ব স্ব বহির্বিষয় হইতে উপশান্ত হইলে উক্ত প্রকার ভাবে তাঁহাকে জানিতে, চিন্তা করিতে ও উপাসনা করিতে পারা যায়। "তস্মাৎ দৃষ্টাদৃষ্টেভ্যো বাহ্য সাধনসাধ্যেভ্যো বিরক্তস্য প্রত্যগাত্ম বিষয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসেয়ং কেনেষিতমিত্যাদি শ্রুত্যাং প্রদর্শতে" (শাঃ ভাঃ) অতএব দৃষ্ট ও অদৃষ্ট জ্ঞান হইতে যিনি বিরক্ত, বাহ্য সাধন

সাধ্য অর্থাৎ লোকব্যবহারানুগত উপাসনা উপাস্যরূপ ক্রিয়া হইতে বিরাগযুক্ত তাঁহারই প্রত্যগাত্মলক্ষণ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসেয়। কেনেষিতং ইত্যাদি শ্রুতিতে ইহাও প্রদর্শন করিয়াছেন।

৪। মনুষ্যের মনোবুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃত্তি স্বভাবতঃ বহির্মুখ, সর্ব্বদা চঞ্চল, নানাদিকে বিক্ষিপ্ত, এজন্য নানাত্বরহিত একমাত্র প্রত্যগাত্মকে ধারণে অক্ষম। তদ্ভিন্ন তাঁহার ঐ সকল বৃত্তি কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমানরূপ অভেদ্য আবরণ। তাদৃশ বৃত্তিগণের সহায়তায় জীব, নানা ফলের অভিনন্দনরূপ, নানা ফলদাতা দেবতার প্রসাদ ভিক্ষারূপ, এবং ঈশ্বর ও ঈশ্বরীগণের দয়া প্রার্থনারূপ উপাসনা করিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের সহকারিতায় বাক্যমনের অগোচর পরমাত্মচিন্তা বা পরমাত্মীয় জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। সেই সকল বৃত্তি শান্ত হইলেই তাহাদের অভেদ্য আবরণতা সরিয়া যায়। তখন আত্মাই পরমাত্মাকে চিনিয়া জানিয়া প্রীতি ও উপাসনা করিতে পারেন। ঐ সকল অভিমানরূপ আত্মগরিমা নষ্ট না হইলে, সাধকের অন্তরে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতি ফলিত হয় না।

৪ক। যাঁহারা তর্ক করেন ব্রহ্মই সকল জীবের আত্মা এবং তিনি ভিন্ন প্রতি দেহস্বামী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আত্মা বা পুরুষ নাই, তাঁহাদের অবলম্বিত বাক্য সকল এই যে, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরঃ ইতরং পশ্যতি" ইত্যাদি আর "যত্রবা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কংপশ্যেৎ" ইত্যাদি। আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা একমাত্র অদ্বিতীয়। যখন তাঁহাতে দ্বৈতরূপ ভান আপতিত হয়, সেই অবস্থাতে একে অন্যকে দেখে, আর যখন তাঁহার সর্ব্বাত্মস্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন কে কাহাকে দেখিবে? এই তর্কের উত্তর উপরিভাগে দিলাম। একটু ধীর হইয়া বুঝিলে হৃদয়ঙ্গমিত হইবে যে, অন্তঃকরণবৃত্তির অভিমানাত্মিকা ক্রিয়াই পরব্রহ্মেতে দ্বৈতরূপ আবরণজাল প্রক্ষেপ করে, এবং তাঁহার সর্ব্বাত্মস্বরূপ ভূমা-পদকে আত্মভাব হইতে অন্যথা পূর্ব্বক লোকব্যবহারসিদ্ধ উপাস্য দেবতার ন্যায় দ্বৈতসত্তারূপে প্রদর্শন করে। ঐ অভিমান উপশান্ত হইলে উক্ত দ্বৈতপ্রতিবন্ধ সরিয়া যায়। তখন পুরুষ জানিতে পারেন সেই পরমাত্মাই তাঁহার আত্মার প্রতিষ্ঠা, আলোক এবং রসভাণ্ডার। অভিমানের অভাব বশতঃ তিনি আর আপনাকে অর্থাৎ আপনার ব্যবহারিক জীবধর্ম্মকে দেখেন না, অর্থাৎ তাঁহার জীবত্ব তাঁহাকে দেখা দেয় না। তখন শান্তিরস কিরণপুঞ্জ শতসূর্য্যপ্রভাবৎ পরমাত্মজ্যোতিতে তিনি প্লাবিত হইয়া যান। তাঁহার দর্শনাদি বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। তখন পরমাত্মার অব্যয়প্রভাব স্বয়ম্প্রকাশিত। এই অবস্থায় সাধক দৃষ্ট অদৃষ্ট সাধ্যসাধনাদি বাহ্য ক্রিয়া হইতে বিরত। তখনই তিনি প্রত্যক্ষ ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাতে স্থিত।

৪খ। শ্রুতিতে কহেন, "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক। ইহাই আত্মোপাসনার অবস্থা। এই অবস্থায় কেবল অভিমানাত্মিকা চিত্তবৃত্তির অভাব বশতঃ দ্বৈতজগৎ ও জীবরাজ্য রহিত হয়। এইরূপে দ্বৈতপ্রতিবন্ধ অপনীত হইলে, উপাসকের হৃদয়গুহাস্থিত পুরাতন পরমাত্মজ্যোতিঃ স্বয়ম্প্রকাশিত হন। ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। কিন্তু উপাসকরূপ আত্মার অভাব হওয়া অথবা আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পর-

স্পরের প্রেমাস্পদত্বরূপ আত্মীয়তা বা উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ রহিত হওয়া অভিপ্রায় নহে।

৪গ। আত্মা ও পরমাত্মার এই মিথুনী-ভাবই, আত্মপ্রীতি, আত্মরতি, আত্মোপাসনা প্রভৃতি শব্দের তাৎপর্য্য। উপনিষৎরূপ গুরুগম্ভীর জ্ঞানসাগরে নিমগ্না হইয়া যাঁহারা ভাসমান মনোবুদ্ধি যুক্তিতর্করূপ বলসম্বলপূর্ব্বক তদ্বক্ষে সন্তরণ করেন, তাঁহারা সেই উপাদেয় ভাব লাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা জীবব্রহ্মের ভেদাভেদ অথবা জীবের অসত্যতা প্রতিপাদন করত বৃথা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন মাত্র।

৫। কেনোপনিষদে দেবতাদিগের যে আখ্যায়িকা আছে, তদ্দ্বারা ঐ কথার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মই শুভকর্ম্মের ফল-দাতা। দেবাসুর সংগ্রামে দেবতারা জয়ী হইয়াছিলেন। সেই জয় আপনাদের কর্ম্মের ফল বলিয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলেন এই কর্ম্মের আমরাই কর্ত্তা এবং এ বিজয় আমাদের কর্ত্তৃত্বের ফল। অতএব এ মহিমা আমাদের। প্রত্যগাত্মরূপ পরব্রহ্ম তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বের অন্তরালে থাকিয়া সে জয়-বিধান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা জানি-তেন না। সে ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাদের ছিল না। বস্তুত যাঁহারা কর্ম্মযোগী নহেন, এবং কেবল ফলনিমিত্ত বিধিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্মফল ব্যতীত, ফলদাতাস্বরূপ অন্ত-র্যামি প্রত্যগাত্মার অস্তিত্ব দেখিতে পান না। সুতরাং লব্ধফলকে আপনাদের কার্য্যেরই মহিমা বলিয়া মনে করেন। সেইরূপ মনে করিয়া অন্তরে অন্তরে আপনারাই গর্ব্বিত হন। ঈশ্বর বিশ্বাসবিরহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের উপরি জ্ঞানের প্রাধান্য সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এই আখ্যায়িকা হইতে সেই নিগূঢ় সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে; ফলতঃ ইতর ব্যবহারী অসুরা-চারীদিগের অপেক্ষা দেব পিতৃকর্ম্মকারী ব্যক্তি-দিগের অনুষ্ঠান সাধু। সাধু যাঁহাদের ইচ্ছা ও ক্রিয়া, ঈশ্বর তাঁহাদের সহায়। অতএব দেবতাদের অভিমান সত্ত্বেও ব্রহ্ম তাঁহাদের দেবত্বের সহায় হইলেন। ঐ মিথ্যাভিমান-দ্বারা অসুরদিগের ন্যায় তাঁহাদের বিনাশ না হয়, এজন্য ঐ বৃথাভিমান দূর করিবার নিমিত্ত অনুকম্পাপুরঃসর তাঁহাদের সম্মুখে এক আশ্চর্য্যরূপ ধারণ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। এবং দেবতাদের শক্তি যে মিথ্যা, পরীক্ষা দ্বারা তাহা দেখাইয়া দিলেন। তথাপি তাঁহারা তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না। পশ্চাৎ তাঁহাকে জানিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র অগ্রসর হইলেন। তখন তিনি ইন্দ্র হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সেই সময়ে বিদ্যারূপিণী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমা তথা প্রাদুর্ভূত হইয়া-ছিলেন। তাহাতে ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে বরণীয়রূপ এইক্ষণে অন্তর্দ্ধান করিলেন, তিনি কে? বিদ্যা কহিলেন ব্রহ্ম হইতে তোমাদিগের জয় হইয়াছিল, তাহাতে তোমরা গর্ব্ব করিয়াছ যে, তোমাদিগের দ্বারাই জয় হয়। এই মিথ্যাভিমান নিবারণের নিমিত্তে ব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র ইহা শ্রবণ করায় তাঁহার কর্ত্তৃত্ব-অভিমান মন হইতে দূর হইল। মন অকর্ত্তৃভাব লাভ করিল। তখন তিনি ব্রহ্মকে জানিলেন। কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত মনের দ্বারা দেবদেবীর যোগে সগুণ ও সোপাধিকরূপে ঈশ্বরের উপাসনা হয় বটে, এবং তদ্দ্বারা গৌণ ফললাভ হয় বটে, কিন্তু সেরূপ মনের দ্বারা

সাক্ষাৎ মোক্ষের স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা বা জ্ঞান লাভ হয় না। মানবের অভিমান-রূপ পর্ব্বত সম আবরণ, কেবল তাঁহার স্বীয় যজমানত্ব, উপাসকত্ব ও সাধকত্বরূপ কর্ত্তৃত্বকে সঙ্গোপনে পোষণ করে; মনোরাজ্যে নানারূপ মহাত্মক্ মহিমাত্মক্ গরিমাত্মক্ বিক্ষেপ উৎপন্ন করে; কখন বা তৎসমস্তকে আত্মপবিত্রতা বা দেবপ্রসাদরূপে প্রদর্শন করে; কিন্তু তাহার অন্তরালস্থিত সাক্ষাৎ মোক্ষরূপ ব্রহ্মকে জানিতে দেয় না। মনঃ শব্দের যাথাবৎ অর্থই ঐরূপ কর্ত্তৃত্বলক্ষণ মন। এজন্য উক্ত হইয়াছে ব্রহ্ম মনের অগোচর। মনের সহিত সমস্ত অন্তঃ-করণবৃত্তিই স্বভাবতঃ বিষয়নিষ্ঠ।

৬। "তদেবব্রহ্মত্বংবিদ্ধিনেদংযদিদমুপাসতে"। যাঁহা হইতে বাক্য প্রকাশিত হয়, যিনি মনের অগম্য কিন্তু যিনি মনকে জানেন, যাঁহার দ্বারা লোক সকল চক্ষুর বিষয়কে দর্শন করে, যাঁহার দ্বারা শ্রোত্র শ্রবণ করে, যাঁহার দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ গ্রহণ করে, "তদেবব্রহ্মত্বংবিদ্ধি" তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। তিনি বাক্য মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং "নেদং যদিদ মুপাসতে" ঐ সকল বাক্যমনাদিদ্বারা যাঁহাকে লোকে উপাধিভেদবিশিষ্টরূপে, মনেরগোচর-রূপে, এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে উপা-সনা করে, তিনি ব্রহ্ম নহেন। কেনোপনিষদুক্ত এই সমস্ত শ্রুতিতে একেবারে দুইটি কথা বলিয়াছেন। যথা "মনের অগোচর" তবু জান। অর্থাৎ যিনি মনাদির অগোচর আর যাঁহাদ্বারা মনাদির শক্তি প্রস্ফুটিত হয়; তাঁহা-কেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। এস্থানে জিজ্ঞাস্য এই যে, জানা মনাদিরই কার্য্য। তাহারা জানিতে অক্ষম হইল, তাহাদের ক্রিয়ারূপ যে উপাসনা তাহা নির্গুণ, নিরুপাধিক নিরঞ্জনের উপাসনা হইল না; তবে তাঁহাকে কি উপায়ে জানিব? এই জানার আদেশ কিরূপে পালন করিব? একথার উত্তর ঐ উপনিষদেই আছে। প্রথমতঃ "যস্যামতং তস্যমতং"; "যস্যব্রহ্মবিদঃ অমতং অবিজ্ঞাতং অবিদিতং ব্রহ্মতস্যমতং জ্ঞাতং সম্যগ্ ব্রহ্মেতাভিপ্রায়ঃ"। যাঁহার ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে জানা যায় না তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে মনাদিদ্বারা জানা যায় না, এইরূপ জানিয়া রাখাই তাঁহাকে জানা। দ্বিতীয়তঃ "প্রতি-বোধবিদিতং" প্রত্যগাত্মতয়াবিদিতং ব্রহ্ম"। প্রত্যগাত্মারূপে তিনি বিদিত হয়েন। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক বোধের জ্ঞাতা, কিন্তু মানবের বোধ তাঁহার জ্ঞাতা নহে তাঁহাকে এইরূপে জানা। তৃতীয়তঃ মন হইতে কর্ত্তৃত্বাভিমান-রূপ প্রতিবন্ধককে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া মনকে আত্মার দিকে অভিমুখী করা এবং ব্রহ্মকে সকল কর্ত্তৃত্বের কর্ত্তারূপে জানা। "সর্ব্বেক্ষিতৃ" ব্রহ্মই সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বদ্রষ্টা। আমাদের মানসিক অভিমান মিথ্যাঈক্ষণ মাত্র। ইন্দ্রাদি দেবগণের মনেতে সেইরূপ অভিমান ও মিথ্যাদৃষ্টি ছিল। ইন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে যখন আপনার ও দেবগণের অভি-মান, কর্ত্তৃত্ব, মহিমা, গরিমা ও মিথ্যা ঈক্ষণ বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাদের মনের মন; নয়নের নয়নের ন্যায় তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বের অন্ত-রালে, কর্ত্তৃত্বের কর্ত্তারূপে, ব্রহ্মই প্রকাশ পাইতেছেন ইহা যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইলেন। ইহারই নাম "প্রত্যগাত্মজ্ঞান"। এই জ্ঞান লাভ—এই জানা, মনোবুদ্ধির কার্য্য কি না? একথার

তিন চারিটি উত্তর পাওয়া যায়—পরস্পর একটু একটু প্রভেদ। (১) এরূপ কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য মনকে আর মন বলা যায় না, যেমন নিষ্কাম কর্ম্মকে কর্ম্মই বলা যায় না। (২) অনেক স্থলে মনের এরূপ লক্ষণকে মনোনিবৃত্তি কহেন। (৩) কোন স্থলে বা ইহা আচার্য্যাগম সংস্কৃত মন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (৪) ইহার সত্তা এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানে অভিভূত। অতএব ঐরূপ জ্ঞানলাভ ও জানা মনোবুদ্ধির ক্রিয়া নহে, কিন্তু মনোবুদ্ধ্যাদি উপাধিনিরস্ত সাধকের স্বতোলব্ধব্য। কিরূপে স্বতোলব্ধব্য? তাহার উত্তর এই যে, ব্রহ্ম স্বয়ম্প্রকাশ। মনোনিবৃত্তি হইলেই দৃষ্ট হয়েন। চতুর্থতঃ, উক্ত উপনিষদে পুনশ্চ কহিতেছেন "অথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সংকল্পঃ"। "অনন্তর 'অধ্যাত্মং' প্রত্যগাত্মবিষয় আদেশ উচ্যতে", এক্ষণে 'অধ্যাত্ম' অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার উপাসনা বিষয়ে উপদেশ কহিতেছেন। "মন যেন ব্রহ্মের নিকট গমন করেন, এই মনের দ্বারা উপাসক তাঁহাকে সমীপস্থ করিয়া স্মরণ করেন, উপাসকের ইহাই সঙ্কল্প।" এই মন ব্রহ্মসঙ্কল্পিত এবং স স্মৃত। ইহাতে কর্তৃত্বলক্ষণ নাহি। যেমন ভগবানে অর্পিত কর্ম্ম সকলের বন্ধকত্ব নাহি, সেইরূপ ব্রহ্মসকাশগামী মনেরও বন্ধকত্ব নাহি। তাহাতে আত্মা, পরমাত্মাকে প্রত্যগাত্মগুণাভিধানে "তদ্বন" অর্থাৎ সম্ভজনীয় রূপে উপাসনা করেন এবং তাঁহাকে জানিতে পারেন। এইরূপে যে নিরঞ্জনব্রহ্ম ক্রিয়ালক্ষণ বহির্ম্মুখমনাদি অন্তঃকরণবৃত্তির অগোচর তৎসমস্তকে শান্ত করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে ও তাঁহাকে জানিবেক। মনঃ নিবৃত্ত হইলেই আত্মাতে পরমাত্মা দৃষ্ট হয়েন, কেননা তিনি স্বয়ম্প্রকাশ।

৭। শাস্ত্রে কোথাও আছে ব্রহ্ম মনের অগোচর, মনের অবিষয়, মন তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাঁহাকে জানিতে পারে না। এবং মানসব্যাপাররূপ উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা নহে। আবার কোথাও আছে মনের দ্বারা উপাসক তাঁহাকে সমীপস্থরূপে স্মরণ করিবেন, মনের দ্বারা তাঁহাকে জানিবেন এবং আত্মার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেন। এসম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের যে মীমাংসা আছে তাহার কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

৭ক। উপনিষদে "যম্মনাসানমনুতে" (কেন ৫) "মনসা যৎচৈতন্যজ্যোতির্ম্মনসোঽবভাসকং ব্রহ্মনমনুতে ন সঙ্কল্পয়তি'। যে চৈতন্য জ্যোতিঃদ্বারা মনের চৈতন্যদীপ্তিপায়, যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না। এই শ্রুতি এবং ইহার আনুসঙ্গিক "নেদং যদিদমুপাসতে" কয়েকটি শ্রুতি উপলক্ষে শঙ্করাচার্য্য শারীরক-সূত্রের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে কহিয়াছেন, "নচবিদির্ক্রিয়াকর্ম্মত্বেনকার্য্যানুপ্রবেশোব্রহ্মণঃ", "তথোপাস্তিক্রিয়াকর্ম্মত্ব প্রতিষেধোপিভবতি"। মনুষ্যের মনঃ স্বভাবতঃ ক্রিয়াধর্ম্মী। জ্ঞান তাহার একটি ক্রিয়া, উপাসনা বা ভক্তি আর একটি ক্রিয়া। এই জ্ঞান ক্রিয়ার কর্ম্মতত্বরূপে কার্য্যানুপ্রবেশ ব্রহ্মেতে নাই। আর উপাসনা-ক্রিয়ার কর্ম্মত্বও তাহাতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব এই শ্রুতিতে ক্রিয়াধর্ম্মী মনের অবিষয়-রূপে তিনি উক্ত হইয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম-জ্ঞান, ক্রিয়ার অতিক্রান্ত।

৭খ। পুনশ্চ উপনিষদে "যতোবাচো-নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।" (তৈত্তি-

ধীর ব্রঃ আঃ বঃ ৮।১) মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। এস্থানেও দুইটি পরস্পর আপাততঃ বিরুদ্ধ বাক্য একত্রে আছে। "মন আর বাক্য যাঁহাকে পায় না, তাঁহাকে যিনি জানেন। মনই জানার উপায়। তাহা যখন তাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইল, তখন তাঁহাকে যিনি জানেন" ইহা আপাততঃ অসম্ভব বোধ হয়। এখানে "মনসা" শব্দের অর্থ "বিজ্ঞানের সর্ব্ব প্রকাশন সমর্থেন।" সর্ব্ব প্রকাশন সমর্থ বিজ্ঞান। ইহা বহির্ব্বিজ্ঞান ও উপরাগদর্শনস্থ। ইহা অন্তরাত্মাস্বরূপ ব্রহ্মতে যাইতে অসমর্থ। তবে তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যাইবে? উত্তর। "তং ব্রহ্মণ আনন্দং শ্রোত্রীয়স্যাঽবৃজিন স্যাঽকামহতস্য সর্ব্বৈষণাবিনির্ম্মুক্তং স্বাভাবিকং নিত্যমবিভক্তং পরমানন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ যথোক্তেন বিধিনা বিভেতি কুতশ্চন।" যিনি শ্রুতির মর্ম্মজ্ঞ নিষ্পাপ নিষ্কাম তিনি সেই সর্ব্ব বাসনা বিনির্ম্মুক্ত নিত্য অবিভক্ত ব্রহ্মানন্দকে জানিয়া কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। অর্থাৎ যাঁহার মন শ্রুতিবিহিত জ্ঞানদ্বারা পবিত্র হইয়াছে, তিনিই তাহাকে জানেন। সামান্য মনের তাহাতে অধিকার নাই।

৭গ। অপরঞ্চ কঠোপনিষদের চতুর্থী-বল্লিতে কহিয়াছেন, স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণকে হনন করিয়াছেন, এইহেতু মনুষ্যের মন ইন্দ্রিয়স্রোতে ভাসিয়া কেবল বহির্ব্বিষয়ই দেখিতে পায়। প্রত্যগাত্মরূপ অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কিন্তু কোন কোন ধীর চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়াদিকে অশেষ বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া এবং অমৃতত্ব ইচ্ছা করিয়া মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক সেই প্রত্যগাত্মাকে দেখিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও মনাদি অন্তঃকরণবৃত্তিকে বিষয় হইতে নিবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছেন। এখানে "কশ্চিদ্ধীরঃ" এই শব্দ আছে। ইহার অর্থ যাঁহার মন শান্তি হইয়াছে, যিনি ধীমান, বিবেকী, অমূঢ়, জ্ঞানচক্ষুষ, সচেতস, যোগী এবং আত্মাতে অবস্থিত। মনাদি ইন্দ্রিয় রাজ্য নিরুপদ্রব হইলেই ক্ষেত্রজ্ঞরূপী জীবাত্মাতে সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ প্রত্যগাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন।

৭ঘ। উক্ত উপনিষদের ঐ বল্লীর শেষাংশে কহিয়াছেন, "মনসৈবেদ মাপ্তব্যন্নেহনানাস্তি কিঞ্চন" আচার্য্যাগমসংস্কৃতেন মনসা এব ইদং ব্রহ্মৈকরসং আপ্তব্যং। ইহ ব্রহ্মণিনানা ন অস্তিকিঞ্চন অণুমাত্রমপি।" যিনি সামান্য বহির্ম্মুখ ক্রিয়াধর্ম্মী চঞ্চল নানা বিষয়গামী মনের অগোচর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, এই শ্রুতিতে তিনি মনদ্বারা প্রাপ্তব্য বলিয়া উক্ত হইলেন। সে কেমন ধারা মন? আচার্য্য, ভাষ্যেতে তাহা বিশদ করিয়াছেন, যথা যে মন বেদাগমবিহিতরূপে আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে, সেই মনেরদ্বারাই এই এক রস স্বরূপ ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। কেননা সেই ব্রহ্মেতে কিছুমাত্র নানাত্ব নাই। অসংস্কৃত বিক্ষিপ্তচিত্তে তাঁহাকে একরসরূপে লাভ করা, উপাসনা করা, দর্শন করা বা জানা অসম্ভব। অতএব তিনি তাদৃশ সামান্য মনের অগোচর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। যথোলক্ষণ নিষ্ক্রিয় ও পবিত্র মনের দ্বারা তিনি অঙ্গুষ্ঠ পুরুষ ও বামনরূপে উপাসনীয়। তাহা

উক্ত শ্রুতির পরবর্ত্তী শ্রুতিসমূহে আছে। তাহা "অন্তর্যাম্যাদি" প্রকরণে দর্শাইয়াছি। এস্থলে মনের দ্বারা শব্দের তাৎপর্য্য "মনোনিবৃত্তির দ্বারা" মনের সংস্কারও যাহা মনোনিবৃত্তিও তাহা। অতএব যথাশ্রুত অর্থে এ শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, মনঃ সহিত সমস্ত অন্তঃকরণবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া সেই নিরোধের দ্বারা উক্ত এক রস-স্বরূপব্রহ্ম প্রাপ্তব্য।

৭ঙ। ব্রহ্মজ্ঞানের বাধস্বরূপ জীবের যে অনাদি অনির্ব্বচনীয় কামকর্ম্মবীজরূপী অজ্ঞান আছে, তাহাই ঐ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ রূপধারণ করিয়াছে। এবং তাহার অতি সূক্ষ্ম শক্তিরূপ-প্রবাহ স্বভাব নামে ঐ অন্তঃকরণবত্তির অন্তর্গত মনোরূপশিরোদেশে সঞ্চরণশীল রহিয়াছে। তাহাকে সংস্কার করিলেই ঐ অজ্ঞান নষ্ট হয়। আর অজ্ঞান নষ্ট হইলেই স্বয়ংও নষ্ট হয়। কেননা তাহার সমবায়ীকারণ অজ্ঞানই। যেমন বস্ত্রের সমবায়ীকারণসূত্র বিনষ্ট হইলে বস্ত্রও বিনষ্ট হয় তদ্বৎ। অতএব বিশুদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের বাধক অজ্ঞাননাশ পর্য্যন্তই মনাদি অন্তঃকরণের সীমা, কিন্তু ব্রহ্মকে তাহারা প্রকাশ করিতে পারে না। কেননা তিনি স্বয়ম্প্রকাশ। এতাবতা সংস্কৃত মনের দ্বারা তিনি প্রাপ্তব্য, অথবা তাদৃশ মনের দ্বারা তিনি জ্ঞাতব্য বা উপাসনীয় অজ্ঞান নষ্ট হয় বলিয়া, এবং তাদৃশ অবস্থায় স্বয়ং প্রকাশ ব্রহ্ম দৃষ্ট হন বলিয়া "মনের দ্বারা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আর "ব্রহ্মস্বয়ম্প্রকাশস্বভাব" এই-জন্য "তিনি মনেরও অগোচর" প্রভৃতি শ্রুতি উদিত হইয়াছে। ফলতঃ মনোনিবৃত্তির অবস্থায় তিনি যে, উপাসকের নিকট আপনাকে প্রকাশ করেন, তাহাতে মনাদির কোন কর্তৃত্ব থাকে না। শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, তখন সমস্ত অন্তঃকরণবৃত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয় অথবা চিরশান্তি লাভ করে। অতঃপর অন্তঃকরণ-বৃত্তির পরাগ্ দৃষ্টির অবস্থায় অর্থাৎ বিষয়স্রোত-গামী ক্রিয়ালক্ষণচঞ্চল গতিকালেও মনো-বুদ্ধ্যাদি যে, ব্রহ্মজ্ঞানলাভে বা ব্রহ্মোপাসনায় নিতান্ত অপটু ইহা ইতিপূর্ব্বে বারম্বার বলিয়াছি।

৭চ। তথাচ সদানন্দ যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসারে "ব্রহ্মণ্যজ্ঞান নাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতেতি। স্বয়ং প্রকাশমানত্বাৎ নাভাস উপযুজ্যতে।" ব্রহ্মসম্বন্ধীয় অজ্ঞান নাশের নিমিত্তে মনোবৃত্তির ব্যাপ্তি অপেক্ষিত। কিন্তু পরব্রহ্ম স্বয়ম্প্রকাশস্বরূপ, অতএব অন্য কর্ত্তৃক তাঁহার প্রকাশিতত্ব সম্ভব হয় না। এ সম্বন্ধে সুবোধিনী টীকাতে লেখেন "অন্তঃকরণবৃত্তিঃ আবরণ নিবৃত্ত্যর্থং অজ্ঞানাবচ্ছিন্নচৈতন্যং ব্যাপ্নোতি ইত্যেতৎ বৃত্তি-ব্যাপ্যত্বং অঙ্গীক্রিয়তে। আবরণভঙ্গানন্তরং স্বয়ং প্রকাশমানং চৈতন্যং ফলচৈতন্য মিত্যুচ্যতে, অস্মিন্ ফলচৈতন্যে নিষ্কলঙ্কে চিত্তবৃত্তি র্ন ব্যাপ্নোতি।" জীবের অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্য আচ্ছন্ন। সেই অজ্ঞানরূপ আবরণকে নষ্ট করিয়া দিবার নিমিত্তে অন্তঃকরণবৃত্তির ব্যাপার-অর্থাৎ ধ্যান ধারণা শ্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান। উক্ত আবরণ ভঙ্গানন্তর ব্রহ্ম জীবের আত্মাতে স্বয়ং প্রকাশিতরূপে দৃষ্ট হন। সেই স্বয়ম্প্রকাশমান ব্রহ্মচৈতন্যকে ফলচৈতন্য কহে। অর্থাৎ যে পরমফল লাভার্থ আবরণ ভঙ্গের ব্যাপার। উক্ত নিষ্কলঙ্ক ফলচৈতন্যে চিত্তবৃত্তির ব্যাপ্তি নাই। সদানন্দ কহেন "ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য

শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিরাকৃতং।" শাস্ত্রকর্ত্তারা অন্তঃকরণ-বৃত্তির ফলচৈতন্যকে প্রকাশ করনের যোগ্যতা নিষেধ করিয়াছেন।

৭ ছ। "এবঞ্চসতিমনসৈবানুদ্রষ্টব্যং যন্মসানমনুতে, ইত্যনয়োঃ শ্রুত্যো রবিরোধঃ।" অতএব উক্ত প্রকারে সংস্কৃত "মনেতেই দর্শনযোগ্যব্রহ্ম" এবং "যাঁহাকে মন দ্বারা মনন করা যায় না" এই উভয় শ্রুতির বিবোধভঞ্জন হইল। অর্থাৎ এইরূপ পরস্পর বিরোধী সকল শ্রুতির মীমাংসা হইল।

৭ জ। এ সম্বন্ধে বুঝিবার যোগ্য আর একটি কথা আছে। সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি, পুরুষকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে, "প্রকৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র," এই বিবেক জ্ঞান দিয়া স্বয়ং পুরুষের সন্নিধান হইতে অদৃশ্য হয়েন। সেই প্রাকৃতিদত্ত বিবেক জ্ঞান দ্বারা পুরুষ আত্মজ্ঞানরূপ কৈবল্য লাভ করেন। সেই আত্মকৈবল্য পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তবে অবিবেকাবরণে আচ্ছন্ন ছিল। বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা অবিবেকতা ও সেই অবিবেকতার মূল কারণরূপিণী প্রকৃতি অদৃশ্য হইল। অমনি ঐ আত্মকৈবল্য স্বয়ং প্রকাশিত হইল। বেদান্ত দর্শনেরও সিদ্ধান্ত প্রায় এইরূপ। যথা অন্তঃকরণবৃত্তি অজ্ঞানেরই রূপবিশেষ। অজ্ঞান, প্রকৃতিই। ঐ অন্তঃকরণ, সংস্কৃত অবস্থায় অবিবেকতারূপ অজ্ঞানাবরণকে নষ্ট করিয়া আপনিও নষ্ট হয়। তদনন্তর স্বয়ম্প্রকাশ পুরাতন ব্রহ্মাত্মজ্ঞান জীবের নিরুপাধিক আত্মাতে উদিত হয়। এ স্থানে উভয় দর্শনের বিচারে যে ভেদ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা শব্দতঃ ভেদ মাত্র। অর্থতঃ অভেদ। অবিবেকতা দূর করিয়া দিয়া প্রকৃতির স্বয়ং অদৃশ্য হওয়া, আর অন্তঃকরণবৃত্তি, অজ্ঞানকে বিনাশ করিয়া আপনিও নষ্ট হওয়া একই কথা। "প্রকৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র" এই জ্ঞানের অভাব অবিবেকতা" আর "অজ্ঞান প্রকৃতিরূপ কারণশরীর ও তৎকার্য্যরূপী সূক্ষ্মশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের ব্যক্ত অবয়ব স্থূল শরীর, এই শরীরত্রয় হইতে জীবাত্মা স্বতন্ত্র" এই জ্ঞানের অভাব আর অজ্ঞান একই কথা। সাংখ্যে আত্মকৈবল্য স্বয়ম্প্রকাশ, বেদান্তে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান স্বয়ম্প্রকাশ্। কেবল প্রভেদ এই যে, বেদান্তমতে, অন্তঃকরণবৃত্তির ব্রহ্মানুষ্ঠানবশতঃ জীবাত্মার স্বীয়কোষ মধ্যে অন্তঃকরণাদির অবভাসক আভাসরূপী ব্রহ্মজ্যোতিঃ দৃষ্ট হন। তদালোকে অজ্ঞান ও তৎকার্য্য অন্তঃকরণাদি সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরাদি আবরণ নষ্ট হয়। কিন্তু সাংখ্যমতে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মদর্শন নাই। বেদান্ত মতে ঐ আবরণ ভঙ্গ হইলে, প্রত্যগাত্মারূপ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান অর্থাৎ "ব্রহ্মই আমার আত্মা" এই আত্মজ্ঞান জীবাত্মাতে উদিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনই আত্মদর্শন। সাংখ্যমতে জীবের আত্মচৈতন্যেতে আত্মজ্ঞান হয়, তাহা প্রতি জীবের পক্ষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আত্মজ্ঞান, কিন্তু বেদান্তমতে এক অদ্বিতীয় ফলচৈতন্যেতে সকল মুক্ত জীবের সমান আত্মজ্ঞান হয়। কেননা সেই একই ফলচৈতন্য প্রত্যেক জীবেতে প্রত্যগাত্মারূপে আসীন আছেন। তাঁহাকে প্রত্যগাত্মারূপে সাধন করাই তাঁহার উপাসনা এবং তাঁহার স্বয়ম্প্রকাশ ধর্ম্মই তাঁহার জ্ঞান।

৭ ঝ। অন্তঃকরণ বৃত্তির বিনাশ, নিরোধ, নিবৃত্তি বা শান্তি একই কথা। অন্তঃকরণবৃত্তি সকল, যখন ইন্দ্রিয়গণ ও কাম ক্রোধাদি রিপু-

দিগকে সৈন্যসামন্তরূপে বরণ পূর্ব্বক সঙ্গী করিয়া বহির্ম্মুখগামী হয়,তাদৃশ অবস্থায় তাহাদিগকে জ্ঞানবিরোধী বা আত্মারূপ রাজার অরাতি স্বরূপ বলা যায়। কিন্তু তাহাদের যখন অন্তর্ম্মুখ গতি হয়, যখন তাহারা নিবৃত্তি-ভাব, শান্তভাব ও নিরোধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা আর রাজবিরোধী থাকে না। তাহাদের পূর্ব্ব শত্রুতা তখন রহিত হয়, সেই উপলক্ষে তাহাদের বিনাশ স্বীকার করা যায়। এ বিনাশ বস্তুতঃ বিনাশ নহে; কিন্তু উপদ্রব-শান্তি মাত্র। সে অবস্থায় তাহারা আত্মার পক্ষে "প্রসাদগুণবিশিষ্ট ধাতুস্বরূপ" অর্থাৎ মৈত্রধর্ম্মী হয়। (কঠোপনিষৎ ২।২০)

৭ঞ। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, এক রাজা ছিলেন। তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে। অমাত্যবর্গের মুখে এই সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার সঙ্গে চল আমরা এখনই গিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিব। এই কথা বলিয়া রাজা অমাত্য ও সৈন্যগণসমভিব্যাহারে শত্রুদিগের সম্মুখীন হইবামাত্রে তাহারা শত্রুভাব ত্যাগ করিয়া বশীভূত হইল। রাজপরিবার ও প্রজাগণ সকলেই মনে করিল, রাজা পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে এখন তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন। কিন্তু তাহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে,রাজা তাহাদিগকে বধ না করিয়া, স্বীয় অন্তঃপুরের উত্তম স্থানে বাস দিয়া তাহাদিগকে পালন করিতে লাগিলেন। তাহারা রাজাকে কহিল যে, আপনি উহাদিগকে বধ করিবেন বলিয়াছিলেন, কই তাহাতো করিলেন না,বরং প্রতিপালন করিতেছেন। এই কি বধ? রাজা উত্তর দিলেন হাঁ আমি শত্রুবিনাশ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছি। এখন তোমরা দেখ তাহারা আর আমার শত্রু নহে। এখন তাহারা আমার মিত্র। তাহাদের শত্রুভাব বিনষ্ট হইয়াছে।

৭ট। চিত্তবৃত্তির এই বিনাশ সমূল-বিনাশ নহে। উপাসনা ও যোগের অবস্থায় তৎসমূহের অন্তর্মুখতারূপ নিবৃত্তিমাত্র স্বীকার করা যায়। কিন্তু মৃত-বিদেহ-মুক্ত-পুরুষের পক্ষে চিত্তবৃত্তি, ইন্দ্রিয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত উপাধির নিঃশেষ উপরম উক্ত হইয়াছে। (কঠোপনিষদে "যেয়ং প্রেতে" প্রভৃতি শ্রুতি দ্রষ্টব্য)।

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

—:o:—

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়"?

অতি সত্য কথা, যথন ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে বৃহৎকায় মত্তমাতঙ্গ এবং মাতৃক্রোড়-শায়ী অপোগণ্ড শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ পর্য্যন্ত স্বাধীনতালাভের জন্য লালায়িত ও প্রয়াসবান্. তথন সংসারের ললামভূতা সপর্য্যাভূমি নারীগণ কেন উহার জন্য লোলুপ ও লোলজিহ্ব হইবেন না, উহার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবেন? কিন্তু ইহার মধ্যে একটা 'কিন্তু' আছে। বিধাতা নারীজাতিকে এরূপ উপাদানে রচনা করিয়াছেন, যেন তাঁহাদিগের স্বাধীনতা পুরুষের স্বাধীনতা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ও অসাধারণ। মহর্ষি পাণিনি কারক প্রকরণে কর্ত্তার লক্ষণ বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা ১।৪।৫৪

যিনি সর্ব্ববিষয়ে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, যাঁহার অধীন সকলে, তাঁহারই নাম কর্ত্তা। কর্ত্তা স্বাধীন, কিন্তু কর্ত্রী যেন ঠিক ততদূর স্বাধীনা নহেন। তাঁহার স্বাধীনতা পরিমিত ও সীমাবদ্ধ। জগতে পুরুষকার ও পৌরুষ বলিয়া একটা কথা ও জিনিস আছে, কিন্তু নারীকার বলিয়া কোনপদার্থ ছিল বা আছে বলিয়া জানা যায় না। নারীগণ বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানগরিমার আধারও বটেন ও হইতে পারেন এবং হইয়া থাকেন। দীমন্ত সদ্‌গুণ রাশিরও যে তাঁহারা একমাত্র আধার-ভূমি তাহাও বিসংবাদশূন্য স্বীকৃত সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগের স্বাধীনতা ও পুরুষের স্বাধীনতা এক নহে। তাঁহারা দৈহিক উন্নতিতে পেটাগনীয়ানদিগের ন্যায় অত্যুন্নতই হউন, আর তাঁহাদিগের বাহুযুগল সুদৃঢ় লোহার ন্যায় কঠিনাদপি কঠিনতরই হউক, তথাপি তাঁহাদিগের হৃদয় নারিকেলের মতন কোমল না হইয়া পারিবে না, তাঁহাদিগের অবলা নামও ঋজুপাঠের বাঘের মানুষং খাদতীতি লোকাপবাদের ন্যায় দুনিবার। তাই ঋষিরা বলিয়াছেন—

বিনাশ্রয় ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ।

পণ্ডিতমণ্ডলী, লতা ও বনিতারা কথনই অন্যের আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারেন না ও নিরাশ্রয় থাকা ও রাখাও শুভোদর্ক (good in future) নহে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি জগতের সকলেই স্বাধীন, এথন বলিতেছি তাহার মধ্যেও একটা কিন্তু বর্ত্তমান আছে। তুমি যদি দুই তিন বৎসরের শিশুকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দাও, তাহা হইলে হয় সে পুকুরে পড়িয়া মারা যাইবে, না হয় গাড়ীর চাকায় নিষ্পিষ্ট হইবে, কিংবা হারাইয়া যাইবে। উন্মত্তকে স্বাধীনতা দান করিলেও তাহাতে ভীষণ

বিভ্রাট ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এইরূপ আরও নানা কারণে পুরুষগণও সকল সময়ে সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতালাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন না। তদ্রূপ মানব-সাধারণ স্বাধীনতাতে পূর্ণস্বত্ববতী ও পূর্ণাধিকারিণী নারীজাতিও পুরুষের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্বসময়ে পূর্ণস্বাধীনতালাভের অধিকারিণী হইতে পারেন না। তাঁহাদিগের স্বাধীনতা পরিমিত ও সীমাবদ্ধ। কেন পরিমিত? তাঁহারা শত হইলেও অবলা,আপনারা আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং তুমি একটি দ্বাদশ বৎসর বালককে একটি গোটা পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে দিতে পার, তথাপি ঐ বালকের মাতাকে একাকিনী একটি পাড়া বেড়াইয়া আসিতেও বলিতে পার না। তাই ঋষিরা বলিয়াছেন যে—

> পিতা রক্ষতি কৌমারে
> ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
> রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা
> ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি॥

৩—৯অ মনু।

পিতা কুমারীগণকে বিবাহের পূর্ব্বপর্য্যন্ত রক্ষা করিবেন, বিবাহের পর যুবতীগণকে স্ব স্ব স্বামিগণ রক্ষা করিবেন, বার্দ্ধক্য সমাগত হইলে নারীগণের ভার পুত্রদিগের হস্তে বিন্যস্ত হইবে। সামাজিকগণ কোন অবস্থাতেই নারীগণকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইতে দিবেন না।

> অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ
> পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশং।
> বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ
> সংস্থাপ্যা আত্মনোবশে॥ ২৮—ঐ

আত্মীয় পুরুষেরা আপনাদিগের কুলললনাদিগকে নক্তন্দিব আপনাদিগের বশে রাখিয়া নৃত্য গীত, বাদিত্র ও উৎসবাদি বিষয় সমূহ ভোগ করিতে দিবেন, কিন্তু উঁহাদিগকে কদাচ স্বাধীনা হইতে দিবেন না।

তবে কি নারীগণ অবগুণ্ঠনদ্বারা মুখ-নাসিকা সংবৃত করিয়া অসূর্য্যম্পশ্যরূপা হইয়া অন্তঃপুররূপ কারাগৃহে অনন্তকাল সংরুদ্ধ থাকিবেন? না কখনই নহে। উদাহৃত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য কখন এরূপ নহে যে, নারীগণকে হাতে পায়ে বান্ধিয়া অবরোধে রাখিয়া দিবে, তাঁহাদিগকে চন্দ্রসূর্য্যের মুখ দেখিতে দিবে না। পূর্ব্বকালে নারীগণ কামান বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিতেন, ঋগ্‌বেদে আছে—বিশ্‌পালানাম্নী একজন মহিলা রণাঙ্গনে কামানের গোলকে আহত হইয়া পদ বিহীন হইয়াছিলেন, পরিশেষে অশ্বিনীকুমারেরা লৌহদ্বারা তাঁহার পদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঋগ্‌বেদে ইহাও রহিয়াছে যে, নারীগণ স্বয়ংই রথচালনাপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকগণের আহার্য্য লইয়া যাইতেন। অথর্ব্ববেদে রহিয়াছে

ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিং।

কন্যারা পুত্রগণের ন্যায় গুরুগৃহে যাইয়া বেদাদির অধ্যয়ন শেষ করিয়া যৌবনে সন্তোষধৃনাম ধারণপূর্ব্বক যুবাপতি বরণ করিবেন। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহারা গৃহকোণে শৃঙ্খলিত হইয়া থাকিতেন না। দ্বৈতবনে যখন প্রকাশ্য সভাতে যুধিষ্ঠিরাদি ও সমাগত ঋষিগণ কথোপকথন করিতেন, তখন মহাদেবী দ্রৌপদী তথায় উপস্থিত থাকিয়া বাদপ্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইতেন। গার্গী ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বিদুষীরা জনকরাজার প্রকাশ্য রাজ-

সভাতে কোমর বান্ধিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতেন ও সমাগত যে কোন ঋষির সহিতই শাস্ত্রবিচার করিতেন। এখনও মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড ও কাশ্মীরকাশ্যাদিভূমির ললনাগণ স্বৈরবিহার করিয়া থাকেন। সুতরাং নারীগণ অন্তঃকারাগারে সংরুদ্ধা হইয়া থাকিবেন ও থাকিতেন, ইহা প্রকৃত কথা নহে। বেদাদি কোন প্রাচীন সাহিত্যেও অবগুণ্ঠন শব্দের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে ললনাকুলের পবিত্রতাধ্বংসকারী কোন কোন নৃপতিগণের সময়ে অবগুণ্ঠন ও অবরোধবাসের পথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, পরন্তু উহা প্রচলিত সাধারণ রীতি ছিল না।

তবে নারীগণকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইতে দিবে না, ইহা বলার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য ইহাই যে, নারীগণ প্রয়োজনবশতঃ যেথানে ইচ্ছা সেইখানেই যাইতে পারেন ও যাউন, কিন্তু তাঁহারা পুরুষের ন্যায় কথন কোন স্থানে একাকিনী যাইবেন না। বিবাহের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত পিতা আপনার কুমারী কন্যাকে লইয়া সর্ব্বত্র গমনাগমন করিবেন। পিতার অভাবে বা অনুপস্থিতিতে পিতৃব্য বা রক্ষণসমর্থ ভ্রাতারা তাহার সহায় হইয়া তাহাকে লইয়া যাইবেন। যদি ঋষিবাক্যে অবহেলা করিয়া তোমরা কোন কুমারীকে একাকিনী স্বৈরবিহার করিতে দাও, তাহা হইলে কোন না কোন বিপদ্ অবশ্যম্ভাবিনী বলিয়া জানিবে।

আট হইতে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের কন্যাদিগকে তোমরা বালিকা বলিয়া ধরিয়া লও। এই বালিকাগণেরও কুত্রাপি একাকিনী গমন নিরাপদ নহে। পৃথিবীর সভ্য, অসভ্য সকল জনপদেরই সাক্ষ্য গ্রহণ কর, তোমরা দেখিতে পাইবে, এই বয়সের বহু বালিকাকে কুলোক ও পাষণ্ডদিগের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। এই বয়সের বালকেরা পৃথিবী ঘুরিয়া অক্ষত শরীরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু, বালিকাগণ পারে না ও পারিবে না। মুটেরা যখন মাথায় করিয়া গজাল বা ইটকাঠ লইয়া যায়, তখন উহাতে কোন চাপা দেয় না, কিন্তু মুটের মাথায় মাছ বা সন্দেশ রসগোল্লা দিয়া তোমরা কখন তাহাকে উহা অনাবৃতাবস্থায় লইয়া যাইতে দিবে না, সেও তাহা করিবে না, কেননা চিলে উহাতে ছোঁ মারিতে পারে, ও ছোঁ মারিয়া থাকে। অনেক সময়ে দুষ্ট চিলগুলি হাতের রক্ত বাহির করিয়া ঠোঙ্গার খাবার লইয়া যায়, অন্ততঃ নিতে না পারিলেও থাবা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া তোমাদের ক্ষতি করে।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম, প্রত্যেক ভদ্রপরিবারেরই এই সনাতন পদ্ধতি যে তাঁহারা আপন আপন বালিকাদিগকে, আপন আপন বালকগণের সহিত এক বিছানায় শয়ন করাইয়া থাকেন না। বালক ও বালিকাদিগের বহুস্থলে শয়নকক্ষই স্বতন্ত্র থাকে, অন্ততঃ পক্ষে শয্যা পৃথক্ থাকেই। কেন? অভিজ্ঞ পুরন্ধ্রীগণ একত্র শয়ন করিতে দেওয়ায় কি ফল, তাহা জানেন, তাই তাঁহারা এত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। এখন বুঝিয়া দেখ যেথানে সহোদর সহোদরার মধ্যেও এত দূর সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, তথন এহেন বালিকাদিগকে স্বতন্ত্র হইয়া একাকিনী বিচরণ করিতে দেওয়া কতদূর অবিমৃশ্যকারিতা। অনেক সময়ে

সরলপ্রাণ বালিকারা কুচরিত্র বালিকাদিগের সহিত মিশিয়া মন্দ শিক্ষা পাইয়া থাকে। তাহাতে কেহ মিথ্যাবাদিনী হয়, কেহ কেহ বা ঝগড়াটে হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষাও ভয়ের কারণ আরও বেশী রহিয়াছে। সে ভয়ের কারণ তাদৃশ বালিকা বা কিশোরীগণের পল্লীর কিশোর সমাগম। পাণিনি ব্যাকরণে কয়েকটি সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা প্রাসঙ্গিক বোধে এখানে উহার কয়েকটির সমাহার করিব পাণিনি বলিতেছেন যে—নারীগণ কেবল নদীবৎ নন্ (স্ত্রী নদীবৎ বোপদেবঃ) তাঁহারা পুরুষবৎও বটেন—

স্ত্রী পুংবচ্চ ১।২।৬৬।

বাপুসকল, একালের মেয়েগুলি পুরুষের মতন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, দশ এগার বার বছরের মেয়েরাও ঐ বয়সের অথবা প্রায় কিঞ্চিদধিক বয়সের ছেলেদের সহিত মিলিয়া খেলা করে ও বেড়ায়। কেন? এটা কালমাহাত্ম্য, তাই পাণিনি পরেই বলিলেন যে—

পুমান্ স্ত্রিয়া ১।২।৬৭।

বেটা ছেলেগুলিও সমবয়সা মেয়েগুলির সহিত যাইয়া মেশে। কেননা স্ত্রীজাতি যে পুরুষের সহিত মিশিবে এটা নৈসর্গিক। ইহার উদাহরণ দিতে যাইয়া পাণিনি বলিলেন যে—

পিতা মাত্রা (১।২।৭০)

শ্বশুরঃ শ্বশ্র্বা (১।২।৭১

দেখ পিতা যাইয়া মাতার সহিত ও শ্বশুর যাইয়া শাশুড়ীর সহিত মিলিত হইতেছেন। ইহার মোটামুটি তাৎপর্য্য ইহাই যে পুরুষ পাইলে স্ত্রী ও স্ত্রীলোক পাইলে পুরুষ যাইয়া তাহার সহিত মিশিবেই, অতএব ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকেও স্বাধীনভাবে একত্র মিশিতে দিও না। কেন? তোমরাও একদিন ছোট ছিলে, কি করিতে তাহাও মনে না পড়ে তাহা নহে, অতএব "মা গমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ"—নিজেরাও যত কেন বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক হওনা, নারীর নিকট যাইও না, বালক বালিকাদিগকেও কখন স্বাধীনভাবে একাকী মিশিতে দিও না।

এ গেল অল্পবয়াদের কথা, এইক্ষণে আমরা কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা যুবতীদের কথা বলিব। পাণিনি অনেক ঠেকিয়া শিখিয়া সূত্র করিলেন—

স্ত্রিয়াম্ ৪।১।৩।

অর্থাৎ পৃথিবীতে যত কিছু আপদ্ বিপদ্ দেখ, তৎসমুদয়ই শুদ্ধ স্ত্রীঘটিত। দেবাসুর বা শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধও স্ত্রীঘটিত রামরাবণের যুদ্ধও স্ত্রীঘটিত, মহাভারতের যুদ্ধও স্ত্রীঘটিত, আর ট্রয়েব যুদ্ধও সেই স্ত্রীলোকের জন্য। অতএব স্ত্রীতে জগতের সমুদয় নির্ভর করে। পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে বাল্যবিবাহ ছিল না, যৌবনেই সকল নরনারীর বিবাহ হইত। কাহার কাহার যে যৌবনান্তেও বিবাহ না হইত তাহা নহে, কিন্তু সে অতি বিরল। তৎকালে নারীগণ ঠিক পুরুষের ন্যায়ই সুশিক্ষিতা হইতেন, এবং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সুনীতি, সদাচার, সংযম ও ধর্ম্ম বিষয়েও প্রচুরভাবে উপদিষ্ট হইয়া তবে সদ্যো-বধূ হইতেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রায়ই চরিত্রের স্খলনজনিত দোষে দুষ্ট হইতে হইত না। একালেও নারীগণের শিক্ষা না হইতেছে, তাহা নহে, কিন্তু সংযম, সুনীতি, সদাচার ও ধর্ম্ম শিক্ষা আদবেই হইয়া থাকে না। কাজেই একালে যৌবনান্ত-বিবাহের প্রথা অসাময়িক

ও উহার ফলও অনেক সময়ে প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে না। কেননা যৌবনক্ষুধা ও যৌবন-তৃষ্ণা অতীব বলবতী, মলমূত্রের বেগ ধারণ করা যেমন অশুভোদর্ক, যৌবনক্ষুধাতৃষ্ণার বেগ ধারণ করাও তদ্রূপ অমঙ্গলগর্ভ। এহেন সময়ে যুবতী কুমারীগণের পক্ষে স্বাধীন ভাবে যুবক সমাগম বড়ই ভয়াবহ ব্যাপার। পাশ্চাত্য-অনুকরণপ্রিয় যাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া এহেন অসংযত যুবক-যুবতীদিগকে স্বাধীনভাবে একাকী বিচরণ বা নিভৃতে অবস্থান করিতে দিয়া থাকেন, তাঁহারা সমাজের মিত্ররূপী মহাশত্রু। নারীগণ প্রকাশ্য সভাসমিতিতে গমন করুন, কিন্তু যেন পুরুষগণের সহিত তাঁহাদিগের অরক্ষিতভাবে সংযোগ বা দেখাদেখি না হয়। নিভৃত, কি প্রকাশ্য স্থান, কোন স্থানেই কোন যুবক, কোন যুবতীর অঙ্গ সংস্পর্শ করিবেন না, করিলে বিপৎপাত অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। স্পর্শসুখে মানুষকে বিমুগ্ধ করে, একের দেহ অন্যেরদ্বারা স্পৃষ্ট হইলে, অতর্কিতভাবে যে একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া থাকে, তাহা ধ্রুবই। প্রবাদ বলে—

"সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি
আড়াই হাত ফাক"

আমরাও বলি, বাপু সকল, যুবক যুবতী দিগকে বিশ্রম্ভালাপ করিতে দেও, কিন্তু যেন মাঝে গণা সাড়ে তিন হাত ফাক থাকে। বিবাহের পূর্ব্বেও বর কন্যা ঐ ভাবে মাঝে ফাক রাখিয়া আলাপ করিবে. কিন্তু কেহ কাহার যেন অঙ্গ স্পর্শ না করে। যে ফ্রান্সদেশ স্খলনচরিত্রের জন্য নিত্য নিন্দিত, তথাকার কোর্টশিপের যুবক যুবতীরাও একে অন্যের অঙ্গ স্পর্শ করিতে নিষিদ্ধ। অতর্কিতভাবে সামান্য অঙ্গ স্পর্শ ঘটিলেও সে বর অন্য কন্যার পাণি-গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে এখন বাঙ্গলার যুবক যুবতীরা নিভৃতে বা গুরুজনসমক্ষেও একে অন্যের করস্পর্শ, করমর্দ্দন বা দেহস্পর্শ করিতেছেন অথচ তাঁহারা একে অন্যের কোন প্রকার আত্মীয়ও নহেন। পক্ষান্তরে দেখ ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা
ন বিবিক্তাসনোভবেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো
বিদ্বাংস মপি কর্ষতি॥ মনু।

মানুষ কখন যুবতী বিমাতা, ভগিনী, এমন কি যুবতী কন্যার সহিতও কোন নির্জ্জন স্থানে একত্র অবস্থিতি করিবে না। কেননা ইন্দ্রিয় সকল অতি বলবান্, উহারা অতি বিদ্বান্ ব্যক্তি দিগকেও অভিভূত করিয়া থাকে।

স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ?

পাণিনিও যুবক যুবতীদিগকে দ্বন্দ্ব বা মিলিত হইতে নিষেধ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

দ্বন্দ্বে ঘি।২।২।৩২

অর্থাৎ দ্বন্দ্বে মিথুনত্বে ঘি বা ঘৃতবৎ কার্য্য হইয়া থাকে। মহাভাষ্যকার ও বৃত্তিকারেরা এ সূত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু এই বৈয়াকরণ সূত্রেরই ভাষ্য করিতে যাইয়া চক্ষুষ্মান্ বিষ্ণুশর্ম্মা বলিতেছেন যে—

ঘৃতকুম্ভসমা নারী
তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান।
তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ
নৈকত্র স্থাপয়েৎবুধঃ॥

অর্থাৎ নারীগণ ঘৃতকুম্ভবৎ, আর পুরুষ-গণ তপ্তাঙ্গারতুল্য, পণ্ডিতগণ কখনও এই

ঘৃত ও অগ্নিকে একত্র রাখিবেন না। যদি রাখা যায় তাহা হইলে কি হইতে পারে? পাণিনি তাহাও বলিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি বলিয়াছেন, হে বাপু সকল যদি তোমরা যুবক যুবতীদিগকে একাকী নির্জ্জনে মিলিতে দাও, তাহা হইলে—

শেষে লোপঃ ।৭।২।৯০

অর্থাৎ পরিশেষে তাহাদের লোপ হইবে। কি লোপ হইবে? লজ্জা ভয়, সরম ও ভরম লোপ পাইবে। অথবা আমাদিগের এ ব্যাখ্যা নিরর্থক। পাণিনি নিজেই তাঁহার লোপ শব্দের অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন—

অদর্শনং লোপঃ ।১।১।৬০

অর্থাৎ শেষে সেই যুবক যুবতীর অদর্শন ঘটিবে। আমরা আমাদিগের উক্তির সমর্থন জন্য এক্ষণে হিতবাদী হইতে একটি আমেরিকান স্বাধীন যুবতীর ইতিহাস বিবৃত করিব। উহাতে লিখিত হইয়াছে।

"পাশ্চাত্য—প্রেম—খানশামার সহিত পলায়ন। বিগত ১০ই জানুয়ারি তারিখে আমেরিকার চিকাগো নগরে একটি পাশ্চাত্য সুন্দরীর কাহিনী জাহির হইয়াছে। তিনি ফিলাডেলফিয়া নগরের একজন কোটীপতি ব্যবসায়ীর পৌত্রী। ইনি ভোগ-সুখ লালিতা নবযৌবনপুষ্পিতা সপ্তদশবর্ষবয়স্কা সুন্দরী, কিন্তু ফুলধনুর মহিমায় এই নবযুবতী শত শত প্রেমপ্রার্থী রূপবান্ যুবকের নবীন অনুরাগ উপেক্ষা করিয়া পিতৃগণের একটি প্রৌঢ় খানশামার প্রেমে আত্মসমর্পণ করেন। পরে পিতা মাতার অতুলঐশ্বর্য্যের মায়া কাটাইয়া খানশামার সহিত বিবাহসূত্রে ঝাঁপ দেন।" ১৭শে মাঘ ১৩১৬ সাল।

আমরা প্রবন্ধটির অতি সংক্ষিপ্ত অংশ গ্রহণ করিলাম। কেন এরূপ ঘটিল? পণ্ডিতগণের নিষেধ না শুনিয়া কন্যার অভিভাবকেরা যুবতীকে খানশামার সহিত নিভৃতে স্বাধীনভাবে মিলিতে দিয়াছিলেন, তাহাতেই এই সর্ব্বনাশ সংঘটিত হয়। যেখানে বিকৃত স্বাধীনতা এহেন বিকার আনিয়া দেয়, তথায় মানুষ কখনই উহার সমর্থন ও অবলম্বন করিতে ও করাইতে পারেন না। যেখানে নিকৃষ্ট খানশামাও উপেক্ষিত হয় না, তথায় রূপবান্ যুবক সমাদৃত হইবে ইহা ধ্রুবই। তাই বহুদর্শী ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ
পত্যাচ বিরহোঽটনং।
স্বপ্নশ্চান্যগৃহে বাসো
নারীণাং দূষণানি ষট্ ॥

মদ্যপান, দুর্জ্জনসংসর্গ, পতিবিরহ, অটন বা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান, স্বপ্নদর্শন ও অন্যের গৃহে বাস, এই ছয়টীই নারীগণের দোষের প্রধান কারণ।

অবশ্য মদ্যপানের আশঙ্কা ভারতবর্ষে নাই, কিন্তু পূর্ণসভ্যদিগের দেশে উহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। যে সকল যুবক অকারণ আসিয়া যুবতীদিগের সহিত বৃথা আলাপ করে, আত্মীয়তা পাতে, আমি বলি তাহারা দুর্জ্জন ভিন্ন কখনই সুজন নহে। নিশ্চলস্বভাবা সরলা যুবতীগণ অনেক সময়ে এই সকল আত্মীয়বেশধারী দুষ্ট যুবকগণদ্বারা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া থাকে। পতিবিরহও অনেক সময় মন্দের কারণ হয়। যাহাদের যৌবনান্তেও বিবাহ দেওয়া হয় না, তাহাদের সেটাও পতিবিরহের প্রকারভেদ বলিয়া ধরিয়া লও, পাড়া বেড়ানটা

আরও মন্দ। তারপর যে সকল অভিভাবক আপনার যুবতী কন্যাদিগকে অন্যের বাড়ীতে বন্ধুতা রক্ষা করিতে যাইয়া রাত্রিবাস করিতে দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মতন অবিবেচক ও আহম্মক ব্যক্তি জগতে দ্বিতীয় নাই। এই সকল পরগৃহে বাস, শেষে বিষ প্রসব করিয়া শক্রতে পরিণত করে।

আজিকালি শিক্ষার প্রভাবে অনেক পরিবারের কন্যারাই নানা সদ্‌গুণরাশিতে সমলঙ্কৃত হইয়াছেন। আমরা বহুপরিবারের যুবতী কন্যাদিগের লজ্জা, সরম, বিনয় ও পবিত্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকি। উঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন উঁহারা প্রকৃতই স্বর্গের দেবকন্যা, কিন্তু, অনুচিত স্ত্রীস্বাধীনতা (যাহাকে স্বেচ্ছাচার বলিলেই সঙ্গত হয়) উঁহাদিগকে দিন দিন বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। আমরাও স্ত্রীস্বাধীনতার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। প্রত্যেক নারীকেই তোমরা যথায় ইচ্ছা তথায় যাইতে দাও, কিন্তু তাঁহারা যেন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য, স্বামী বা অভিভাবকশূন্য হইয়া একাকিনী গমন করিতে অনুমত হয়েন না। তোমার হৃদয়ের বন্ধুগণকেও তুমি তোমার পরিবারস্থ মহিলা গণের উপযুক্ত রক্ষক বলিয়া জ্ঞান করিও না।

তোমরা "অবরোধ" কথাটার উপর বড়ই চটা। কিন্তু বাপু সকল, উহার অর্থ, নারীগণের সিভিল কারাগৃহ নহে। স্বামী বা পুত্রও স্ত্রী বা মাতাকে সংবাদ না দিয়া তাঁহাদিগের কক্ষে প্রবেশ করিবেন না। পাশ্চাত্য-জগতেও এই পবিত্র রীতি অদ্যাপি প্রচলিত। এদেশেও পূর্ব্বে এহেন রীতির প্রচলন ছিল বলিয়া অন্তঃপুরকে সামাজিকেরা "অবরোধ" শব্দে অভিহিত করিতেন। উহার অর্থ—

No admission

অর্থাৎ অনুমতি ভিন্ন প্রবেশ নিষেধ। বস্তুতঃ পরমার্থতঃ আমাদিগের দেশের ললনারা অন্তঃপুর মধ্যে সংরুদ্ধ হইয়া থাকিতেন না। তবে যাকে তাকেও বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইতে দেওয়ার প্রথা ছিল না। আমরাও তোমাদিগকে বলি, তোমরা সেই আর্য বিধির অবমাননা করিয়া সর্ব্বনাশকে ডাকিয়া আনিও না। বলিবে, ভয় কি, শিক্ষাদীক্ষায় সমুন্নত একালের যুবক ও যুবতীরা বিকৃত হইবার নহে। যদি তোমরা একথা বলিতে অগ্রসর হও, তাহা হইলে বলিব, তোমরা সমাজের কোন খবর রাখ না, অথবা তোমরা সত্যাপলাপী। ঋষিরা বলিয়াছেন—

'বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"

কিন্তু জগতে এরূপ কয় জন ধীর ও ধীরা বর্ত্তমান? তাই বলি ভাই সকল "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম"—"অতিশয় কোন কর্ম্ম না করিও ভাই"। হে কৃষকগণ যদি কল্যাণ চাও, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের আপন আপন ক্ষেতে বেড়া দাও, আর ছেলেরা যখন আপন আপন গরুর পাল লইয়া মাঠে যাইবে, তখন যেন তাহারা আপন আপন গরুর মুখে দড়ীর মুখবন্ধ পরাইয়া বেড়ার আড়াই হাত তফাত দিয়া গমন করে। মুখ বান্ধাই বা কেন, আর তফাত দিয়া যাওয়াইবা কেন? বেড়াই ত আছে? মুখ না বান্ধিলে দুষ্ট ষাঁড়গুলি হেলিয়া-পড়া ধানের ছোবায় মুখ দিতে পারে, আর নিকট দিয়া গেলে পাএর চাটিতে বেড়া বা শস্যের কোন না কোন ক্ষতি হওয়াও অসম্ভব নহে। বাপু সকল, আম, জাম, কাঁটাল

কলা, লোকে হট্টে প্রসারিত করিয়া বিক্রয় করুক, লোকে ধরিয়াও দেখুক, কেননা সেগুলি ধুইয়া লইতে পারিবে, কিন্তু তোমাদের খাবার দোকানে কাচের আলমারি করিয়া সন্দেশ ও রসগোল্লা প্রভৃতি রাখিয়া দেও। লোকে আয়নার ভিতর দিয়া দেখিয়া তবে দাম দিয়া ক্রয় করুক, দাম হাতে পাইয়া তবে খাবার জিনিষে হাত দিতে দিও, তৎপূর্ব্বে নহে, কেননা হাতের তৈলপ্রভৃতি লাগিয়া নষ্ট হইতে পারে, যদি সে শেষে ক্রয় নাই করে? আর যে সকল ফিরিওয়ালা রাস্তায় মেঠাই বেচিয়া থাকে, তাহারাও যেন তাহাদের খাবারে চাপা দেয়, নতুবা কাকে উহাতে মল-মূত্রত্যাগ করিতে পারে, চিলে ছোঁ মারাও বিচিত্র নয়। আমাদিগের শেষ নিবেদন তোমরা মন্দের অনুকরণ করিও না।

অনুকরণং চানিতিপরং। ওখানে "চানী-তিপরং" কথাটীতে নএর ঈকার হ্রস্ব হইল কেন? যেহেতু যেটা অনীতি, সেটায় খাট (হ্রস্ব) থাকাই উচিত, তাই পাণিনি জানিয়া শুনিয়াই ঐরূপ করিয়াছেন। ১।৪।৬২। অনুকরণই যত অনীতি বা দুর্নীতির কারণ। তোমরা ভারতললনার অনন্যসাধারণ পাতি-ব্রতা ও পবিত্রতা স্মরণ করিয়া সাবধান হও। খাল কাটিয়া ঘরে কুমীর আনিও না

সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ
স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা বিশেষতঃ।

মনু বলিতেছেন, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও ললনাগণের সম্বন্ধে সতর্কতা আশ্রয় করিবে। স্ত্রীতে ও শ্রীতে কোন ভেদ নাই। নারীগণ গৃহের দীপ্তিস্বরূপ।

যাত্রা।

আমি পরে যা'ব, কিবা ক্ষতি।
তুমি আগে গেলে হ'ল ভাল।
তুমি যে গৃহের লক্ষ্মী আমার,
আগে গিয়ে ঘরে আলো জ্বালো।
নন্দন হ'তে ফুল ল'য়ে
বিছায়ে রাখিও মোর লাগি
কোমল একটি কুসুম শয্যা,
রহিতে হ'বেনা রাতি জাগি।
আমি হেথাকার কাজ সেরে'
ত্বরা করি সখি চলে যাব।
তোমারে ছাড়িয়া এ ছার জগতে
বল কোথা আমি সুখ পাব!

আমার লাগিয়া রেখো খুলি'
তোমার গৃহের দ্বার খানি;
ভুলিয়া থেকোনা যেন কভু মোরে,
ওগো প্রিয়ে, ওগো হৃদিরাণী।
নন্দনে যবে ফুটে ফুল,
উর্ব্বশী করে বীণা বাজে,
গোলক যখন আরতি নিনাদে
ভরিয়া উঠে গো পূত সাঁঝে,
আমি সেইক্ষণে তব দ্বারে
দাঁড়াইব গিয়ে জেনো প্রিয়ে,
হাত ধরে মোরে গৃহে ল'য়ো তব,
মালা গাছি তব পরাইয়ে।

উদ্ভিদের যৌন-সম্মিলন।

"Flowers in the crannied wall
I pluck you out of the crannies
I hold you here, root and all ;
in my hand
Little flower—but if I could understand
What you are, root and all and all in all
I should know what God and man is."

Wordsworth.

জন্ম, বৃদ্ধি, বিবাহ ও মৃত্যু প্রাণীমাত্রেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। উদ্ভিদ যখন প্রাণীপর্য্যায়ভুক্ত তখন উহারও বিবাহ আছে। বিবাহের উদ্দেশ্য বংশ বিস্তার। উদ্ভিদের জীবনেতিহাসে উহার বিবাহ ও বংশ বিস্তার কাহিনী এক অতি অপূর্ব্ব আনন্দজনক ও শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার। ফুলের সাহায্যে এই বংশ বিস্তার সংঘটিত হয়। ফুলই উদ্ভিদের স্বামী ও স্ত্রী, সুতরাং উদ্ভিদের বিবাহ-রহস্য বুঝিতে হইলে উহার ফুলের সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। অতএব প্রারম্ভেই ফুলের গঠন-তত্ত্বের কিছু আলোচনা করা যাউক।

সচরাচর ফুলের চারিটি অঙ্গ। কাহারও কাহারও দুইটি অঙ্গমাত্র থাকে। কাহারও আবার মাত্র একটি অঙ্গ। পূর্ণাঙ্গ (Complete) পুষ্পের চারিটি অঙ্গই বর্ত্তমান থাকে। একটি ধুতুরা ফুল লইয়া ইহার অঙ্গ চতুষ্টয়ের সহিত পরিচয় করা যাউক। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে বৃন্তের উপরে একটি হরিৎবর্ণ চক্রাকার কুণ্ড আছে। উহার নাম ইংরাজিতে Calyx। বাঙ্গালায় উহাকে পুষ্প-কুণ্ড বলা যাউক। এই পুষ্প-কুণ্ডের পাপড়িগুলিকে 'পল' কহে (Sepal)। কুণ্ডের ভিতর আর একটি চক্র। ইহার নাম পুষ্প-চ্ছটা Corolla। ইহার অংশ গুলির নাম 'দল' (Petal)। ইহার অভ্যন্তরে আর একটি চক্র। এই চক্রটি কয়েকটি দীর্ঘ সূত্রবৎ পদার্থের সমষ্টি। ইহার নাম পুংকেশর (Andrœcium)। সকলের মধ্যস্থ চক্রটি গর্ভকেশর (Pistil)। অতঃপর এক একটি চক্রের সবিশেষ পরিচয় প্রয়োজন।

(১) কুণ্ড—পুষ্পকুণ্ডের পলগুলি পরস্পর সংযুক্ত বা পরস্পর বিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যে ফুল লইয়া আমরা পরীক্ষা করিতেছি, তাহার পলগুলি সংযুক্ত (Gamosepalous)। বিযুক্ত-পল (Polysepalous) ফুলের দৃষ্টান্ত, গোলাপ, জবা ইত্যাদি। পুষ্পকুণ্ড প্রায়ই সবুজবর্ণ কোন কোন পুষ্পে অন্য বর্ণও দেখা যায়,

যথা দাড়িম্বপুষ্প। অনেক সময়ে 'দল' ও 'পল' বর্ণে আকারে ও আয়তনে একরূপ হয়। চাঁপা ফুলে ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কুণ্ডের উদ্দেশ্য ফুলের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে মুকুলাবস্থায় বহিরুৎপাত হইতে রক্ষা করা, এইজন্য এই চক্রকে আবরণী চক্র বলে (Protective whorl)। প্রায়ই ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ড ঝড়িয়া পড়ে। কোন কোন ফুলে, কুণ্ড ফলের সঙ্গে থাকিয়া যায়। যথা দাড়িম্ব, তাল, নারিকেল, চাল্‌তা ইত্যাদি। এইরূপ কুণ্ডকে স্থায়ী কুণ্ড কহে (Persistent calyx)। শিয়ালকাঁটা ফুলে ছটার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ড ঝরিয়া পড়ে। এইরূপ কুণ্ডের নাম Caducous calyx। চাল্‌তায় কুণ্ডের পল-গুলি ফলাংশকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখে। চাল্‌তার এই কুণ্ডপলগুলিই আমাদের খাদ্য।

(২) পুষ্প-ছটা—ছটার দলগুলিও পরস্পর সংযুক্ত বা বিযুক্ত হয়। গোলাপে পরস্পর বিযুক্ত। ধুতুরায় সংযুক্ত। দলগুলি নানাবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত, পীত, রক্ত ও নীল এই কয়টি প্রধান। অপেক্ষাকৃত উন্নত-জাতীয় উদ্ভিদে শ্বেত, রক্ত ও নীলবর্ণই বেশী দেখা যায়। এই সকল বর্ণের মনুষ্যের নয়ন রঞ্জন করা ছাড়া একটা মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। ভবিষ্যতে ইহার সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হইবে। এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখি, পুষ্পছটা কীটপতঙ্গাদি দ্বারা পুষ্পের সম্মিলনকার্য্য সাধিত করিবার জন্য সহায়তা করে। কীটপতঙ্গাদি বর্ণের উজ্জলতায় মুগ্ধ হইয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করে। এইজন্য এই চক্রের নামান্তর আকর্ষণী চক্র (Attractive whorl)। পুষ্পের কার্য্য বীজ সৃজন। এই বীজ সৃজন ব্যাপার পুংকেশর ও গর্ভকেশরই সাক্ষাৎ সংস্রবে সম্বদ্ধ। আবরণী চক্র ও আকর্ষণী চক্র পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। সুতরাং পুংকেশর ও গর্ভ-কেশরই ফুলের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এই দুই অঙ্গের অস্তিত্বে পুষ্পের পুষ্পত্ব। অনেক পুষ্পে আবরণী চক্র বা আকর্ষণী চক্র থাকে না। কাহাদের থাকে না পরে আলোচনা করা যাইবে।

(৩) পুংকেশরগুচ্ছ—আলোচ্য পুষ্পটি পরীক্ষা করিলে কতকগুলি সূত্রবৎ পদার্থ গুচ্ছাকারে গর্ভকেশরের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে সজ্জিত দেখা যাইবে। এই সমষ্টির নাম পুংকেশরগুচ্ছ (Andrœcium); ইহার প্রত্যেকে এক একটি পুংকেশর (Stamen)। পুংকেশরটি আবার সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি দণ্ড, আর একটি পরাগ-কোষ। পরাগ-কোষটি কেশরদণ্ডের অগ্র-ভাগে সংযুক্ত। এই পরাগকোষে প্রচুর পরিমাণে পরাগচূর্ণ উৎপন্ন হয়। কেশর দণ্ড-গুলি প্রয়োজনানুসারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ, ক্ষীণ বা স্থূল হইয়া থাকে। পুংকেশরগুলির সজ্জার আরো একটু বৈচিত্র দেখা যায়। কখনো বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে, কখনো বা সংযুক্ত ভাবে, কখনো দুই বা ততোধিক গুচ্ছাকারে গর্ভ কেশরের চতুর্দ্দিকে বিরাজমান দেখা যায়।

গর্ভকেশর—সর্ব্বমধ্যস্থ অঙ্গটির নাম গর্ভকেশর। ইহার সচারাচর তিনটি অংশ। সর্ব্ব নিম্নস্থ অপেক্ষাকৃত স্থূল অংশটি গর্ভ (Ovary)। সর্ব্বোপরি গর্ভ-মুখ (Stigma)। উভয়কে সংযুক্ত করিয়া যে অংশ বর্ত্তমান

তাহাকে গর্ভনালী কহে (Style)। অনেক ফুলে গর্ভকেশরের গর্ভনালী থাকে না। চাঁপা ফুল, কচু ফুল, ইত্যাদি উহার দৃষ্টান্ত। পুষ্প-গর্ভ প্রায়ই এক বা ততোধিক কোষে (carple). গঠিত। বহু কোষযুক্ত গর্ভ এক বা ততোধিক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে এই সকল প্রকোষ্ঠে সাগুদানার মত একটি বা অনেক গুলি করিয়া ডিম্বৎ পদার্থ থাকে। ইহারাই কালক্রমে পরাগ-কোষাণুর সহিত মিলিত হইয়া বীজে পরিণত হয়। গর্ভ মুখটি গোলাকার, সময়ে সময়ে একাধিক ভাগে বিভক্ত। জবা ফুলের গর্ভমুখ দেখিলেই ইহার প্রকার বুঝা যাইবে। গর্ভমুখ একরূপ আঠার মত চট্‌চটে রসে সিক্ত হয়। এইরূপ হইলে বুঝিতে হইবে, ইহা পরাগ গ্রহণে সক্ষম হইয়াছে। পুষ্প-গর্ভে বীজ সঞ্চার হইলেই ইহা শুকাইয়া যায়। গর্ভনালীর অভ্যন্তর দিয়া একটি সূক্ষ্ম পথ গর্ভপ্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। ইহার ব্যবহার পরে বুঝা যাইবে।

পরাগ-সঞ্চার। অতঃপর পরাগ-সঞ্চার বা পুষ্পের সম্মিলন কিরূপে হয় দেখা যাউক। পুংকেশরের এমন একটা সময় আসে, যখন উহার শীর্ষস্থ পরাগকোষ ফাটিয়া উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে চুর্ণ-পরাগ ঝরিয়া পড়ে। ঠিক এই সময়ে যদি গর্ভমুখ পরিপক্ক হয় ও আঠা-বৎ পদার্থে সিক্ত থাকে তবেই পরাগ-চূর্ণ উহার উপরে পতিত হইয়া বীজ সঞ্চারে সহায়তা করিবে। পরাগ-সঞ্চার বা পুষ্পের সম্মিলন সাধারণতঃ দুই প্রকারে ঘটিয়া থাকে। প্রথম প্রকারের নাম স্বতঃ-সম্মিলন (Self-pollination); দ্বিতীয় প্রকার পরতঃ-সম্মিলন বা সঙ্কর-সম্মিলন (cross-pollination)। কোনও একটি পুষ্পের পুংকেশর হইতে তাহারই গর্ভকেশরমুখে পরাগ-সঞ্চার হইলে উহাকে স্বতঃ-সম্মিলন কহে। এক পুষ্পের পরাগ অন্য পুষ্পের গর্ভকেশর সংপৃষ্ঠ হইলে উহার নাম সঙ্কর-সম্মিলন। সঙ্কর-সম্মিলনই যেন উদ্ভিদরাজ্যে বংশ বিস্তারের জন্য প্রকৃষ্টতর পদ্ধতি বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। ইহার কারণ সঙ্কর-সম্মিলনজাত উদ্ভিদ সকল অধিকতর উন্নত, দীর্ঘজীবি এবং উৎকৃষ্ট-ফল-প্রসবী। স্বতঃ-সম্মিলনজাত বৃক্ষ সকল হীন, অল্পায়ু ও জীবনযুদ্ধে জয়হীন। এ বিষয়ে উদ্ভিদ-প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। মানবজাতির মধ্যে প্রায়ই হীন ও অসভ্য জাতিরাই সগোত্র বিবাহের পক্ষপাতী, উন্নত সভ্যজাতিরা পর-গোত্র বিবাহের পক্ষপাতী। ইহা জানিয়াই যেন উন্নত জাতীয় উদ্ভিদগণ সঙ্কর-সম্মিলনই পছন্দ করে। এবং ইহারই অনুষ্ঠানে দিবা-রাত্র যাবতীয় আয়োজন চলিতেছে। সঙ্কর-সম্মিলন যে সকল উদ্ভিদের মধ্যে নিবদ্ধ তাহা-দের পুষ্প-সজ্জা উহারই উপযোগী। এই সকল উদ্ভিদ সচারাচর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর উদ্ভিদে একই বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প ও পুংপুষ্প ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ত্ত-মান থাকে। লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, শসা এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্ভিদে এক বৃক্ষে স্ত্রীপুষ্প, অন্য বৃক্ষে পুংপুষ্প ফুটিয়া থাকে। তাল, পেঁপে, পিটুলি প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। তৃতীয় শ্রেণীর উদ্ভিদে একই বৃক্ষে উভলিঙ্গ পুষ্প দেখা যায়। ওল, কচু, ঘেঁটু প্রভৃতি এই জাতীয় উদ্ভিদ। ইহাদের ফুলে

স্ত্রী ও পুং চিহ্ন একত্র বর্ত্তমান থাকিলেও সঙ্কর-সম্মিলনের জন্য বড় সুন্দর ব্যবস্থা দেখা যায়। পুংকেশর ও গর্ভকেশর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিপক্ক হয়, কাজেই স্বতঃসম্মিলন ঘটিতেই পায় না। পরে এ কথা আরো বিশদভাবে আলোচিত হইবে, উপস্থিত, সঙ্কর-সম্মিলন কিরূপে সম্পন্ন হয় দেখা যাউক। এক পুষ্পের পরাগ অন্য পুষ্পে সঞ্চারিত হইলে, সঙ্কর-সম্মিলন ঘটে। ইহা আপনা আপনি ঘটা সম্ভব নহে, কাজেই অপরের সাহায্য প্রয়োজন। সচরাচর জল, বায়ু, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী প্রভৃতির দ্বারা ইহা সম্পন্ন হয়। কাহারা বায়ুর দ্বারা কাহারাই বা কীট পতঙ্গাদি দ্বারা সম্মিলিত হয়, তাহা তাহাদের শারীরিক ও প্রাকৃতিক আকার প্রকারে বুঝা যায়, কেননা, উহারা নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া নিজেদিগকে সেই সেই অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

বায়ুদ্বারা সম্মিলন। বায়ু যে সকল পুষ্পের সম্মিলন ঘটায় তাহাদের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। দেখিলেই চিনিতে পারা যায় যে, ইহারা বায়ু সহযোগে সম্মিলিত হয়। এই সকল পুষ্পের পুংকেশর সংখ্যায় অনেক, সুদীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও কোমল। ইহারা প্রচুর পরিমাণে পরাগ উৎপাদন করে। সামান্য বাতাসেই কেশরগুলি আন্দোলিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে পরাগ ত্যাগ করে। এই পরাগও ধূলিবৎ অতি সূক্ষ্ম। সহজেই বাতাসে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতে পারে। ইহাদের গর্ভকেশর পুষ্প-কুণ্ড হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত, গর্ভমুখ পালকের মত বহু কেশযুক্ত। উদ্দেশ্য, বায়ু হইতে যতটা সম্ভব পরাগ আহরণ। এই সকল পুষ্প (স্ত্রী ও পুং উভয়ই) হয় একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় দেখা যায়, নচেৎ ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষে অবস্থিত থাকে। যে বৃক্ষে এক শাখায় স্ত্রী-পুষ্প ও অন্য শাখায় পুং-পুষ্প তথায় স্ত্রী পুষ্পগণ বৃক্ষের নিম্নভাগে অবস্থিত, ও পুংপুষ্পগুলি বৃক্ষের শীর্ষ-দেশে অবস্থিত। স্ত্রীপুষ্পের গর্ভকেশর ঊর্দ্ধমুখে ও পুংপুষ্পের পরাগকেশর অধোমুখে অবস্থান করে। উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। বায়ুর দ্বারা যে সকল পুষ্পের সম্মিলন হয়, তাহারা প্রায়ই বহু সংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া একটি দীর্ঘ স্থূলদণ্ডে সজ্জিত থাকে। তাল, নারিকেল, খেজুর, পেঁপে, পিটুলি, ধান, যব, বার্লি, ভুট্টা এবং নানাপ্রকার ঘাস, ইহাদের বায়ুযোগে পরাগ সঞ্চার হয়। প্রায়ই বেশীভাগ বৃহৎ ও উচ্চ বৃক্ষদিগের মধ্যেই বায়ুযোগে পুষ্পসম্মিলন ঘটিয়া থাকে। ঘাস সম্বন্ধে কথা এই যে, উহা প্রায়ই প্রান্তর বা মাঠে জন্মায়। এরূপ মুক্ত স্থানে বাতাসের অবাধ গতি, কাজেই বাতাসের সাহায্যেই ইহাদের মধ্যে পরাগ সঞ্চার বেশী সুবিধাজনক।

বায়ুযোগে পরাগ-সঞ্চার অপেক্ষা কীট-পতঙ্গাদিদ্বারা পরাগ-সঞ্চার অধিকতর মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার। ইহার জন্য উদ্ভিদগণ যে সকল উপায় অবলম্বন করে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে সকল আয়োজন, ব্যবস্থা ও কৌশল পর্য্যালোচনা করিলে উদ্ভিদগণকে আর চেতনাহীন জড় পদার্থ বলিয়া মনে হয় না। বংশবিস্তারের জন্য উদ্ভিদগণ কীটপতঙ্গাদির নিকট কত ঋণী তাহা তাহারা জানে, জানে বলিয়াই তাহাদিগকে কীটপতঙ্গাদিগণকে প্রলুব্ধ করিবার

জন্য অশেষ প্রকার আয়োজন করিতে হইয়াছে। সংসারে কেহ কাহারও বেগার খাটিতে চাহে না। মানুষই চাহে না, তার আবার কীট-পতঙ্গ। কাজেই উদ্ভিদগণ উহাদিগকে পরি-শ্রমের মূল্যস্বরূপ মধু বিতরণ করে। কিন্তু তাহাদের যে মধু আছে কীটপতঙ্গাদি কিরূপে জানিবে? এই জন্যই উদ্ভিদেরা নিজেদের ফুলগুলিকে উজ্জ্বলবর্ণে ও মনোহর গন্ধে বিভূষিত করিয়া তুলে। উজ্জ্বলবর্ণে কীট-পতঙ্গেরা মুগ্ধ হইয়া দূর হইতে 'পরিমললোভে' ছুটিয়া আসিয়া জুটিয়া পড়ে। যাহাদের বর্ণোজ্জ্বলতা কম তাহাদের গন্ধ বেশী তীব্র। এ সকল পুষ্প প্রায়ই আয়তনে বড় হয়। যদি ছোট হয়, তবে অনেকগুলি দলবদ্ধ হইয়া এক সঙ্গে থাকে। অনেক ফুল (যথা ওলফুল) রাত্রিতে ফুটিয়া থাকে। উহাদের বর্ণোজ্জ্বলতা নাই, থাকিবার কোন প্রয়োজনীয়তাও নাই। কাজেই রাত্রিচর কীটপতঙ্গাদি উহাদের তীব্র গন্ধ ধরিয়া ছুটিয়া আসে। এক এক প্রকার ফুল এক এক জাতীয় কীটাদিদ্বারা পরাগপৃক্ত হয়; এই জন্য সেই সকল ফুল নিজেদিগকে সেই সেই কীটাদির স্বভাব-প্রকার অনুসারে গঠিত করিয়া তুলে। পাছে অন্যান্য অপহারক কীটপতঙ্গ তাহাদের মধু নষ্ট করিয়া ফেলে, এই জন্য নিজেদের গঠন এমনি রূপান্তরিত করিয়া তুলিয়াছে যে, যে সকল কীটপতঙ্গ তাহাদের সম্মিলন ঘটায় তাহারা ছাড়া আর কোন আগন্তুক কীটাদি তাহাদের মধু গ্রহণ করিতেই পারে না। যে সব ফুলে প্রজাপতি পরাগ-সঞ্চার করে তাহারা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ফুটে। মক্ষিকাদি যে সকল ফুলে পরাগ-সঞ্চার করে তাহাদের আকার নলের মত ও মুখ নিম্নদিকে বক্রভাবে শায়িত। বক, সিম, শুঁটী প্রভৃতির ফুল পরীক্ষা করিলে ইহা বুঝা যাইবে যে সকল পুষ্পের ছটার নিম্নভাগ নলাকার ও অতি অপ্রশস্ত ও ক্ষুদ্র, তাহাদের পিপীলিকা ও একজাতীয় অতি ক্ষুদ্র কীটের সাহায্যে পরাগ সঞ্চার হয়। শিউলি, কুন্দ, টগর, করবী ইত্যাদি এই জাতীয় ফুল। অনেক বড় বা ছোট ফুলের পাপড়িতে নানা বর্ণের বিন্দু রেখাকারে লম্বভাবে সজ্জিত দেখা যায়। ইহাদের উদ্দেশ্যটি বড় কৌশলপূর্ণ। এই রেখাগুলি মক্ষিকাদিকে ফুলের অন্তর্নিহিত মধুস্থলীর অভিমুখে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়।

অতঃপর যে সকল উদ্ভিদে উভলিঙ্গ পুষ্প বিদ্যমান অথচ সঙ্কর-সম্মিলন হয়, তাহাদের কথা আলোচনা করা যাউক।

এই জাতীয় পুষ্পে স্বতঃ-সম্মিলনে বাধা দিবার কয়েকটি আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বিত হয়। করবী, টগর, বিলাতী Primrose প্রভৃতি পুষ্পে দেখা যায়, কোন ফুলে পুং-কেশর দীর্ঘ ও স্ত্রীকেশর হ্রস্ব, আবার অন্য ফুলে ঠিক ইহার বিপরীত। যে ফুলে পুং-কেশর হ্রস্ব তাহা হইতে পরাগ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গর্ভকেশরে পড়িতে পারে না, আবার যে ফুলে গর্ভকেশর হ্রস্ব ও পুংকেশর দীর্ঘ, তাহার পুংকেশর অগ্রে পরিপক্ক হয়, গর্ভকেশর পরে। এরূপ স্থলে দীর্ঘ পুংকেশরযুক্ত ফুল হইতে দীর্ঘ স্ত্রীকেশরযুক্ত ফুলে কীটাদি দ্বারা পরাগ সঞ্চারিত হয়।

এমন উদ্ভিদ আছে, যাহাদের স্ত্রী ও পুং-কেশর উভয়ই দৈর্ঘ্যে সমান হইলেও, হয় পুং-কেশর অগ্রে পরিপক্ক হয়, না হয় স্ত্রীকেশর অগ্রে গর্ভধারণযোগ্য হয়। এরূপ ক্ষেত্রে

স্বতঃসম্মিলন কদাপি সম্ভব নহে,পরন্তঃ সম্মিলন ব্যতীত উহাদের উপায়ান্তর নাই। বাকস, তুলসী, কুলেখাড়া প্রভৃতি ফুলে পুংকেশর অগ্রে পক্কতালাভ করে। কচু, ওল, রাংচিতা প্রভৃতি ফুলে গর্ভকেশর অগ্রে পরিপক্ক হয়।

বর্ষাকালে কচুফুল প্রচুর দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই কচুফুলের সঙ্কর-সম্মিলন ব্যাপার অতীব কৌতুহলোদ্দীপক। কচুফুলে একটা লাল রঙ্গের ডাঁটা দেখা যায়, উহার অধোভাগে অসংখ্য গর্ভকেশর,শিরোভাগে তেমনি অসংখ্য পুংকেশর। উভয়ের মধ্যভাগে এক প্রকার ছোট ছোট সূক্ষ্মমুখ পদার্থ থাকে। কচুফুলে গর্ভকেশর অগ্রে পক্ক হয়। পিপীলিকারা, মধুলোভে ডাঁটাটি বাহিয়া গর্ভকেশরগুলির মধ্যে গিয়া পড়ে। তথা হইতে মধু লইয়া পলাইতে পারে না, মধ্যস্থ সূক্ষ্মমুখ কাঁটা-গুলিতে বিদ্ধ হইয়া অধোভাগেই বদ্ধ থাকে। তার পর যখন পুংকেশর পাকে তখন কাঁটা-গুলি শুকাইয়া যায়, পিপীলিকারাও তখন পলাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু ফুলত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই সর্ব্বাঙ্গে পরাগ মাখিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এইরূপ পরাগাচ্ছন্ন দেহে আবার অন্য এক ফুলে মধুলোভে গিয়া উপস্থিত হয়; এবং উহার গর্ভকেশরগুলি পরাগপৃক্ত করিয়া দেয়।

শিমূলের ফুল আকারে বড়, শক্ত ও দৃঢ় বৃন্তের দ্বারা বৃক্ষশাখায় সংযুক্ত। কাক,শালিখ, কাঠবিড়াল দ্বারা ইহাদের পরাগ সঞ্চার হয়। ইহাদের বর্ণবৈভব এমনি অধিক যে গন্ধের কোন প্রয়োজন নাই, অথচ Economy বজায় রাখিতে গিয়া অভাগা শিমূল মানুষের কাব্যসাহিত্যে গুণহীনতার একটা মস্ত উদা-হরণ হইয়া আছে। কবিরা বলেন, "শিমূলের ফুল যেন বিহীন সৌরভ"!

পাটা নামক একরূপ জলজ উদ্ভিদে জলের সাহায্যে পরাগ সঞ্চার হয়। ইহাদের স্ত্রী ও পুংপুষ্প ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদে বর্ত্তমান। সাধা-রণতঃ উহারা জলের নীচে থাকে। উভয়েই যখন পরিপক্ক হয়, তখন এক সুন্দর কৌশল সাহায্যে জলের উপর ভাসিয়া উঠে। ঠিক এই সময়ে পুংপুষ্প পরাগ নিষেক করে ও স্ত্রী-পুষ্প উহা ধরিয়া লয়। মিলনান্তে উভয়েই আবার জলমগ্ন হয়। ফুলের সম্মিলন বা বিবাহ যথাসাধ্য আলোচিত হইল বারান্তরে বীজসঞ্চার ও বীজক্ষেপ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রণবের এইরূপ বহু মাহাত্ম্য আছে বলিয়াই সেই প্রণব জপকারী দ্বিজদিগের সহিত এক বংশধর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া অনধিকারীও প্রণব জপ করিতে চায়। তাহারা বলে ব্রাহ্মণেরা কেবল স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিত্বক্রমে, দ্বিজেতর জাতিকে ঐ অধিকার দেন নাই। তাহারা বেদ মানিতে আপত্তি করে না, কিন্তু বেদের নিষেধ বাক্য মানিতে চায় না। ইহাতেই সহৃদয়গণ বুঝিবেন তাহারা বেদ কতদূর মানে। তাহাদিগকে প্রণব জপাধিকার না দেওয়া হইলেও তাহাদের প্রতি যে যে কর্ত্তব্যের ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহাই না সম্পন্ন করে কৈ ? স্ব স্ব জাতিধর্ম্মোক্ত কর্ত্তব্য পালন করে না, কিন্তু যাহা তাহাদের অকর্ত্তব্য তাহাই করিতে চায়। তাহাদের এই জেদকে খোকার আব্দারের মত বলা যাইতে পারে। খোকার রোগ হইলে তাহাকে সুপথ্য খাইতে দেও সে তাহা খাইবে না, যাহা তাহার পথ্য নয় তাহাই খাইতে চাইবে, না খাইতে দিলে কাঁদিয়া গলা ভাঙ্গিবে। শূদ্রদিগের যে বেদাধ্যয়ন, প্রণব জপ প্রভৃতি বিষয়ে বৈজিক সামর্থ্য নাই, ইহা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উপনিষদেও শূদ্রের প্রণব জপাধিকার না থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রী শূদ্রায় নেচ্ছন্তি। সাবিত্রীং প্রণবং যজুঃ লক্ষ্মীং যদি জানীয়াৎ স্ত্রী শূদ্রো স মৃতোধো গচ্ছতি। তস্মাৎ সর্ব্বথানাচষ্টে। যদ্যাচষ্টে স আচার্য্য স্তে নৈব মৃতোধোগচ্ছতি। (নৃসিংহতাপন্যুপনিষৎ।)

অনুবাদ। সাবিত্রী, প্রণব, যজুর্মন্ত্র ও লক্ষ্মীমন্ত্র স্ত্রী শূদ্র শিক্ষা করে, বা উচ্চারণ করে ইহা উপনিষদের অভিপ্রায় নহে। দ্বিজাতিদিগের মধ্যেও যাহারা স্ত্রীলোক তাহাদের উক্ত মন্ত্র সকলের অধিকার নাই। শূদ্রজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ কেহই ঐ সকল মন্ত্রোচ্চারণ করিবে না। স্ত্রী ও শূদ্র যদি উল্লিখিত সাবিত্রী প্রভৃতি মন্ত্র শিক্ষা করে, তাহা হইলে সে মরিয়া নরকে যায়। অতএব আচার্য্যগণ সর্ব্বপ্রকারেই ঐ মন্ত্র সকল স্ত্রী শূদ্রদিগকে বলেন না। যদি বলেন অর্থাৎ ঐ সকল মন্ত্রে দীক্ষা দেন, তবে সেই গুরুও মৃত হইয়া নরকে গমন করে।

অতএব দ্বিজাতিসাধকদিগের মন্ত্র প্রণব ও শূদ্রদিগের সাধনোপযোগিনী দীক্ষা অনুসারে অপর মন্ত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে। যুগভেদে দ্বিজাতি স্ত্রীদিগেরও ব্রহ্মাধ্যয়ন ও উপবীতধারণ প্রভৃতি বিধান ছিল, ইহা শাস্ত্রান্তরে প্রমাণ পাওয়া যায়। শূদ্রদিগকে অপর মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হইলেও ঐ সকল মন্ত্র প্রণবের অর্থই প্রতি

পাদন করে। যখন জগতে প্রণব ছাড়া কোনই মন্ত্র নাই, তখন ঐ সকল মন্ত্রকেও প্রণবের রূপান্তর বলা যাইতে পারে। যাহা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা যায় তাহাই প্রণব শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। সমস্ত মন্ত্রদ্বারাই যখন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তখন স্ত্রী শূদ্রের প্রণবাধিকার নাই বলিয়া দুঃখিত হইবার কারণ নাই। সাধকগণ এইরূপে তাহাদের জপ্যমন্ত্র স্থির করিয়া যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে।

আসনং পদ্মকং বদ্ধা
যদ্‌চান্যদ্বাপিরোচ তে।
কুর্য্যান্নাসাগ্রদৃষ্টিঞ্চ
হস্তৌপাদৌ চ সংযতৌ॥
মনঃ সর্ব্বত্র সংযম্য
ওঙ্কারং তত্র চিন্তয়েৎ।
ধ্যায়েত সততং প্রাজ্ঞো
হৃৎকৃত্বা পরমেষ্ঠিনম্॥
(যোগশিখোপনিষৎ।)

অনুবাদ।—অনন্তর পদ্মাসন অথবা আপন ইচ্ছানুসারে সিদ্ধাদি অন্য কোন আসন বদ্ধ করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় সংযত করিয়া অর্থাৎ বিষয় হইতে চিত্তকে সমাকর্ষণপূর্ব্বক ওঙ্কার চিন্তা করিবে। অনন্তর হৃদয়মধ্যে কমলাসনকে ধ্যান করিবে।

যোগের প্রথাভ্যাসকালে কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। অভ্যাসের স্থিরতা হইলে আর তাদৃক্ নিয়ম গ্রহণ করিতে হয় না। যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তীকে অল্পে অল্পে সেবা করিয়া বশীভূত করিতে হয়, সেইরূপ ক্রমশঃ যোগাভ্যাসদ্বারা সেবিত বায়ু সাধকের বশ্য হন, তাহার অন্যথা হইলে সাধককে বিনাশ করেন। প্রথমাভ্যাসকালে যোগীদিগের যে যে বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়, উপনিষদাদিশাস্ত্র তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপদেশ দান করেন।

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ সাহসাৎ
জনসঙ্গ পরিত্যাগাৎ ষড়ভির্যোগে হিসিদ্ধ্যতি।
(যোগোপনিষৎ।)

অনুবাদ। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্ত্বজ্ঞান, সাহস ও জনসঙ্গপরিত্যাগ এই ছয় কর্ম্ম হইতে যোগসিদ্ধ হয়।

অত্যাহারঃ প্রবাসশ্চ
প্রজল্পো নিয়মগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ-
ষড়ভির্যোগং প্রণশ্যতি॥
(যোগসারোপনিষৎ)।

অনুবাদ। অতিশয় আহার, প্রবাস, ইতরালাপ, বেদোক্ত স্বাধ্যায় ও শ্রাদ্ধকৃত্যাদির নিয়ম গ্রহণ, জনতা বা জনাকীর্ণস্থানে অবস্থান ও চিত্তচাঞ্চল্য এই কয়টি কর্ম্মদ্বারা যোগনাশ হয়।

যোগের প্রথমাবস্থায় অল্প ও লঘু ভোজন করিবে। দুগ্ধ ও ঘৃত ভোজন প্রশস্ত। অত্যন্ত শীতল ভোজ্য পাইলে তাহা উষ্ণ না করিয়া ভোজন করিবে না। অতিশয় লবনাক্ত, পচা, দধি, তক্র, পলাণ্ডু, মাংস, মদ্য, শাক, হিঙ্গু, এগুলি আহার করিবে না। অগ্নির উত্তাপ লাগাইবে না। স্ত্রী সহবাস করিবে না। নাস্তিকের সভা পরিত্যাগ করিবে। কথা বলিতে হইলে অনর্থ বাক্যও বলিতে হয়, সাধনারও ব্যাঘাত হয়, অতএব যতদূর সম্ভব মৌনভাবে থাকিবে। জনসঙ্গ হইতে দূরে থাকিলে কথা বলার আবশ্যকও হয় না। চিত্ত

সহসা চঞ্চল হইবার উপক্রম হইলে ধ্যেয় বস্তুর দিকে মনোনিবেশ করিয়া চাঞ্চল্য ভাবকে দূরীভূত করিবে।

সাধারণতঃ উল্লিখিত প্রকারে যোগসিদ্ধির কারণ ও যোগসিদ্ধির অন্তরায়গুলি জানিয়া ও সদ্‌গুরুর নিকটে থাকিয়া ষড়ঙ্গযোগ অভ্যাস করিবে।

প্রত্যাহারস্তথাধ্যানং
প্রাণায়ামোথধারণা-
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ
ষড়ঙ্গোযোগ উচ্যতে।
(অমৃতবিন্দূপনিষৎ।)

অনুবাদ। প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রণায়াম, ধারণা, তর্ক ও সমাধি এই ষড়ঙ্গকে যোগ কহে।

সর্ব্ববিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের আকর্ষণের নাম প্রত্যাহার। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যে রূপাদির প্রতি ধাবিত হয় বা আসক্তিলাভ করে, তাহাদিগের সেই গতিগুলিকে ফিরাইয়া আনার নাম প্রত্যাহার। চক্ষু যখন রূপের উপর পতিত হয়, তখন তাহাকে রূপ হইতে উঠাইয়া লইয়া রূপ রহিত করিয়া মনের নিকটে অর্পণ করিতে হইবে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও তাহাদের স্ব স্ব বিষয়কে মনের নিকটে লইতে দিবে না; অর্থাৎ চক্ষু যাহাতে মনের নিকটে রূপ অর্পণ না করিতে পারে, কর্ণ যাহাতে মনের নিকটে শব্দ অর্পণ না করিতে পারে, ইত্যাদি প্রকারে ইন্দ্রিয় বিষয় সকলকে মনের নিকটে উপস্থিত হইতে দিবে না। বিষয় ও ইন্দ্রিয় সকলকে পরমাত্মারূপে ভাবিতে পারিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

শব্দাদিবিষয়াঃ পঞ্চ-
মনশ্চৈবাতি চঞ্চলম্।
চিন্তয়েদাত্মনো রশ্মীন্
প্রত্যাহারঃ স উচ্যতি॥
(অমৃতবিন্দূপনিষৎ।)

অনুবাদ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ পদার্থকে বিষয় বলে। সেই পঞ্চ বিষয়োপলক্ষিত কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চইন্দ্রিয় এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়-ব্যাপী মনঃ এই সকল আত্মরূপ সূর্য্যের রশ্মী স্বরূপ। এইরূপ চিন্তা করাকে প্রত্যাহার বলে।

প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গ অভ্যাস করা বড় কঠিন। এ বিষয়ে পাতঞ্জলদর্শনে এই-রূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অস্ত্রধারী কোন রাজা ভৃত্যের হস্তে একটি তৈলপূর্ণ শরাব দিয়া যদি বলেন যে, তুমি এই তৈলপূর্ণ শরাব হস্তে করিয়া দৌড়িয়া যাও। কিন্তু সাবধান, যেন তৈল না পড়িয়া যায়। আমি তোমার পশ্চাৎ আসিতেছি। যদি তৈল পড়িয়া যায় তাহা হইলে তোমার শিরচ্ছেদ করিব। এরূপ স্থলে ভৃত্যের যেরূপ চিত্ত দৃঢ় করা আবশ্যক, যেরূপ অঙ্গ সংযমের আবশ্যক, প্রত্যাহার অভ্যাস কালেও ঐরূপ দৃঢ়চিত্ততার সহিত সঞ্চালনা করা আবশ্যক। প্রত্যাহার ভাল রূপে অভ্যাস হইলে ধ্যান প্রাণায়াম ও ধারণা অভ্যাস করিতে কোনই কষ্ট হয় না।

ধ্যৈ ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া ধ্যান পদটি হইয়াছে। ধ্যৈ ধাতুর অর্থ চিন্তা করা। যে চিন্তা কোন এক ধ্যেয় বস্তুতে নিশ্চল হয়, তাহাকে ধ্যান কহে। এই ধ্যান দ্বিবিধ,

সগুণ ও নিগুণ। মন্ত্রাদিপূর্ব্বক যে চিন্তা তাহাকে সগুণ ধ্যান বলে। মন্ত্রাদি ভিন্ন যে ধ্যান করা যায় তাহাকে নিগুণ ধ্যান কহে। বস্ত্র পরিষ্কার করিতে হইলে যেমন পূর্ব্বে প্রক্ষালন করিয়া তাহার নিবিড়তা নষ্ট করিতে হয়, পরে অগ্নি সংযোগে উত্তাপ প্রদানপূর্ব্বক নামাইয়া আছড়াইতে হয় ও এই উপায়ে বস্ত্রমল দূরে যায়, তেমনি প্রথমে ক্রিয়াযোগ বিশেষ দ্বারা চিত্ত ক্লেশের নিবিড়তা যাইলে ধ্যান দ্বারা উহার উন্মূলন করিতে হয়। ধ্যান-যোগে পাপ, তাপ, দুঃখ কিছুই থাকে না।

যদি শৈল সমং পাপং
বিস্তীর্ণং যোজনান্‌বহূন্‌।
ভিদ্যতে ধ্যান যোগেন
নান্যোভেদঃ কথঞ্চন॥

(ধ্যানবিন্দূপনিষৎ।)

অনুবাদ। যদি বহুযোজন বিস্তীর্ণ শৈলসম পাপ সঞ্চিত থাকে, তাহাও ধ্যান যোগদ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। ধ্যানযোগ হইতে পাপনাশক আর নাই।

"পরমাত্মা বাক্য মনের অগোচর, অতএব তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। কি ধ্যান করিব, কিরূপে তাঁহাকে ভাবিব" এইরূপ মনে করিয়া ধ্যানযোগের উপযোগিতা নাই মনে করিবে না। মনুষ্য যতদূর জ্ঞান ও যতদূর ক্ষমতা পাইয়াছে, তাহা দ্বারাই তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করিবে। যদি কেহ নিরাকার পরমাত্মাতে লক্ষ্য স্থির করিতে না পারেন তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ দেন যে ঐরূপ ব্যক্তি প্রথমে পৃথিবী চিন্তা, পরে জল চিন্তা, তদনন্তর তেজঃ বায়ু ও আকাশের চিন্তা করিবে। পরে মনঃ বুদ্ধি ও জীবাত্মাকে ক্রমশঃ ভাবনা করিতে অভ্যাস করিয়া প্রকৃতিকে চিন্তা করিবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের যে শক্তি সৃষ্টি কার্য্য করিয়া থাকেন তাহাই চিন্তা করিবে। শেষে প্রকৃতির অতীত পরমাত্মাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইবে। এই উপায়েও যদি ধ্যান করা কঠিন হয়, তবে সাধকদিগের হিতার্থে ভগবানের যে যে রূপ কল্পনা হইয়াছে, সেই সেই রূপের মধ্যে যে রূপকে প্রিয় বোধ করিবে সেই রূপ চিন্তা করিতে থাকিবে। শেষে রূপ চিন্তা অপগতা হইয়া নিরূপের চিন্তাই মনে আসিয়া জুটিবে।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে
বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলং।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং
জ্যোতিস্তদ্‌ যদাত্মবিদোবিদুঃ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ।

অনুবাদ। হৃদয়ের অভ্যন্তরে বুদ্ধিবিজ্ঞান প্রকাশ পরমকোষ মধ্যে অবিদ্যাদি অশেষ রজোমল বর্জ্জিত, নিরবয়ব শুদ্ধ এবং সর্ব্ব প্রকাশক সূর্য্যাদি জ্যোতি পদার্থেরও জ্যোতিঃ স্বরূপ যে পরমব্রহ্ম আছেন, আত্মবিৎ পণ্ডিতে-রাই তাঁহাকে জানেন।

প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা ধ্যানে দৃঢ়তা জন্মে। প্রাণের আয়াম অর্থাৎ হৃদয়স্থ বায়ু সকলকে সংযত বা ইচ্ছাধীন করার নাম প্রাণায়াম। প্রাণবায়ুর যে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস হইতেছে, সেই স্বাভাবিক ভাবের চলন রহিত করিয়া অন্য এক নূতন ভাবের অধীন করার নামই প্রাণায়াম। উহার তিন প্রকার বৃত্তি আছে; বাহ্যবৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি। শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাহা বাহ্যিক স্থাপন করার নাম বাহ্যবৃত্তি, ইহার নাম রেচক। বাহিরের

বায়ু আকর্ষণ করিয়া শরীরের মধ্যে পূর্ণ করিয়া দেওয়ার নাম পূরক, ইহাই অভ্যন্তরবৃত্তি। রেচক ও পূরক কিছুই না করিয়া বায়ুরাশিকে অভ্যন্তরে রুদ্ধ করিয়া রাখার নাম স্তম্ভবৃত্তি। এই স্তম্ভবৃত্তিরই নামান্তর কুম্ভক। কুম্ভমধ্যে জলপূর্ণ থাকিলে তাহা যেমন পড়ে না, সেইরূপ শরীরেও বায়ুপূর্ণ থাকিলে নিশ্চল হয়, আর পড়ে না। প্রণব ও গায়ত্রী জপ সহকারে এই রেচক পূরক ও কুম্ভক নামক বৃত্তিত্রয়ান্বিত প্রাণায়াম করিতে হয়।

সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং
গায়ত্রীং শিরসাসহ।
ত্রিপঠেদায়তপ্রাণাঃ
প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥

(অমৃতবিন্দূপনিষৎ।)

অনুবাদ। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত ব্যাহৃতি ও গায়ত্রীতে প্রণব যুক্ত করিয়া জপ করিবে ও জপকালে প্রাণবায়ু সকলের সংযমন করিবে, ইহাকেই প্রাণায়াম কহে।

প্রাণায়াম বা প্রাণবায়ুর নিরোধকার্য্য অনেক প্রকারে সম্পন্ন হয়। ওঙ্কারের সুদীর্ঘ উচ্চারণের অবসানে ঐ শব্দের স্বরূপত্ব অনুভব হয়, তৎকালে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, তাহাতেও প্রাণনিরোধ হয়। যোগী জিহ্বাদ্বারা যে তালুমূলে অবস্থিত ঘটিকাকৃতি মাংসপিণ্ডকে আক্রমণ করিয়া প্রাণকে ব্রহ্ম-রন্ধ্রে স্থাপন করেন তাহাতেও প্রাণ নিরোধ হয়। অভ্যাসবশতঃ নাসিকার অগ্রাবধি দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত বাহ্যাকাশে চক্ষু ও মনের বিশ্রাম হইয়াও প্রাণনিরোধ হইয়া থাকে। অভ্যাসবলে ঊর্দ্ধরন্ধ্রদ্বারা তালুর ঊর্দ্ধস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণকে অবস্থাপিত করিলে যে প্রাণের বাহ্য সম্পর্ক রহিত হয়, তাহাতেও প্রাণ নিরোধ হয়। এইরূপ বহু প্রকার প্রাণায়ামের বিষয় যোগশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্রাণায়ামদ্বারা যোগীর সর্ব্বরোগ ক্ষয় হয়। কিন্তু অযুক্ত অভ্যাস করিলে সেই যোগদ্বারা হিক্কা, শ্বাস, কাশ, শিরোবেদনা, কর্ণবেদনা, চক্ষুর বেদনা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার রোগ জন্মে। অল্প অল্প অভ্যাস করিয়া চলিলে ও সাধ্যাতীতভাবে অনুষ্ঠান না করিলে প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

ধারণা অভ্যাস করিলে ধ্যান ও প্রাণায়াম যোগাঙ্গের দৃঢ়তা সম্পন্ন হয়। অদ্বিতীয় পরমাত্মা সম্বন্ধে অন্তরিন্দ্রিয়ে ধারণক্ষমতার নাম ধারণা। প্রকৃত কথা, মনকে কোন বিষয়-চিন্তায় বিচলিত হইতে না দিয়া কেবল ব্রহ্ম-বিষয়ে সমাধান করার নাম ধারণা।

মনঃসংকল্পিকং ধ্যাত্বা
সংক্ষিপ্যাত্মনিবুদ্ধিমান্,
ধারয়িত্বাতথাত্মানং
ধারণা পরিকীর্ত্তিতা।

(অমৃতবিন্দূপনিষৎ।)

অনুবাদ। মনকে সংকল্পের কর্ত্তা বলিয়া ধ্যান করিয়া সেই মনকে বুদ্ধিতে অথবা প্রাণে নিক্ষেপ করিবে এবং মনঃ ও প্রাণকে ধারণ করিয়া রাখিবে। ইহাকেই ধারণা কহে।

ধারণা অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমতঃ ঈশ্বর বা আত্মপ্রীতিপ্রদ কোন বিষয় বিশেষে চিত্তকে নিবেশ রাখিবার চেষ্টা করিবে। চিত্তের অপরাপর বৃত্তিগুলির প্রসার বৃদ্ধি হইতে দিবে না। এইরূপ করিতে করিতে যখন অন্য চিন্তা আর হৃদয়ে স্থান পাইবে না, ইন্দ্রিয়বেগ

বাড়িতে পারিবে না, তখন ধ্যেয়বস্তুতে চিত্ত-স্থির করিয়া রাখিতে পারিলেই বুঝিতে হইবে ধারণা অভ্যাস হইয়াছে। ধ্যান করিতে করিতে সেই মনঃ যখন ধ্যেয় বস্তুময় হইয়া যাইবে অর্থাৎ আমি পরমাত্মাকে ধ্যান করিতেছি এইরূপ নিজের সহিত পরমাত্মার ভেদ-জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইবে তখনই বুঝিবে যে,ধারণা অভ্যাস দ্বারা সমাধিলাভের উপায় হইয়াছে। ধারণা অভ্যাস হইলে উহ নামক যোগাঙ্গদ্বারা অধ্যাত্মবিদ্যার প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয় করিবে।

যেমন রাজা কোন প্রকার সঙ্কটজনক কর্ম্ম উপস্থিত দেখিলে "ইহা সফল হইবে কি বিফল হইবে" ইহা বিচার দ্বারাই অবগত হন, তেমনি যোগীও তাঁহার অনুষ্ঠিত যোগাঙ্গগুলি সফল হইবে কি না তাহা বিচার করিয়া জ্ঞাত হইবেন। যোগমার্গানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া যোগাঙ্গ সকল কিরূপে সম্পন্ন হইতেছে, যোগ-সাধনা বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হওয়া গেল, যোগে ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিলাভ হওয়াতে অহঙ্কার আসিয়া চিত্ত অভিভূত করিতেছে কি না ইত্যাদি বিষয় যোগীগণ পর্য্যালোচনা করিবেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাকে শাস্ত্রযুক্তিসহকারে অধ্যাত্মবিদ্যার বিচার করিতে হইবে। ইত্যাদি প্রকারের যে বিচার বা তর্ক, তাহারই নামান্তর উহ।

আগমস্যাবিরোধেন
উহনং তর্কউচ্যতে।
(অমৃতবিন্দুপনিষৎ।)

অনুবাদ। আগমাবিরুদ্ধ উহনের নাম তর্ক। শাস্ত্র ও যুক্তির সহিত বিরোধ না ঘটে এইরূপ ভাবে তর্ক করিতে হইবে,অর্থাৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তির অনুগামী হইয়া পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইবে।

তর্ক বা বিচারের কত গুণ তাহা প্রকাশ করিয়া উঠা কঠিন। বিচার মানসসরোবরের প্রস্ফুটিত রাজীবস্বরূপ, স্বর্গপুরীর দ্বারস্বরূপ, কৈবল্যমহীরুহের অঙ্কুরস্বরূপ, সংসারবিজয়লক্ষণের পতাকাস্বরূপ। বিচার-চারু মানবগণকে জন্মান্তরের ভয় করিতে হয় না, গর্ভ্তাবাস হইবে ভাবিয়া আর রোদন করিতে হইবে না। "আমি কে? কি ছিলাম? আমার ত সংসারদোষ ছিল না? তবে আর এই সংসারদোষ কিরূপে আসিয়া জুটিল?" এইগুলি উপনিষদের প্রমাণে জানার নামই সাধারণতঃ তত্ত্ববোধ। মহামোহরূপ দুষ্টহস্তী হৃদয়পদ্মকে সর্ব্বদা বিদারণ করিতেছে, বিচার-সিংহ ভিন্ন তাহাকে দমন করিবার অন্য উপায় নাই। যেমন কৌমুদী জগৎকে শীতল ও অলঙ্কৃত করে, তাহার ন্যায় বিচারবতী বুদ্ধি (বিবেক) মানবদেহে সমুদিত হইয়া তাহাকে শীতল (তাপত্রয় বিনির্মুক্ত অথবা শান্ত) ও অলঙ্কৃত (সাধুচিত গুণযুক্ত) করে। উহদ্বারা প্রকৃত তত্ত্বপথ নির্ণীত হইলে আর কেহ পথ-ভ্রষ্ট হইয়া দুঃখগর্ত্তে পতিত হয় না। যতদিন মনুষ্য বিচার করিতে না শিখে,ততদিনই জগৎ-পদার্থ মনোহর দেখায়, বিচার করিতে শিখিলে সকলই অসার বোধ হয়।

উল্লিখিত উহ নামক যোগাঙ্গদ্বারা তত্ত্বচিন্তা বলবতী হইলে যোগীর আর কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না। "ইহা আমার বাঞ্ছিত, উহা আমার বাঞ্ছিত নহে" এইরূপ বিকল্পও থাকে না। ঐরূপ ইচ্ছাহীন বলিয়া আত্মা কিছুই করে না; সুতরাং ইচ্ছা, আসক্তি, প্রশ্ন কিছুই

থাকে না। সুমেরু পর্ব্বতের যেমন আর সুবর্ণের প্রয়োজন হয় না, তেমনি তাঁহার আর কোন উৎকৃষ্ট পদার্থের প্রয়োজন হয় না।

যংলব্ধাপ্যবমন্যেত
সমাধিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
(অমৃতবিন্দূপনিষৎ।)

অনুবাদ। যাহাকে লাভ করিলে অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে অবজ্ঞা জন্মে (কোন বিষয়ে স্পৃহা থাকে না) তাহাকে সমাধি কহে।

ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তি প্রবাহোঽহং কৃতিং বিনা
সম্প্রজ্ঞাত সমাধিঃ স্যাদ্ধ্যানাভ্যাস প্রকর্ষতঃ।
প্রশান্তবৃত্তিকং চিত্তং পরমানন্দ দায়কং
অসম্প্রজ্ঞাত নামায়ং সমাধি র্যোগিনঃ প্রিয়ঃ॥
(মুক্তিকোপনিষৎ।)

অনুবাদ। যথন অহঙ্কার বৃত্তি থাকে না, ব্রহ্মাকারে চিত্তের বৃত্তি হয়, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। ধ্যানাভ্যাসের প্রকর্ষতা দ্বারা উহা উৎপন্ন হয়। যথন চিত্তের সকল বৃত্তি প্রশান্তা হয়, সেই অবস্থার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহা যোগীদিগের প্রিয়।

সমাধিনামক যোগাঙ্গটি সকল যোগাঙ্গের সার এবং ইহার অভ্যাসেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হয় ও সমস্ত ধর্ম্মকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়, এইজন্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ সমাধিকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া তদুপলক্ষে সমস্ত ধর্ম্মকৃত্য রূপকভাবে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উন্নত পুষ্পফলসমন্বিত ঐ সমাধি বৃক্ষের ছায়ায় বসিতে পারিলে সকল শ্রম (সংসারিক কষ্ট) দূর হয়। ঐ বৃক্ষ বিবেকী মনুষ্যরূপ কাননের মধ্যেই উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত শুভকর্ম্মফলবশেই হউক, অথবা বিবিধ দোষ দেখিয়াই হউক, সংসারের প্রতি যে বিরাগ উপস্থিত হয়, তাহাই ঐ বৃক্ষের বীজ। মনুষ্যের চিত্তক্ষেত্রে ঐ বীজ শুভকর্ম্মরূপ হলদ্বারা কর্ষিত হইয়া উপ্ত হয়। ঐ বীজ পতিত হইলে অথির হইয়া (অর্থাৎ কামক্রোধাদির বেগ সহ্য করিয়া) উহাতে সৎসঙ্গ ও অধ্যাত্ম শাস্ত্রের চর্চ্চারূপ বারিসেক করিবেন। তপস্যাদি সৎকর্ম্ম করিলে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইবে। ঐ অঙ্কুর রক্ষা করিবার জন্য সন্তোষ ও তাহার বনিতা মুদিতাকে নিযুক্ত করিবে ও তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবে যেন কামক্রোধাদি বিহঙ্গমকুল আসিয়া ঐ অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া না ফেলে; তজ্জন্য ঐ পক্ষীদিগকে দূরে দেখিলেই তাড়াইয়া দিবে। প্রাণায়ামাদি-সৎক্রিয়ারূপ মার্জ্জনী দ্বারা ঐ ক্ষেত্রের ধূলি মার্জ্জনা করিতে হইবে। দুষ্কৃতরূপ মেঘ হইতে ঐ ক্ষেত্রে সম্পদ ও প্রমদারূপ অশনিপাত হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব প্রণব জপার্থে উদ্যুক্ত হইয়া ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, জপ, তপঃ, প্রভৃতি উপায়ে ঐ উপদ্রব নিবারণ করিবে। ঐরূপ রক্ষিত হইলে সেই বীজ হইতে প্রথমে দুইটি পত্র নির্গত হইবে, একটি অধ্যাত্মতত্ত্ব ও অপরটি সাধুসঙ্গ। অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সিদ্ধান্তরূপ বর্ষাকালের আবির্ভাবে বিষয়ত্যাগরূপ সলিলে সিক্ত হইয়া ঐ দ্বিপত্র অঙ্কুর, কাণ্ডভাব ধারণ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বর্দ্ধিত হইবে। অনন্তর ঐ বৃক্ষ হইতে সমতা, শান্তি, মৈত্রী, করুণা, কীর্ত্তি ও উদারতা প্রভৃতি শাখা, শমদমাদিগুণরূপপত্র ও যশোরূপ কুসুম উৎপন্ন হইবে। অনন্তর শাখা, পত্র পুষ্প সমন্বিত হইয়া প্রতিদিন উন্নতি লাভ করিয়া ঐ সমাধিবৃক্ষ সাধককে জ্ঞানরূপ ফল প্রদান করিবে। কুলাচল যেমন স্বয়ংই অটল হইয়া থাকে, সেই

রূপ উক্ত বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া স্বয়ং এরূপ মূলবদ্ধ হয় যে, তাহা আর উন্মূলিত হয় না। বায়ু যেমন আকাশের মেঘ সরাইয়া দিয়া আকাশকে নির্ম্মল করে সেইরূপ ঐ সমাধিবৃক্ষ প্রদত্ত শান্তিছায়া চিত্তমল বিদূরিত করিয়া দিয়া চিত্তকে পরিষ্কার করিয়া দেয়। শীতরশ্মি যেমন সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া লোকদিগের দিনের বেলার আতপতাপ নিবারণ করে, সেইরূপ ঐ সমাধি বৃক্ষ সংসারতাপে তপ্ত মানবদিগের অসাধনাবস্থার তাপ নিবারণ করে। এইরূপে যোগীর হৃদয়কানন সমাধিতরুর ছায়ায় সমাবৃত হইয়া সুশীতল (প্রশান্ত) ভাব ধারণ করে। পরে দেহত্যাগান্তে যোগী কৈবল্য লাভের অধিকারী হয়।

তদ্ভক্তস্তন্মনাসক্তঃ
শনৈর্ম্মুঞ্চেৎ কলেবরম্।
সুস্থিতো যোগচারেণ
সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ॥
ততোবিলীন পাশোঽসৌ
বিমলঃ কেবলঃ প্রভুঃ।
তেনৈব ব্রহ্মভাবেন
পরমানন্দ মশ্নুতে॥
(নাদবিন্দুপনিষৎ)

অনুবাদ। এইরূপে সাধক ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বরমনা, ও ঈশ্বরে আসক্তচিত্ত হইয়া যোগাচার দ্বারা সুস্থিত ও সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত হন। তাঁহার সংসার পাশ বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং জীবভাব থাকে না। তিনি একমাত্র পরিব্যাপক ব্রহ্মভাবে থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন। এই ব্রহ্মভাবে থাকাই তাঁহার কৈবল্য প্রাপ্তি বা মুক্তিলাভ।

আর্য্যনীতি-বিজ্ঞান।

ভীষ্ম যেরূপে ইচ্ছামৃত্যু বরলাভ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি তাঁহার পিতার অভীষ্ট পত্নীলাভের জন্য, নিজের চিরকৌমার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন। বন্দ্রবংশীয় শান্তনু রাজা সত্যবতী নাম্নী সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন; কিন্তু পাছে তাহাতে প্রিয়পুত্র ভীষ্মের মনোদুঃখ হয় এই ভয়ে সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি আশঙ্কা করিতেন যে হয়ত বিমাতা তাঁহার প্রিয়পুত্রকে স্নেহ করিবেন না। এই উভয়সঙ্কটে শান্তনুর মনে বড়ই মর্ম্মপীড়া হইয়াছিল তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন। ভীষ্ম মন্ত্রিগণের নিকট হইতে পিতার বিষাদের কারণ অবগত হইয়া সত্যবতীর পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার কন্যাটিকে

রাজার সহিত বিবাহ দিতে অনুরোধ করিলেন। সত্যবতীর পিতা বলিলেন, "রাজা বৃদ্ধ হইয়াছে, তুমি শীঘ্রই রাজা হইবে, আমি বরং কন্যাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিতে পারি কিন্তু বৃদ্ধ রাজার হস্তে দিতে পারি না।" ভীষ্ম বলিলেন, এমন কথা মনেও করিও না। আমার পিতা যখন তোমার কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখন তিনি আমার জননীস্বরূপা, আমার পিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিন। তখন সত্যবতীর পিতা বলিলেন "যদি আমার কন্যার গর্ভজাত পুত্র রাজা হইবেক ইহা স্থির নিশ্চয় হয়, তবেই আমি তাঁহাকে কন্যাদান করিতে পারি।" ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন "আমি জ্যেষ্ঠত্বাধিকার ত্যাগ করিলাম; বিমাতার গর্ভজাত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিব।" সত্যবতীর পিতা বলিলেন, "আপনার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, তাহা জানি, কিন্তু আপনার পুত্রগণ ত রাজ্যের জন্য বিরোধ করিতে পারে, তাহার উপায় কি?" ভীষ্ম বলিলেন "আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম ইহজীবনে কখনও বিবাহ করিব না, সুতরাং আমার পুত্র না থাকিলে আর বিবাদ করিবার কেহ থাকিবে না। এক্ষণে আমার পিতার অভিলাষ পূর্ণ করুন।" তাঁহার এই সকল ভীষণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে দেবগণ কর্তৃক আকাশ বাণী হইল "এতদিন উঁহার নাম দেবব্রত ছিল; এখন হইতে উনি ভীষ্মনামে পরিচিত হইবেন।" তিনি নিজের পক্ষে 'ভীষ্ম' বটে, কিন্তু আর্য্যগণের হৃদয়ে তিনি পরমপ্রিয় আরাধ্য-দেবতা। আজও প্রত্যেক হিন্দু অন্ততঃ ভীষ্মাষ্টমীর দিনে—

বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায়
সাংকৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ
সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥"

বলিয়া তাঁহার তর্পণ করেন। মহারাজ শান্তনু যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয়পুত্র অতি কঠোর ব্রতধারণপূর্ব্বক সত্যবতীকে তাঁহার পত্নীরূপে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং ভীষ্মের সে প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন, এবং পুত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া আনন্দপূর্ণহৃদয়ে ভীষ্মকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছিলেন। যে মনুষ্য দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তিসমূহকে এ প্রকারে জয় করিতে পারেন, সেই জিতেন্দ্রিয় মহাবীর যে মৃত্যুঞ্জয়ী হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

পক্ষান্তরে দুর্য্যোধনের প্রগল্‌ভতা ও পিতা-মাতার অবাধ্যতাই কুরুক্ষেত্র মহাসমরের আশু কারণ হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে শুধু কুরুবংশ নয়, সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতি ধ্বংস হইয়াছিল। তাহার পিতা তাহাকে পাণ্ডবদিগের ন্যায্য স্বত্ব প্রদান করিতে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত করে নাই; এমন কি, তাহার জননী গান্ধারী সভামধ্যে তাঁহাকে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে অনুনয় করিলে, দুর্য্যোধন তাঁহারও কথা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই মতিচ্ছন্নতার ফলে তাহার বংশ নাশ, রাজ্য নাশ ও ধর্ম্ম নাশ হইয়াছিল। যে সন্তান পিতামাতার মনে কষ্ট দেয় তাহার মঙ্গললাভের সম্ভাবনা কোথায়?

আর্য্যনীতিশাস্ত্রে আচার্য্য বা শিক্ষাগুরুকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। শিষ্য অনুক্ষণ আচার্য্যের সেবাপরায়ণ হইবে

এবং কখনও তাঁহার অপ্রীতিকর কোন কার্য্য করিবে না। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের ও রাজার প্রতি যেরূপ অকপট শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা ও নির্ভরশীলতা উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ পিতামাতা ও শিক্ষকগণের প্রতিও ঐ সমস্ত গুণ সর্ব্বথা আচরণীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের সম্বন্ধে নম্রতা, মধুরতা ও শিক্ষনীয়তা থাকা একান্ত আবশ্যক। আর্য্যশাস্ত্রে জনক জননী ও আচার্য্য সম্বন্ধে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যত বিশিষ্টভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তত বোধ হয় অন্য কোন বিষয়ে হয় নাই, এবং আর্য্যবীরগণের চরিত্রে এই বিশেষত্ব চিরপরিস্ফুট রহিয়াছে। পাণ্ডবগণ যখন ভীষ্ম ও দ্রোণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহাদের প্রতি কত ভালবাসা ও ভক্তিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে নিত্য ঐ গুরুগণের চরণে প্রণাম জ্ঞাপন করিতেন। যখন ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের শুভ্রকেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন অর্জ্জুন উচ্চরবে বলিয়াছিলেন "আচার্য্যকে জীবিত রাখ, তাঁহাকে বিনাশ করিও না। তিনি বধার্হ নহেন।" দ্রোণ হত হইলে তিনি রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "আমি নরকে মগ্ন হইলাম; লজ্জা আমাকে ম্রিয়মান করিয়াছে!"

কেবলমাত্র পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা বা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালন অনুরোধে গুরুবাক্য অবহেলা করিবার দৃষ্টান্ত আর্য্যশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আদর্শ ধর্ম্মবীর ভীষ্মদেবের জীবনে ইহার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পিতা শান্তনুর মৃত্যুর পর তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে রাজা করিয়াছিলেন, এবং চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধে নিহত হইলে, তাহার অনুজ বিচিত্রবীর্য্যকে হস্তিনার সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের জন্য অনুরূপ পত্নীর অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রবণ করিলেন যে, কাশীরাজের তিনটি কন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন। তাঁহাদিগকে সর্ব্বাংশে ভ্রাতার পত্নী হইবার যোগ্যা জানিয়া তিনি কাশীতে গমনপূর্ব্বক স্বীয় বাহুবলে স্বয়ম্বরসভায় সমাগত রাজন্যমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে লইয়া আসেন। তথায় অম্বিকা ও অম্বালিকা স্বেচ্ছায় বিচিত্রবীর্য্যকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠা অম্বা বলিলেন, তিনি পূর্ব্বেই শাল্বকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন। তখন ভীষ্ম তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক শাল্বের সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শাল্ব তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন "যখন ভীষ্ম যুদ্ধে জয় করিয়া তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছেন, তখন আর তাঁহার নিকট হইতে তোমাকে দানস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি না।" অম্বা ভীষ্মের নিকট প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বলিলেন, "যখন আপনি জয় করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া শাল্ব আমাকে গ্রহণ করিলেন না, তখন আপনাকেই আমাকে বিবাহ করিতে হইবে।" অম্বার দুঃখে ভীষ্ম ব্যথিত হইলেন বটে কিন্তু পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষার অনুরোধে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে পারিলেন না; কারণ তিনি চিরজীবন কৌমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন অম্বা ক্রোধভরে ভীষ্মের গুরু পরশুরামের শরণাপন্ন হইলেন। পরশুরাম তাঁহার পক্ষ

অবলম্বনপূর্ব্বক ভীষ্মকে অম্বা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভীষ্মদেব তাঁহার কৌমার্য্যব্রতনাশক এই অন্যায় আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। তাহাতে গুরুশিষ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহু দিবসব্যাপী যুদ্ধে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন; উভয়েই ক্লান্তিবশে ও রক্তস্রাব জন্য কতবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, আবার মূর্চ্ছাভঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এইরূপ অষ্টাবিংশতি দিবস যুদ্ধের পর, বৃদ্ধ পরশুরাম স্বীকার করিলেন তাঁহার আর ক্ষমতা নাই; ভীষ্মেরই জয়। যাহা হউক, ভীষ্মদেব কিন্তু অম্বার দুঃখের নিমিত্ত কারণ হইয়াছিলেন। তজ্জন্য অম্বা পরে ভীষ্মের মৃত্যুর হেতু হইয়াছিল।

পিতামাতা ও আচার্য্যের সমপর্য্যায়ের কুটুম্বগণ এবং আপনার অপেক্ষা জ্ঞানবান ও নীতিবান ব্যক্তিগণকে নৈমিত্তিক গুরু বলা যাইতে পারে। স্বাভাবিক গুরুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার উপরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে নৈমিত্তিক গুরুর প্রতিও তদনুরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন—

"বিদ্যা গুরুষ্বেতদেব
নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মাদ্ধিতং
চোপদিশৎস্বপি॥
শ্রেয়ঃসু গুরুবদ্বৃত্তিং
নিত্যমেব সমাচরেৎ।"
(মনু ২। ২০৬। ২০৭)

বৃদ্ধের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন, প্রাচীন হিন্দুচরিত্রের একটি প্রধান গুণ ছিল। বহুদর্শনজনিত জ্ঞান বৃদ্ধের সঞ্চিত ধন; তাঁহারা সানন্দে সেই জ্ঞান উপযুক্ত নম্র ও ধীর শিক্ষার্থীকে প্রদান করিয়া থাকেন। অধুনা কিন্তু আত্মাদরস্ফীত যুবাগণকে বয়োবৃদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে প্রায়ই পরাঙ্মুখ দেখা যায়। তাই বিশেষ যত্নসহকারে এই গুণের অনুশীলন করা বর্ত্তমান যুগে সমধিক প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

"ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা
ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা
যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥ ১৮
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন
ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং
প্রকৃতিং চ হতৌজসং॥ ১৯
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ২৫
ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগ ঐন্দ্রিয়াৎ
দৃষ্ট শ্রুতান্মদ্রচনানুচিন্তয়া—।
চিত্তস্য যত্তো গ্রহণে যোগযুক্তো
যতিষ্যতে ঋজুভির্যোগমার্গৈঃ॥ ২৬
আসেবয়াজ্যং প্রকৃতেগুণানাং
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন।
যোগেন মর্য্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে॥" ২৭
(শ্রীমদ্ভাগবত ৩। ২৫)

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আইন।

১৮২৫ সালের ৯ নম্বর আইন, জের—

একাদশ দফা। যে ব্যক্তি নিষ্কর বলিয়া ভূমি দাবি করিবে, সে আর্জির দরখাস্তের সহিত দাবির পোষক সনদ এবং অন্যান্য দলিল কালেক্টর বা অপর কর্ম্মচারীর নিকট দাখিল করিবে; এবং নিষ্কর জমির রেজেষ্ট্রিকরণ বিষয়ক নিয়মে যে সমুদায় বিষয় রেজেষ্ট্রি করিবার বিধান আছে তাহার বিশদ বিবরণ এবং দাবির হেতু দরখাস্তে লিখিয়া দিবে। যদি ঐ দাবিতে কেবল গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়, তবে নির্দ্ধারিত তারিখের ৮ দিবস পূর্ব্বে পক্ষকে নোটিশ দিয়া কালেক্টর দেওয়ানী আদালতের নির্দ্ধারিত প্রকারে অবিলম্বে মোকর্দ্দমা বিচার করিবেন। যদি ঐ দাবি কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে বা গবর্ণমেণ্ট ও ব্যক্তিবিশেষ উভয়ের বিরুদ্ধে হয়, তবে দাবির বিবরণ লিখিয়া কালেক্টর, দলিল বা প্রমাণসহ এক মাসের ভিতর স্বয়ং বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিল দ্বারা উপস্থিত হইবার জন্য, ঐ ব্যক্তিবিশেষের নামে নোটিশ দিবেন; ঐ ব্যক্তিবিশেষ উপস্থিত হইলে দাবিকারকের আর্জির দরখাস্ত এবং তৎসংক্রান্ত দলিলাদি তাহাকে দেখাইয়া ৭ দিবসের মধ্যে দাবির বিরুদ্ধে তাহার যে আপত্তি থাকে, তাহা দাখিল করার জন্য কালেক্টর তাঁহাকে আদেশ দিবেন। এই সকল মোকর্দ্দমায় আর্জি ও জবাব ব্যতীত অন্য কাগজ পক্ষগণের নিকট চাওয়া হইবে না; কিন্তু দাবির প্রমাণ বুঝাইবার জন্য আবশ্যক কাগজ কালেক্টর পরে গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন। বিবাদীর জবাব পাইলে কালেক্টর অতিশীঘ্র এইরূপ মোকর্দ্দমা তদন্ত করিবেন, কিন্তু পক্ষগণকে পূর্ব্বোক্তরূপে ৮ দিবস পূর্ব্বে ধার্য্যদিনের নোটিশ দিবেন। গবর্ণমেণ্টের দাবিকৃত বা পক্ষের রুজু মোকর্দ্দমা হউক এবং ১৮১৯ সালের ২ আইন বা বর্ত্তমান আইন বা ঐ বিষয় সংক্রান্ত অন্য আইন অনুযায়ী কালেক্টর কার্য্য করুন্ না কেন, যদি লিখিত দরখাস্ত বা ইক্রারনামা দাখিল করিয়া পক্ষগণ বা তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ বিচার প্রার্থনা করে, তবে কলেক্টর্ ঐ দরখাস্ত বা ইক্রার্নামা নথির সামিল করিয়া এবং রীতিমত সমন বা নোটিশ না দিয়া মোকর্দ্দমার তদন্ত ও বিচার তৎক্ষণাৎ করিতে পারিবেন।

দ্বাদশ দফা। যদি কালেক্টর্ বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী মনে করেন যে, কোনও জমি গবর্ণমেণ্টের এবং কোনও ব্যক্তির তাহাতে প্রকৃত দখল নাই, তবে তাঁহার নিজের কাছারিতে এবং যাহার এলাকার ভিতর বা পার্শ্বে ঐ জমি অবস্থিত সেই জিলা-কোর্টে ও কানুন্‌গো, মুন্সিফ বা থানাদারের কাছারিতে নোটিশ লট্‌কাইয়া নোটিশ জারির

ছয় সপ্তাহের অনধিক বোর্ড অব্ রেভিনিউ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে ঐ জমির দাবিকারক যাবতীয় ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য তিনি আদেশ দিতে পারিবেন; এবং দাবিকারকগণ উপস্থিত হইলে ১৮১৯ সালের ২ আইন ও বর্ত্তমান আইনে তাহার যে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তদনুযায়ী ঐ দাবির তদন্ত করিবেন। যদি কালেক্টর্ বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মচারী নিষ্পত্তি করেন যে, দাবিকারকগণের মধ্যে কাহারও ঐ জমিতে প্রকৃত দখল নাই এবং বোর্ড অব্ রেভিনিউ ঐ নিষ্পত্তি বহাল করেন, তবে রীতিমত মোকর্দ্দমায় আদালতের ডিক্রিতে ঐ জমি ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি বলিয়া স্থিরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা গবর্ণমেণ্টের হেপাজতে থাকিবে। কালেক্টরের নিকট দাবিকারকগণের মধ্যে কেহ এইরূপ মোকর্দ্দমা করিলে তাহা বোর্ড কর্ত্তৃক কালেক্টরের হুকুম বহাল হইবার তারিখের ছয় সপ্তাহের মধ্যে রুজু না হইলে মায় খরচ ডিস্‌মিস্ হইবে, এবং ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১৩ ধারার দ্বিতীয় দফার লিখিত নিয়ম উহার প্রতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইবে। কালেক্টরের নিকট নোটিশ পাইয়া গরহাজির ব্যক্তি অনুপস্থিতির উত্তম ও সন্তোষজনক কারণ দেখাইয়া বোর্ডের হুকুম অবগত হইবার ছয় সপ্তাহের মধ্যে মোকর্দ্দমা রুজু করিবার অনুমতির জন্য দরখাস্ত দিলে, ঐ অনুমতি অনুযায়ী নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে মোকর্দ্দমা রুজু না করিলে, তাহার মোকর্দ্দমা মায় খরচ ডিস্‌মিস্ হইবে।

৬ ধারা। কোনও মহালের ভিতর কোনও স্থানীয় তদন্তে নিযুক্ত কোনও কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারীকে ঐ মহালের জমি বা তাহার অংশ যে গ্রামে অবস্থিত, সেই গ্রামের ভিতর বা সংলগ্ন সমুদায় নিষ্কর জমির তদন্ত করিবার, ১৮২২ সালের ৭ আইন অনুযায়ী বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত কালেক্টরের ক্ষমতা, কাউন্সিলে হুকুম দিয়া সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল্ দিতে পারিবেন। আরও তিনি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পূর্ব্বোক্ত দাবি নির্দ্ধারণ, লিপিবদ্ধ বা তদারক করার জন্য কালেক্টর বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৭ ধারা। ১৮২২ সালের ৭ আইন অনুযায়ী কোনও মহাল বা গ্রামের বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত কালেক্টর বা অন্য কর্ম্মচারী যাবতীয় নিষ্কর জমির বিবরণ বন্দোবস্তের রোবকারীতে বিশদরূপে লিখিবেন।

৮ ধারা। ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১০ ধারার ও বেনারস এবং বিজিত প্রদেশে তত্তুল্য আইনের লিখিত, ঐ ধারার বা আইনের নির্দ্ধারিত তারিখের পর বেআইনী দান সম্বন্ধে যে বিধান আছে, তাহার প্রতি ১৮১৯ সালের ২ আইন বা অন্য কোনও প্রচলিত আইন খাটিবে না, এবং রাজস্ব-কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট কোনও স্থলে সন্তোষজনক ভাবে যদি প্রমাণ হয় যে, কোনও নিষ্কর জমি ঐ তারিখে বা তাহার পরে করযুক্ত ছিল; এবং তাহার পরে সকৌন্সিল গবর্ণরজেনারলের হুকুম অনুযায়ী বা আদালতের রীতিমত ডিক্রীদ্বারা নিষ্কর বলিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই, তবে পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎক্ষণাৎ ঐ জমি বাজেয়াপ্ত এবং তাহার করধার্য্য করিতে পারিবেন, যদি ঐ জমির রাজস্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তগৃহীতা কোনও জমিদার, তালুকদার বা অন্য মাল-

গুজারের প্রাপ্য না হয়। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২২ ধারার বিধান এইস্থলে বর্ত্তিবে না।

৯ ধারা। মালপত্র চালান, রপ্তানি বা আমদানির উপর ট্যাক্স বা মাশুল ছাড়া কালেক্টর বা অন্য উদ্ধতন রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্তৃক মঞ্জুর ও প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী মাল্‌গুজার এবং অন্য ব্যক্তি কর্তৃক আদায়ী সিওয়াই আদায় বা সেসের প্রতি ১৮১০ সালের ৯ আইনের (১৮৬৩ সালের ৬নং আক্ট দ্বারা এই আইন রদ্ করা হইয়াছে।) ৩৯ ধারার বিধান এবং সয়ার আদায় উঠাইবার নিয়ম বর্ত্তিবে না।

সাল	নম্বর	বিষয়
১৮২৫	১৯	লপ্ত পয়স্তি বা নদী বা সমুদ্রের জল সরিয়া যাওয়াতে উদ্ভুত জমিতে স্বত্ব নিদ্ধারণ বিষয়ক।

১৮৭৪ সালের ১৫ আইনের তফশীলের লিখিত জেলা ছাড়া বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র এই আইন প্রচলিত। সাঁওতাল পরগণা, পশ্চিম জল্‌পাইগুড়ি, তরাই ও সিলেট জেলায় এই আইন প্রচলিত।

২ ধারা। কোনও নদী দ্বারা বিভক্ত দুই বা ততোধিক সংলগ্ন মহালের মালিকগণের স্বত্ব নিরূপণ কার্য্য, নদীর প্রবাহ সরিয়া যাওয়ায় শিকস্তি পয়স্তি মহালের সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রথাদ্বারা আবহমান কাল সমাধা হইলে, (যথা নদীর প্রধান প্রবাহ বরাবরই উভয় মহালের সীমানা হইবে) ঐ প্রথাদ্বারা ঐ মালিকগণের জমির দাবি ও বিরোধ নিষ্পত্তি করা যাইবে।

৩ ধারা। পূর্ব্ববর্ত্তী ধারার লিখিত কোনও স্থানীয় প্রথা না থাকিলে পরবর্ত্তী ধারার লিখিত সাধারণ নিয়মে পয়স্তি জমির দাবি ও বিরোধ নিষ্পত্তি করা যাইবে।

৪ ধারা। প্রথম দফা।

নদী বা সমুদ্র সরিয়া যাওয়ার দরুণ জমি ক্রমশঃ উত্থিত হইলে, যে ব্যক্তির জমি বা মহালের সংলগ্ন তাহার মধ্যস্বত্বের পয়স্তি বলিয়া গণ্য হইবে। ঐ জমি বা মহাল জমিদার বা অন্য উপরিতন ভূস্বামী সাক্ষাৎ গবর্ণমেণ্ট হইতে রাখুন বা কোনও প্রকারের নীচস্থ প্রজা নীচস্থ হকিয়ৎ স্বরূপ রাখুন, ঐ জমি বা মহালে দখলকারের যে স্বত্ব ঐ পয়স্তিতে সেই স্বত্ব হইবে, এবং ঐ পয়স্তির দরুণ ১৮১৯ সালের ২ আইন বা অন্য প্রচলিত আইন অনুযায়ী অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ধার্য্য হইবে।

দ্বিতীয় দফা। সহসা প্রবাহ পরিবর্ত্তন করিয়া নদী কোনও মহাল ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতর দিয়া গমন করিলে এবং ক্রমশঃ পয়স্তি না ঘটিলে অথবা প্রবাহের বেগে একটি বৃহৎ ভূখণ্ড এক মহাল হইতে কাটিয়া অন্য মহালে সংলগ্ন হইলে,—তাহাতে ঐ ভূখণ্ড চিনিবার কোনও ব্যাঘাত না ঘটে—পূর্ব্বোক্ত নিয়ম খাটিবে না। এইরূপ স্থলে জমি স্পষ্ট চেনার দরুণ সাবেক ভূস্বামীর সম্পত্তি থাকিবে।

তৃতীয় দফা। বৃহৎ জলযান চলাচলের যোগ্য নদীতে (যাহার গর্ভ কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়) অথবা সমুদ্রে কোনও চর বা দ্বীপ উত্থিত হইলে এবং ঐ দ্বীপ ও কূলের মধ্যস্থিত খাড়ি যদি হাঁটিয়া পার না হওয়া যায়, তবে চলিত প্রথা অনুযায়ী ঐ দ্বীপ গবর্ণমেণ্টের হেপাজতে থাকিবে। কিন্তু যদি

ঐ খাড়ি বৎসরের কোনও নময়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায় তবে যে ব্যক্তির মহাল অতিশয় নিকটবর্ত্তী তাহার হকিয়তের পয়স্তি বলিয়া ঐ দ্বীপ গণ্য হইবে, এবং প্রথম দফার বিধান তাহার প্রতি বর্ত্তিবে।

চতুর্থ দফা। ক্ষুদ্র অল্পগভীর নদীতে (যাহার গর্ভ ও মাছ ধরার জলকর এতাবৎ-কাল ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছে) কোনও চর পড়িলে পূর্ব্বের ন্যায় তাহা গর্ভের অধিকারীর স্বত্ব হইবে, এবং প্রথম দফার বিধান তাহার প্রতি বর্ত্তিবে।

পঞ্চম দফা। পয়স্তি কিম্বা নদী বা সমুদ্র সরিয়া যাওয়ার দরুণ উত্থিত জমির অন্য প্রকার দাবি এবং বিবাদ, যাহা বর্ত্তমান আইনে বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হয় নাই, নিষ্পত্তি করিতে চলিত স্থানীয় প্রথা থাকিলে সে সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তদনুযায়ী আদালত চলিবেন, এবং তাহা না থাকিলে ন্যায় বিচারের সাধারণ নিয়মানুসারে চলিবেন।

৫ ধারা। জলযান যাতায়াত করিতে পারে এরূপ নদীর গর্ভে বা প্রবাহে কোনও ব্যক্তি বর্ত্তমান আইনের দ্বারা কোনও প্রতিবন্ধক দিতে পারিবেন না। জিলা এবং সহরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা সেই কার্য্যে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত গবর্ণমেণ্টের অন্য কর্ম্মচারীর, ঐরূপ নদীতে নির্ব্বিঘ্নে এবং নিয়মিতভাবে জলযান গমনের কোনও বাধা, অথবা তীরে লাগিয়া বা অন্য প্রকারে নৌকা গমনের কোনও বাধা, দূর করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান আইনের দ্বারা কাড়িয়া লওয়া হইবে না।

সাল	নম্বর	বিষয়
১৮২৫	১৩	বেহার প্রদেশে কার্নুনগো কর্ত্তৃক দখলিয় কতক নিষ্কর জমির বন্দোবস্ত বজায় রাখা এবং ঐ জমি ও অন্য বাজেয়াপ্ত লাখেরাজ জমির গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে বর্ত্তমান দখলকারের সহিত ভবিষ্যতে বন্দোবস্ত করা।

লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া সেই জমি উপযুক্ত খাজনায় মিন্হাইদার্ এবং তাহাদের উত্তরাধিকারিগণের দখলে ও তত্ত্বাবধানে সকৌন্সিল্ গবর্ণর্ জেনারল্ রাখিতে পারিবেন; জমিদার বা অন্য ভূস্বামী—বাজেয়াপ্ত করার পূর্ব্বে যে খাজনা, উৎপন্ন বা মুনফা পাইয়াছেন, অথবা গবর্ণমেণ্ট ঐ জমি বাজেয়াপ্ত না করিয়া লাখেরাজ বলিয়া মঞ্জুর করিলে যে টাকা পাইতেন, তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা পাইবেন না। বাজেয়াপ্ত করার পূর্ব্বে যে ভূস্বামী ঐ জমিতে দখলকার ছিলেন না তিনি, মালিকানা মুনফা পাইয়া থাকেন বা নাই পাইয়া থাকেন, সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল্ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দখল মঞ্জুর করিলে, মিন্হাইদার বা তাহার উত্তরাধিকারী এবং কর্ম্মচারীর দখলে ব্যাঘাত ঘটাইবেন না, এবং তিনি এই নিয়মের ব্যতিরেকে আদালতে দখল পাইবার নালিশ করিলে তাহা মায় খরচ ডিস্‌মিস্ হইবে। ঐরূপ স্থল লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হইবার পূর্ব্বে যে মালিকানা বা অন্য মালিকি মুনফা জমিদার বা অন্য ভূস্বামী পাইতেন, বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর তাহা তিনি সমান ভাবে পাইবেন। মিন্হাইদারের স্বত্ব পুরুষানুক্রমে ভোগ করা যাইবে ও দান-বিক্রয় করা যাইবে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত

হইলে উপযুক্ত খাজনায় জমিদার বা অন্য ভূস্বামীর সহিত জমি বন্দোবস্ত হইবে। ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ৮ ধারার দ্বিতীয় দফার নিয়মে খাজনা ধার্য্য করা বাজেয়াপ্ত লাখেরাজ জমির প্রতি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম বর্ত্তিবে। ১৭৯৩ সালের ৩৭ আইনের বা অন্য প্রচলিত আইনের নির্দ্ধারিত বাজেয়াপ্ত জাইগির, আল্‌তাম্‌সা, মাদামাস্‌, আয়মা এবং অন্য বাদ্‌সাহি দান সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে, তাহার পরিবর্ত্তন এবং লাখেরাজ জমির বাজেয়াপ্ত ও করধার্য্য করার বর্ত্তমান বিধানের ব্যাখ্যাসূচক এই নিয়ম করা যাইতেছে যে, ১৮১৯ সালের ২ আইন বা অন্য প্রচলিত আইন অনুযায়ী রেভিনিউ বোর্ড বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ত্তৃপক্ষ কোনও লাখেরাজ অসিদ্ধ বা রহিত বলিয়া সাব্যস্ত করিলে, বর্ত্তমান দখলকার বা তাহার পূর্ব্ব-পুরুষের বহুদিনের দখল বিবেচনা করিয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলে,উপযুক্ত খাজনায় বর্ত্তমান দখলকারের দখলে, ঐ ব্যক্তি জমিদার, তালুক-দার বা অন্য ভূস্বামী না হইলেও, ঐ জমি রাখিতে সকৌন্সিল গবর্ণরজেনারল হুকুম দিতে পারিবেন এবং এই আইনের নির্দ্ধারিত বিধান ঐস্থলে বর্ত্তিবে।

সাল	নম্বর	বিষয়
১৮২৫	১৪	সকৌন্সিল গবর্ণরজেনারলের নীচস্থ রাজস্ব কর্ম্মচারীগণের লাখেরাজ দান সম্বন্ধে ক্ষমতা; ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্বে বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতা-প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত দানের সিদ্ধতা নির্ণয়ের প্রণালী ইত্যাদি।

২ ধারা। জীবনভোগী বা চিরকালের জন্য লাখেরাজ দানের এবং মোকর্দ্দমায় রীতি-মত নিষ্পত্তি ব্যতীত লাখেরাজ মঞ্জুর করার ক্ষমতা মাত্র উর্দ্ধতম গবর্ণমেন্টের আছে; ব্রিটিশ অধিকারের পর কোনও লাখেরাজ দান বা মঞ্জুর বিষয়ক কার্য্য, হুকুম বা নিষ্পত্তি সকৌ-ন্সিল গবর্ণরজেনারল বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষরূপে ক্ষমতাপন্ন কোনও কর্ম্মচারী না করিলে বা দিলে, কিম্বা রীতিমত মোকর্দ্দমায় আদালতের প্রদত্ত নিষ্পত্তি অনুযায়ী না হইলে, কিম্বা ১৮১৯ সালের ২ আইন বা তাহা দ্বারা রহিত অন্য আইন দ্বারা তদন্ত করিয়া লাখে-রাজ সাব্যস্তে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা-পন্ন রেভিনিউ বোর্ড না করিলে বা দিলে, রেভিনিউ বোর্ডের নিষ্পত্তি শঠতামূলক বলিয়া আদালতে প্রমাণ হইলে উহা চূড়ান্ত হইবে না—ঐ কার্য্য, হুকুম বা নিষ্পত্তি সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়ী প্রদত্ত হুকুম ছাড়া কোনও লাখেরাজ জমির গবর্ণমে-ণ্টের পক্ষে খাজনা ধার্য্য করার স্বত্ব পরিত্যাগ বা মুলতবি করণের কোনও মন্তব্য বা হুকুম বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক কিম্বা দত্ত ও বিজিত প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ও বোর্ড অব্ কমিসনর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলে, তাহাতে গবর্ণ-মেন্টের পক্ষে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ঐ জমির খাজনা ধার্য্য করার বাধা হইবে না।

সিংহাচল-মাহাত্ম্য।

দ্রাবিড়দেশের প্রত্যেক তীর্থেই তত্তৎ-স্থানের এক এক খানি স্বতন্ত্র পুরাণ পাওয়া যায়। সেই পুরাণ "স্থলপুরাণ" নামে অভিহিত। শ্রীক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে যতগুলি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান আছে, প্রায় তৎসমস্তেরই বিবরণ স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে যাহার কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না, স্থলপুরাণে তাহা প্রকটিত আছে। স্কন্দপুরাণে যাহা বর্ণিত আছে, স্থলপুরাণে তাহাত পাওয়া যাইবেই, তদ্ব্যতীত কিছু কিছু অতিরিক্ত বিবরণও সন্নিবেশিত দেখা যায়। কিন্তু স্কন্দপুরাণ যে তীর্থ সম্বন্ধে নীরব; স্থলপুরাণ সে তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়া উক্ত মহদভাব দূর করিয়া দেয়। এই কারণে স্থলপুরাণগুলি ইতিহাস-লেখকের বিশেষ প্রয়োজনীয়। তবে এ সম্বন্ধে একটা সঙ্কট আছে:—স্থলপুরাণের ভাষা সংস্কৃত হইলেও প্রায় সর্ব্বত্রই তাহা স্থানীয় বর্ণমালায় মুদ্রিত; ত্রৈলঙ্গ প্রদেশের ত্রৈলঙ্গীয়, তামিল প্রদেশের তামিলীয় এবং কর্ণাট প্রদেশের কর্ণাটী বা মলয়ালম্ অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত দেখা যায়। যাঁহারা ঐ সকল বর্ণমালায় অনভিজ্ঞ, স্থলপুরাণপাঠে তাঁহাদের বড়ই অসুবিধা হইয়া থাকে।

সিংহাচল ত্রৈলঙ্গ প্রদেশে অবস্থিত; সেইজন্য উক্ত ক্ষেত্রের স্থলপুরাণ ত্রৈলঙ্গবর্ণমালায় মুদ্রিত। কিন্তু তাহার ভাষা আদ্যন্ত সংস্কৃত। স্কন্দপুরাণে সিংহাচল-মাহাত্ম্য সম্পর্কে যাহা কিছু বর্ণিত আছে, সিংহাচলের স্থলপুরাণে তদপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে অধিক লিখিত দেখা যায়। স্কন্দপুরাণ ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও দাক্ষিণাত্যের দক্ষারাম প্রভৃতি কোন কোন তীর্থের সামান্য সামান্য বিবরণও লক্ষিত হইয়া থাকে। সিংহাচলের স্থলপুরাণে উক্ত তীর্থ সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে তন্মধ্যে প্রহ্লাদের ইতিহাস সর্ব্বপ্রধান। শাপগ্রস্ত জয়বিজয়ের হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জন্ম; কঠোর তপস্যা, ত্রিলোকের আধিপত্যলাভ, প্রহ্লাদের উৎপত্তি, বিদ্যালাভ, পিতৃহস্তে বিবিধ বিধানে দারুণ নির্য্যাতন, অবশেষে ভগবৎ-হস্তে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর নিধনপ্রাপ্তি; এই সকল বিবরণ হিন্দুমাত্রের সুবিদিত, সুতরাং এই সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে সিংহাচলের উৎপত্তি, তথায় প্রহ্লাদকর্ত্তৃক শ্রীবরাহ নরসিংহমূর্ত্তি-স্থাপন ও তৎপূজাদির ব্যবস্থা; কলিযুগের প্রারম্ভে সিংহাচলক্ষেত্রে ভীষণ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব, তৎপ্রদেশীয় জনসাধারণের পলায়ন ও তৎপ্রযুক্ত সিংহাচল তীর্থের অবনতি ও ক্রমে ক্রমে অরণ্যে পরিণতি এবং পরিশেষে রাজা পুরূরবার আগমন ও তৎকর্ত্তৃক সিংহাচলের পুনঃসংস্কারসাধন, ভগবানের বরাহনৃসিংহ মূর্ত্তির পুনরুদ্ধার ও পূজার ব্যবস্থা-স্থাপন;—

এই সকল বিবরণ সাধারণের অবিদিত ; সেই-জন্য সিংহাচল তীর্থের মাহাত্ম্যের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বৃত্তান্তনিচয় সঙ্ক্ষেপে বিবৃত হইল।

সিংহাচলের স্থলপুরাণে মহর্ষি জৈমিনি বক্তা এবং কতকগুলি ঋষি শ্রোতা। জৈমিনি বলিতেছেন :—

স্থানানি নরসিংহস্য
সন্ত্যনেকানি ভূতলে।
সুগুপ্তানি চ রম্যানি
পর্ব্বতেষু বনেষু চ॥
ভূতানি চ ভবিষ্যাণি
ভুক্তিমুক্তিপ্রদানি বৈ।
বহূনি তস্য রূপাণি
সন্ত্যদ্ভুততমানি চ॥
তেষু মুখ্যানি চত্বারি
প্রধানানি বিশেষতঃ।
অহোবিলং হরংপাপং
কৃতশৌচস্তথৈবচ॥
সিংহাচলমথৈতেষাং
চতুর্থং মুনিসত্তমাঃ।

অর্থাৎ ভূমণ্ডলে কতকগুলি পর্ব্বত ও বন-স্থলে ভগবান্ নরসিংহদেবের পুণ্যনামে পবিত্রী-কৃত অনেকগুলি তীর্থ আছে। তৎসমুদায়ই সুগুপ্ত ও রমণীয়। সমস্তগুলিই ভুক্তিমুক্তি-প্রদ। তন্মধ্যে কতকগুলি অতীতকালে সৃষ্ট হইয়াছে ; ভবিষ্যতে অপর কতকগুলির সৃষ্টি হইবে। ভগবানের অনেকগুলি অত্যদ্ভুত রূপও দেখা যায়। নরসিংহক্ষেত্র সকলের মধ্যে চারিটি প্রধান ; যথা,—অহোবিল, হরংপাপ, কৃতশৌচ ও সিংহাচল। এই ক্ষেত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে সিংহাচল সকলের শ্রেষ্ঠ ও আদি।

স্থানানামপি সর্ব্বেষা-
মাদ্যং সিংহাচলং স্মৃতম্।
তদেব রম্যং শ্রেষ্ঠঞ্চ
সর্ব্বকামার্থদং দ্বিজাঃ।
প্রহ্লাদরক্ষণার্থন্তু
সিংহাদ্রৌ পূর্ব্বমেব হি
নৃসিংহ শান্তরূপেণ
প্রাদুর্ভূতো বরপ্রদঃ॥

কথিত আছে, সিংহাচলের শিখরদেশ হইতে দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যরাজ বালক প্রহ্লাদকে সাগরজলে নিক্ষেপ করিলে ভগবান্ নারায়ণ শান্তমূর্ত্তিতে তথায় আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে প্রহ্লাদ এই পর্ব্বতেই ভগবানের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

অহোবিল, হরংপাপ ও কৃতশৌচসম্বন্ধে যে বিবরণ দেখা যায়, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

অহোবিলাহ্বয়ক্ষেত্রে
নৃসিংহস্তম্ভসম্ভবঃ।
বিদার্য্য দৈত্যং করজৈ-
র্হিরণ্যকশিপুং স্থিতঃ॥
যত্র দারয়তো দৈত্যং
নৃসিংহস্য দিবৌকসঃ।
অহোবিলমিতি প্রাহুঃ
কথ্যতে তদহোবিলম্॥
হরং পাপে তদা ক্ষেত্রে
বিড়ালো নরকেশরী।
আস্তে ভৈরবরূপেণ
কালমূষক-সংহরঃ॥

যত্র পাপানি সর্ব্বাণি
হ্রীয়ন্তে দৃষ্টিমাত্রতঃ।
তৎকথ্যতে হরং পাপং
ক্ষেত্রং মুক্তিপ্রদং দ্বিজাঃ॥
দৈত্যাসৃগ্দিগ্ধবপুষো
যত্র শৌচং হরের্ম্মুদা।
মূর্ত্তিমদ্ভিঃ কৃতং তীর্থৈঃ
কৃতশৌচস্তদুচ্যতে॥

অহোবিল নামক ক্ষেত্রেই ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর স্ফটিকস্তম্ভে আবির্ভূত হইয়া দৈত্যরাজের উদর বিদারিত করিয়াছিলেন। দেবগণ সেই ভয়াবহ বিদারদর্শনে বিস্মিত হইয়া "অহোবিল" অর্থাৎ কি ভয়ঙ্কর গহ্বর বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন, সেইজন্য সেই-স্থান অহোবিল নামে প্রসিদ্ধ।

এই ক্ষেত্র মান্দ্রাজের কনূর জেলার অন্তর্গত শ্রীবিল তালুকের অধীন। নল্লমলাই নামক পর্ব্বতের উপরিভাগে অক্ষরেখার ১৫।৮ উত্তর ক্রান্তিবৃত্তে ও ৭৮। ৪৫ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই পর্ব্বতের পাদমূলে, অধিত্যকাদেশে ও শৃঙ্গে এই তিন স্থানে তিনটি বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রথম দুইটি মন্দির যথাক্রমে দিগুবা (নিম্ন) ও যিগুবা (উদ্ধ) অহোবিল নামে প্রসিদ্ধ। দিগুবা অহোবিলের চারি মাইল উপরে যিগুবা অহোবিল স্থাপিত। শৃঙ্গস্থ মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। দিগুবা অহোবিল মন্দিরটি দেখিতে বড়ই সুন্দর। ইহার সম্মুখভাগে দুইটি বৃহৎ পাষাণমণ্ডপ; সেই মণ্ডপদ্বয় কয়েকটি পাষাণ স্তম্ভের উপর ধৃত। সমগ্র অংশটি পর্ব্বত হইতে খুদিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। উভয় মণ্ডপের প্রাচীরগাত্রে ও স্তম্ভসমূহে রামায়ণের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলির সুন্দর সুন্দর চিত্র মনোরম বর্ণে চিত্রিত দেখা যায়। ইহার মধ্যে যেটি কল্যাণ-মণ্ডপ নামে নির্দ্দিত, তাহার চিত্রাবলী দেখিলে চমৎকৃত ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে হয়। প্রতি বৎসর চৈত্র ও বৈশাখ মাসে অহোবিল ক্ষেত্রে দুইটি মেলা বসিয়া থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি মেলার সময়ে তথায় উপস্থিত হইতে পারি নাই; সুতরাং ভগবানের বিভূতি দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। স্থলপুরাণের বিবরণ সত্য বলিয়া গৃহীত হইলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, হিরণ্যকশিপু এই নল্লমলাই পর্ব্বতেই বাস করিত এবং এই স্থানেই ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। মন্দিরত্রয় কোন রাজার কীর্ত্তি তাহা স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। তবে তথায় রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিলাম।

সিংহাচল, অহোবিল, হরংপাপ ও কৃতশৌচ এই তীর্থচতুষ্টয় ভক্তাধীন ভগবানের অপার মহিমপ্রকাশের চারিটি ক্রমোন্মেষ ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে। সিংহাচলে নারায়ণ শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাগরনিক্ষিপ্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন; অহোবিলে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়া ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদকে পিতৃসিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন; দৈত্যরাজের শোণিতে ভগবানের উভয় হস্ত রঞ্জিত হইলে যে স্থানে যাইয়া হরি সেই রুধিরদিগ্ধ করযুগল প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন তাহাই কৃতশৌচ ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হিরণ্যকশিপু ব্রাহ্মণবংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং তদ্বধে ভগবানের ব্রহ্মহত্যা পাপ সঞ্চিত হওয়াতে যে স্থানে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সেই পাপ হইতে পরিমুক্ত

হয়েন, তাহাই হরপাপ তীর্থ নামে পরে বিদিত হইয়াছে। এই দুই তীর্থ মান্দ্রাজের কোন্ কোন্ জেলায় অবস্থিত তাহা জানিতে পারি নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে সিংহাচলের বিবরণ শেষ করিয়া অন্যান্য তীর্থের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব। স্থলপুরাণে বর্ণিত আছে—

"পঞ্চযোজনবিস্তারঃ
পর্ব্বতোহসৌ কৃতে যুগে।
পঞ্চক্রোশায়তো বিপ্রা
ভবিষ্যতি কলৌ যুগে॥"

অর্থাৎ সত্যযুগে সিংহাচলের বিস্তার পাঁচ যোজন ছিল, এবং মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছিলেন কলিযুগে তাহা পঞ্চক্রোশে পরিণত হইবে। বিশাখাপত্তনের সাগরতট হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহাচলের অপর তিনদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বোধ হয় পূর্ব্বে উক্ত তীর্থ বিস্তৃত ছিল। তৎপরে কলির প্রারম্ভে দারুণ অনাবৃষ্টি ও তন্নিবন্ধন ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তত্রত্য অধিবাসিমাত্রই সিংহাচল ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রহ্লাদ সিংহাচলে ভগবান্ বরাহ নরসিংহদেবের মন্দির স্থাপনপূর্ব্বক ভগবানের পূজার নিমিত্ত কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করাইয়াছিলেন। সেই ভয়াবহ অন্নকষ্টে কাতর হইয়া তাঁহারাও উক্ত তীর্থস্থান পরিত্যাগ করিয়া যান। এইরূপে সিংহাচল পরিত্যক্ত হইয়া বীভৎস শ্মশানমূর্ত্তি ধারণ করিল। যাহার "বকুলৈর্বঞ্জুলৈর্বিল্বৈঃ করবীরৈঃ কদম্বকৈঃ, কেতকীকুন্দপাটলৈঃ" শোভমান এবং "তাল, হিন্তাল, খর্জ্জুর, তিন্দু, কেতকী, রসাল, পনস, নারিকেল প্রভৃতি সুরস ফল পাদপসমূহে অলঙ্কৃত, রমণীয় উদ্যানসমূহে দেবগণ সানন্দে বিচরণ করিতেন*, যাহার মনোহর গুহাসমূহে কিন্নর, উরগ ও রাক্ষসগণ স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে কমনীয় কামকলানিচয়ে লালসান্বিত হইয়া সানন্দে বিহার করিত, গন্ধর্ব্বগণ যে শৈলরাজের শিখরদেশে আসীন হইয়া সুমধুর স্বরে ভগবান্ নৃসিংহদেবের স্তুতিগান করিতেন, ব্রহ্মাদি দেবগণের ভক্তিপূত স্তবনিস্বনে যে প্রদেশ সতত মুখরিত হইত, ক্রমে তাহার সমুদয় শোভাসৌন্দর্য্য অন্তরিত হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া রম্য উদ্যানতরুরাজিকে সমাচ্ছন্ন করিল, আর লতাগুল্মে তাহার পবিত্র ধারাসমুদয় আবৃত হইল এবং অন্যান্য বল্মীকস্তূপ উদ্ভূত হইয়া ভগবানের পবিত্রমূর্ত্তি ঢাকিয়া ফেলিল।

দেখিতে দেখিতে বহু শতাব্দী অতীত হইল। পরিশেষে একদিন রাজা পুরূরবা প্রিয়তমা উর্ব্বশীর সহিত ব্যোমযানে আকাশপথে ভ্রমণ করিতে করিতে সিংহাচলের কাননকুন্তলা অপূর্ব্ব শোভাদর্শনে চমৎকৃত হইয়া

* গুহাসু যত্র রম্যাসু কিন্নরোরগরাক্ষসাঃ।
স্বস্ব যোষিৎ সমাসক্তা রমন্তে রতিলালসাঃ॥
যত্র গন্ধর্ব্বপতয়ো গায়ন্তি মধুরস্বনাঃ।
নৃসিংহচরিতং পুণ্যং নিষণ্ণাঃ শৈলসানুষু॥
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সংস্তুবন্তি মানুষৈঃ।
সেবন্তে নৃহরিং মর্ত্ত্যা প্রণামস্তুতিশালিনঃ॥

বাণী-বন্দনা।

——:o:——

কুন্দ ইন্দু নিন্দি' বরণা

দিব্য-আলোকদীপ্তাননা,

স্বর্ণবীণাটি হাতে ল'য়ে দেবি

এস বীণাপাণি পদ্মাসনা।

স্নিগ্ধ পভাত-অরুণ-কিরণে

রঞ্জিত তব চরণতল

পরশে সদ্য হোক্ বিকশিত

ভক্ত-হৃদয়-কমলদল।

বাজাও জননি, মঞ্জু রাগিণী

ঝঙ্কারি' তব বীণার তারে,

নিখিল বিশ্ব ভেসে ডুবে যা'ক্

অক্ষয় গীত-সুধার ধারে।

দেহ মা ভুলায়ে পেমের মন্ত্রে

ধনের গর্ব্ব—দৈন্য ক্লেশ

সংসার হ'তে হউক্ লুপ্ত

স্বার্থ দ্বন্দ্ব হিংসা দ্বেষ,

তব রাগিণীতে জীবনের পথে

শ্রান্ত পথিক লভিবে বল,

পাষাণ গলিয়া যা'বে করুণায়,

ব্যথিত মুছিবে নয়ন জল।

লহ বীণাপাণি বন্দনা মম,

চাহি না বিত্ত, চাহি না মান,

তুমি যদি থাকি' চিত্তে নিত্য

সঙ্গীতরসে জুড়াও প্রাণ।

সমভিব্যাহারিণী অপ্সরাকে তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে উর্ব্বশী উক্ত দেবশৈলের সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বর্ণন করিয়া ভগবান্ বরাহ-নৃসিংহদেবের মন্দির ও দেববিগ্রহের পুনরুদ্ধার করিতে বলিলেন। তাহাতে রাজা পুরুরবা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। চতুর্থ দিবসেই তাঁহার ভাগ্যোদয় হইল; ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে রাজাকে দেখা দিলেন এবং মধুরস্বরে বলিলেন, "আমি বল্মীক-পিণ্ডের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছি। তুমি পঞ্চামৃত দ্বারা আমার স্নান করাইয়া ষোড়শোপচারে আমার পূজা কর এবং তাহার পর চন্দনে আমার আপাদমস্তক অনুলেপিত করিয়া দাও। এরূপ করিলে আপামর সাধারণ আমাকে দেখিতে পাইবে না। প্রতিবৎসর অক্ষয়তৃতীয়া দিনে সেই চন্দনভার উন্মুক্ত করিয়া অগ্রে তুমি আমাকে দর্শন করিলে তবে অপর সকলের দর্শনগোচর হইব।" রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। শ্রীবিষ্ণুর অপার মহিমায় বিভোর হইয়া তিনি ভগবানের বিগ্রহ সংস্কারের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সুবৃহৎ বল্মীকপিণ্ডের অভ্যন্তর হইতে বরাহ-নরসিংহদেবের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা তাঁহাকে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু সেই সময়ে একটি বড় আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। রাজা পুরুরবা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ভিন্ন [illegible] দেখিতে পাইলেন। তাহাতে তাঁহার মনোমধ্যে বিষম বিষাদের আবির্ভাব হওয়াতে তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তখন আকাশবাণী হইল "হে কোলয়নাথ! আমার পদদ্বয় মুনিদিগেরও দুষ্প্রাপ্য; তুমি তাহা কেমন করিয়া দেখিতে পাইবে?" পুরুরবার বিষাদ দূর হইল। তিনি বহুদূর হইতে কতকগুলি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া ভগবানের ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন এবং সেই দিন হইতে তাঁহার নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেই দিন অবধি বরাহনরসিংহদেব যথানিয়মে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। প্রতিবৎসর অক্ষয়তৃতীয়ায় তাঁহার শরীরাবরক চন্দনলেপ অন্তরিত হইলে আপামর সাধারণ ভগবানের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পায়।

পূর্ব্বে কেবল শূদ্রদিগকেই মন্দির প্রবেশ ও দেবদর্শনের নিমিত্ত আধ আনা প্রাবেশিক দিতে হইত; ব্রাহ্মণদিগের কিছুই লাগিত না। কিন্তু এখন ব্রাহ্মণশূদ্র সকলেরই কাছে এক আনা করিয়া আদায় করা হয়।